যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীঃ

401333

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

DIGITIZED

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
সিনিয়র প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

গবেষক
আহমাদ আলী
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Library
401333

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ২০০৩

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পিএইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা)
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودرى

الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داكا، بنغلاديش

Dr. A.B.M. Habibur Rahman Chowdhury
Ph.D. (London), M.A. (Double), B.A. Hons (Dhaka)
M.M. (Dhaka), F.R.A.S.

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone Off 9661920-59/4310, 4313 Res 8612992
E-mail harchow@du bangla net

Ref :

Date :

প্রত্যয়ন পত্র

DIGITIZED

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি.এইচ.ডি গবেষক আহমাদ আলী কর্তৃক পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীঃ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি গবেষকের একক গবেষণা কর্ম; কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

401333

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক ও প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছি যে,"যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীঃ" শিরোনামে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য প্রণীত এই গবেষণা সন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই মৌলিক গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক কর্তৃক পি.এই.ডি ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

আহমাদ আলী

401333

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যাঁর অপার করুণায় আমার এ' গবেষণা সন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অগণিত দুরূদ ও সালাম প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি, যিনি জ্ঞান সাধনা ও ইসলাম প্রচার-প্রসারকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য অপরিহার্য করেছেন।

এ গবেষণা কর্মে যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অত্র গবেষণা কর্মের স্বনামধন্য তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উস্তাযুল আসাতিযাহ বিদগ্ধ পন্ডিত ও বিশিষ্ট গবেষক এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী - এর প্রতি যিনি আমাকে এ সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস ও গবেষণাকর্মে সুচিন্তিত পরামর্শ এবং যথাযথ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি আমার গবেষণা পত্রের প্রতিটি শব্দ পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এক কথায় এ' গবেষণা কর্মের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছত্র, তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহ পাক তাঁকে-এর জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী ও একাডেমিক কমিটির সদস্যবৃন্দকে যাঁরা পি.এইচ.ডি গবেষণার জন্য নির্ধারিত দু'টি সেমিনারে আমার উপস্থাপিত দু'টি প্রবন্ধে গঠনমুলক সমালোচনার মাধ্যমে আমাকে এ গবেষণাকর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন । আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র অধ্যাপক ডঃ ইয়াকুব আলী স্যারের প্রতি। আমার এ' গবেষণাকর্মের ব্যাপারে রাজশাহীতে তাঁদের সান্নিধ্যে গেলে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন এবং ধৈর্যের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমি আন্তরিকভাবে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বিশিষ্ট গবেষক ডঃ এমতাজ সাহেব ও তাঁর ছোট ভাই বিশিষ্ট গবেষক ডঃ মোঃ রেজাউল করিমকে; যাঁরা আমার গবেষণা কর্মের দিক নির্দেশনা ও অমূল্য উপকরণ সরবরাহ করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্যারের প্রতি যিনি মূল্যবান পরামর্শ ও উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন। আমি শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শদ্ধেয় মরহুম পিতা-মাতাকে যাঁদের অনুপ্রেরণা ও দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ আমার এ উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত করেছেন। আমি তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরি, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, ঢাকাস্থ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস লাইব্রেরি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বরেন্দ্র লাইব্রেরি, রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরি, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ- লাইব্রেরি, রাজশাহী, "যশোর পাবলিক লাইব্রেরি"। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার যাঁদের ভাষার নিপুণতা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে তাঁদের মধ্যে জনাব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শরীফ হোসেন (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, যশোর এম. এম. কলেজ) জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী (প্রাক্তন শিক্ষক কেশবপুর পাইলট স্কুল) ডক্টর সাইফুদ্দীন চৌধুরী (Professor of Art History and Director Varendra Research Museum, Rajshahi University) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি তাঁদের প্রতিও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, বিশ্বকোষ বিভাগে কর্মরত জনাব নাসির হেলাল সাহেবের প্রতি যিনি আমাকে অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বই-পুস্তক, জার্নাল ইত্যাদি প্রদান এবং গবেষণাধর্মী পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার হাত সম্প্রসারিত করে ধন্য করেছেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উক্ত বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা ডঃ আব্দুল জলীল সাহেবের প্রতি যিনি বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।

বিশেষ করে স্মরণ করছি আমার পুত্রতুল্য সালাহউদ্দিন-কে যে, সার্বক্ষণিক আমার পাশে থেকে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আমার বন্ধু প্রতিম ডঃ

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরী, ফারুক মেহেদী ফুয়াদ ও হারুন-অর-রশীদের প্রতি যাঁরা আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে পরামর্শসহ সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্নেহভাজন মোঃ শহিদুজ্জামানের প্রতি, যে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে গবেষণা পত্রটি নিখুঁতভাবে আদ্যান্ত কম্পোজ ও প্রিন্টিং কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছে, সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বন্ধু প্রতিম মীর সিরাজুল আলম চৌধুরীর প্রতি যিনি এ গবেষণাপত্র কম্পোজের উপকরণ সরবরাহ করে আমাকে ধন্য করেছেন। সত্যি তাদের এ অবদান স্মরণীয়।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার সহধর্মিণী মিসেস জাহানারা আহমাদ, কন্যা কানিজ ফাতিমা লিলি ও শিশু পুত্র আশিক আহমাদকে যাদের অনুপ্রেরণা, ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালবাসা আমার উচ্চ শিক্ষার পথকে সুগম করেছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে এ ফরিয়াদ জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং আজীবন ওহী ভিত্তিক জ্ঞান সাধনা ও ইসলামী গবেষণায় আত্মনিবেদিত থাকার তৌফিক দান করেন।

আহমাদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণ সমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

উ وُ	া	দ/জ্ব ض	অ ا
ঊ وُوْ	ি	ত ط	ব ب
বি/ভী وِىْ	ু	য ظ	ত ت
ইয়া ىَ	া ا	‘ ع	স ث
য়ি ى	ী ى	গ غ	জ ج
ঈ يِىْ	ূ و	ফ ف	হ ح
উ ىُ	আ ا	ক্ব/ক ق	খ خ
ইউ يُوْ	আ آ	ল ل	দ د
‘আ/য়া‘ عَ	ই إ	ম م	য ذ
‘আ/‘য়া عَا	য়ি إِىْ	ন ن	র ر
ই عِ	উ أُ	ও و	য ز
ঈ عِى	ঊ أُو	হ ه	স س
উ/য়ু عُ	ওয়া وَا/وَ	’ ء	শ ش
ঊ عُوْ	বি و	য় ى	ছ ص

ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে ـْـ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যেমন- قرْآن = কুর’আন।

ع উচ্চারণ বুঝাতে ــــ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন عالم = ‘আলিম, بيعة = বাই‘য়াত, جامع = জামি‘ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য ‘আরবী ফার্সী, উর্দূ থেকে আগত বাংলায় বহুল প্রচলিত বানানগুলো বিশেষ করে ব্যক্তির নাম ও তাদের রচিত বই-পুস্তকের নামের বানান ব্যক্তি যেভাবেই লিখেছেন সেভাবেই রাখা হয়েছে। যেমনঃ হবিবর, মেহেরুল এসলাম, দলীলোল এসলাম ইত্যাদি।

. Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

সঃ	ঃ	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রাঃ	ঃ	রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
রঃ	ঃ	রহমাতুল্লাহ 'আলাইহি
আঃ	ঃ	আয়াত
হিঃ	ঃ	হিজরী
খ্রিঃ	ঃ	খ্রিস্টাব্দ
খ্রীঃ	ঃ	খ্রীস্টাব্দ
দ্রঃ	ঃ	দ্রষ্টব্য
তাঃ বিঃ	ঃ	তারিখ বিহীন
ডঃ	ঃ	ডক্টর
পৃঃ	ঃ	পৃষ্ঠা
সং	ঃ	সংস্করণ
সম্পাঃ	ঃ	সম্পাদিত
ইং	ঃ	ইংরেজি
অনূঃ	ঃ	অনূদিত
অনুঃ	ঃ	অনুবাদ
ই.ফা.বা.	ঃ	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
P.	:	Page
PP.	:	Pages
Vol.	:	Volume
ed.	:	edition/ edited by
op. cit.	:	In the work cited
cf.	:	Compare
Ibid	:	In the same place
NAB	:	National Archives of Bengladesh
F.n	:	Foot note
J.A.S.B.	:	Journal of the Asiatic Society of Bengal
Trans	:	Translated by

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ১-১০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ যশোর জেলার ভৌগোলিক বিবরণ ১১-৩৯

- ভৌগোলিক অবস্থান
- নামকরণ
- যশোর জেলা গঠন
- সীমারেখা ও বিবর্তন
- জনসংখ্যা
- ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপ
- নদ-নদী ও খাল-বিল
- যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আবহাওয়া ও জলবায়ু

তৃতীয় অধ্যায় ঃ যশোর জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ... ... ৪০ - ৯৩

- সামাজিক অবস্থা
- রাজনৈতিক অবস্থা
- অর্থনৈতিক অবস্থা
- ধর্মীয় অবস্থা
- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বঙ্গে মুসলমানদের আগমন ও যশোরে ইসলাম ... ৯৪ - ১৪২

- জলপথে সাহাবায়ে কিরামের আগমন
- স্থলপথে তাবেয়ীগণের আগমন
- রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের আগমন
- বঙ্গে সূফী, 'আলিম ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

- ✦ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা
- ✦ যশোরে ইসলাম

পঞ্চম অধ্যায় ঃ যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে মুজাদ্দিদ-মুজাহিদ, সূফী, ওলী-দরবেশ, পীর, 'আলিম সমাজ ও সাহিত্যিকবৃন্দের ভূমিকা ... ১৪৩ - ২৩৪

- ✦ কোম্পানি শাসন ও মুসলিম সমাজ
- ✦ মুজাহিদ-মুজাদ্দিদ ও তাঁদের সংস্কার আন্দোলন
- ✦ সূফী, ওলী-দরবেশ, পীর ও আলিম সমাজের ভূমিকা
- ✦ মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দের ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে মসজিদ, মক্তব-মাদ্‌রাসা ও খানকাহ্ সমূহের অবদান... ... ২৩৫- ২৭৪

- ✦ মসজিদের ভূমিকা
- ✦ মক্তবের ভূমিকা
- ✦ মাদ্‌রাসার ভূমিকা
- ✦ খানকাহ্‌র অবদান

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার ... ... ২৭৫ - ২৮০

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ... ... ২৮১ - ৩০৯

পরিশিষ্ট ঃ ... ... ৩১০ - ৩৩৬

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

- যশোরে ইসলাম প্রচার-প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনা
- গবেষণার উৎস সমূহ
- গবেষণা পদ্ধতি
- গবেষণা পরিকল্পনা

ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারের যে ধারা অব্যাহত ছিল, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতনের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সে ধারা কিছুটা ব্যাহত হয়। ইংরেজ কোম্পানি কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বিশেষ করে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) মাধ্যমে মুসলিম জমিদারগণ তাঁদের জমিদারি হারায়। আবার ইসলাম প্রচারক (مبلغ) পীর, আউলিয়া, বহিরাগত অভিজাত মুসলিম পরিবার ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নামে মুসলিম শাসনামলে বরাদ্দকৃত লাখেরাজ সম্পত্তি (মুসলমানদেরকে এককালীন সরকার কর্তৃক প্রদেয় নিস্কর জমি) প্রত্যাহার করা হলে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক ভিত একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে।[১] অন্যদিকে ইংরেজ রাজশক্তির সহযোগিতায় খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করণের জোর অপচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে যশোর অঞ্চলও এ সমস্যার বাইরে ছিলনা। দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় এ অঞ্চলের মুসালমানগণ যখন ব্রিটিশ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তির প্রহর গুণছিল জাতির এমন এক ক্রান্তিলগ্নে এ অঞ্চলে সঠিক ইসলামের দিক-নির্দেশনা নিয়ে কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কিছু সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ সূফী, পীর, ওলী, মুজাদ্দিদ, মুজাহিদ, 'আলিম ও মুসলিম সাহিত্যিক বৃন্দ। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ আলোচ্য অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য।

সাম্প্রতিককালে গবেষকগণ গভীরভাবে কোন বিষয়কে উপস্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র পরিসরকে বেছে নেন। কারণ গবেষণা কর্মে সামষ্টিকভাবে (macro-basis) আলোচনার তুলনায় ব্যাষ্টিক ভিত্তিক

---

১. জেমস ওয়াইজের (James Wise) মতে এদেশের মুসলমান জনসাধারণ রাখালহীন মেষপালকের মত হয়ে পড়ে। cf.: James Wise "*Notes on the races, castes and trades of Estern Bengal*, London: 1884. p. 2; এ সম্পর্কে W. W. Hunter আরো একধাপ এগিয়ে বলেন- গত পঁচাত্তরের মধ্যে (১৮৪০ সাল) বাংলার মুসলমান পরিবারগুলো হয় উৎখাত হয়ে গেছে না হয় আমাদের শাসনামলের নয়া সমাজের নিম্নস্তরে চাপা পড়ে গেছে। cf.: W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, Notes, p. 160.

Dhaka University Institutional Repository

(micro-basis) আলোচনা করলে বিষয়টির প্রকৃতি ও ধারা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করা সহজতর হয়। স্থানীয় ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও মূল্যায়ন করা যায়।[২] কোন ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনায় সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস বিরচিত হয়। এক্ষেত্রে ঘটনাটির খুঁটিনাটি বিষয় অবলোকন সম্ভব হয়না। পক্ষান্তরে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে ব্যাষ্টিক ভিত্তিতে অবলোকন করে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বাকেরগঞ্জের ইতিহাস আলোচনার এক পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, "জাতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাস রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ফলপ্রসু।[৩] বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে জেলা নিঃসন্দেহে একটি স্বীকৃত 'ইউনিট'। কেননা ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা ছিল একটি অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র।[৪] রাজস্ব ও প্রশাসনিক কর্মে সুবিধার লক্ষ্যে মূলত বাংলায় জেলার সৃষ্টি হয়। বহু বছর ধরে জেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসন বিচার, রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায়[৫] বিভিন্ন জেলায় স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো যেহেতু সেখানকার ভৌগলিক অবস্থান, আবহাওয়া-জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়; সেহেতু বাংলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে এসব ক্ষেত্রে তারতম্যের দরুণ এক জেলার সাথে অন্য জেলার অধিবাসীদের জীবন ধারায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার সাথে যশোর জেলার সমতল ভূমি এলাকার তুলনা করলে দেখা যায়, ভৌগলিক কারণেই পার্বত্য এলাকার মানুষের মন-মেজাজ কিছুটা রুক্ষ আর যশোর অঞ্চলের মানুষের মন মেজাজ অপেক্ষাকৃত শান্ত ও কোমল প্রকৃতির। ইসলাম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলার .অন্যান্য জেলার সাথে যশোর জেলার ইসলাম প্রচারের সাদৃশ্য থাকতে পারে তবে এর স্বতন্ত্র কোন বৈশিষ্ট্য থাকাও বিচিত্র নয়। তাই এ সকল অনুদঘাটিত বৈশিষ্ট্য সমূহ উদঘাটনের লক্ষ্যে জেলা ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন।

---

২. শরীফ উদ্দিন আহমদ (সম্পা:), *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ ১৯৯৯), পৃ. পঁচিশ।

৩. Sirajul Islam, "Writing the History of Bakerganj: Some Unresolved Questions", ***Bangladesh Historical Studies***, Vol-iv, 1979, pp. 102-110.

৪. M. M. Siddiquee, "Origin and Development of District Studies in Bangladesh" ***Journal of the institute of Bangladesh Studies***, Vol-xx, 1993, p. 9.

৫. শরীফ উদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. বিশ।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রাতিককালে রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে ইতিহাসের পরিমণ্ডলে এমন সব তথ্যাদি পরিবেশিত হচ্ছে যার সাথে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা রয়েছে। সংগত কারণে গবেষণার জন্য এমন একটি বিষয়কে মনোনীত করেছি ইতিহাস কোষে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান।[৬] সেকারণে-এর প্রচার-প্রসারের গুরুত্বও অধিক ।[৭] আর ক্ষেত্র হিসেবে যশোর বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেলা হিসেবে যশোরের প্রকাশ ঘটে।[৮] যশোরের দক্ষিণাঞ্চল নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহের সময় খলিফাতাবাদের অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটি একটি ইতিহাস খ্যাত স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং এখানে মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও অন্যান্য স্থাপত্য-ইমারত গড়ে উঠেছে। বারবাজারের পূরাকীর্তি ও বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজনৈতিক সচেতনতা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এ জেলার জনগোষ্ঠীর পদচারণা উল্লেখের দাবি রাখে। নীল আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা প্রতিহত করণ ইত্যাদি তারই স্বাক্ষর বহন করে। মহাকবি নবীন চন্দ্র সেনের ভাষায়: "সাব-ডিভিশন বা সদর যেখানেই গিয়েছি এক যশোর ভিন্ন সাহিত্য প্রিয় লোকের সাক্ষাত আমার ভাগ্যে বড় ঘটে নাই।"[৯]

১.১ যশোরে ইসলাম প্রচার-প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনা ঃ

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও সূফী-দরবেশ, পীর, 'আলিম সমাজ এবং শাসকবর্গের দ্বারা এর প্রচার-প্রসার সম্পর্কে অনেক গবেষণা ও বই-পুস্তক রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ডঃ এনামুল

---

৬. পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে-"إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَام" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরা 'আল 'ইমরান, আঃ ১৯।

৭. ইসলামে দা'ওয়াতের গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুর'আনে 'ইরশাদ হয়েছে- "وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরা হা-মীম সিজদা, আঃ ৩৩; অন্যত্র বলা হয়েছে- "وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরা 'আল 'ইমরান, আঃ ১০৪।

৮. সৃষ্টিলগ্ন থেকে ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগ পর্যন্ত আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে জেলাটির অবস্থান ছিলঃ যশোরের উত্তরে কুষ্টিয়া, পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলা ও পশ্চিম বাংলার নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণা জেলা। আর দক্ষিণে খুলনা এবং পূর্বে ও উত্তর পূর্বে ফরিদপুর জেলা। cf.: K. G. M. Latiful Bari, ***Bangladesh District Gazetteers Jessore, Dhaka: 1979***, p. 2.

৯. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার* (ঢাকাঃ ১৯৯২), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

হকের "Sufism in Bengal" বাংলার প্রখ্যাত সূফী-সাধক ও আউলিয়া কিরামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থখানা সমগ্র বাংলার প্রেক্ষিত হওয়ায় যশোর অঞ্চলের সূফী-সাধকগণের জীবনী ও তাঁদের অবদান সম্পর্কিত আলোচনা তেমন স্থান পায়নি। তবে গ্রন্থখানা তথ্যবহুল হওয়ায় গবেষকদের নিকট উপাত্তের উৎস হিসেবে অধিক সমাদৃত। মুহাম্মদ রুহুল আমীন-এর "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭খ্রীঃ)" অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস এবং আব্দুল মান্নান তালিবের "বাংলাদেশে ইসলাম" গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮. মুহাম্মদ রুহুল আমীন "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-সূফীদের অবদান শীর্ষক পি-এইচ.ডি. গবেষণায় বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও এক্ষেত্রে সূফীদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণাটি সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রিক হওয়ায় যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসার সম্পর্কে খুব সামান্য আলোচনা স্থান পেয়েছে। তবে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান সম্পর্কে গবেষণাকর্মটি তথ্যবহুল হিসেবে সমাদৃত। প্রখ্যাত লেখক মুহাম্মদ আবদুল মান্নান তালিবের "বাংলাদেশে ইসলাম" গ্রন্থখানিও সমগ্র বাংলার প্রেক্ষিতে রচিত। এ গ্রন্থখানি সামষ্টিক ভিত্তিতে আলোচিত হওয়ায় যশোর অঞ্চলের ইসলাম প্রচারের তেমন আলোচনা স্থান পায়নি। শুধুমাত্র খানজাহান আলী (রহঃ) সহ দু'চারজন সূফী-দরবেশগণের কথা লেখক স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছেন। তবে সমগ্র বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার সম্পর্কে গ্রন্থখানি অনন্য।

যশোর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অনেক গবেষণা ও গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মোঃ রেজাউল করিম এর "যশোর জেলায় নীল আন্দোলন ১৮৫৯-৬২ ঃ একটি সমীক্ষা" অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস; মুহাম্মদ আমিরুল ইসলামের "যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা ১৭৮৬-১৯৪৭ খ্রিঃ" অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস; ডঃ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী' এর 'Socio-Economic Development of A Bengal District : A Study of Jessore, 1883-1925' প্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস; প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্রের "যশোহর খুলনার ইতিহাস"; নাসির হেলার এর যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার এবং অধ্যাপক আবূ তালিবের যশোর জেলায় ইসলাম' ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮. মোঃ রেজাউল করিমের 'যশোর জেলায় নীল আন্দোলন ১৮৫৯-৬২ ঃ একটি সমীক্ষা' শীর্ষক পি-এইচ.ডি. গবেষণা কর্মটি সুনির্দিষ্টভাবে নীল আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এ অঞ্চলে ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার-প্রসার সম্পর্কে কোন আলোচনা গবেষণায় স্থান পায়নি। তবে অত্র অঞ্চলে নীল আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা কর্মটি যথেষ্ট সমাদৃত। মুহাম্মদ আমিরুল ইসলামের "যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা (১৭৮৬-১৯৪৭ খ্রিঃ) শীর্ষক এম. ফিল. থিসিসটিও নির্দিষ্টাকারে যশোরে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে রচিত। এজেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার সম্পর্কে তেমন আলোচনা উক্ত গবেষণা কর্মে আলোচিত হয়নি। অত্র অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা কর্মটি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। ডঃ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী-এর 'Socio-Economic Development of A Bengal District : A Study of Jessore 1883-1925' প্রকাশিত পি-এইচ.ডি. গবেষণা কর্মটি ইংরেজি ভাষায় লিখিত তথ্য সমৃদ্ধ একটি ঐতিহাসিক গবেষণাকর্ম। এ গ্রন্থে গবেষক যশোর জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটি তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটিতে যশোর জেলার বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হলেও ইসলাম প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে তেমন আলোচনা স্থান পায়নি।

যশোর-খুলনা অঞ্চলের প্রথম স্থানীয় ইতিহাস হিসেবে খ্যাত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস (দু'খণ্ড সম্বলিত) গ্রন্থটি সুলিখিত ও তথ্য সমৃদ্ধ। ১৯২০ এর দশকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে লেখক যশোর-খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তবে ইসলাম প্রচার-প্রসার সম্পর্কে পরিচ্ছেদাকারে তিনি তেমন কোন আলোচনা করেননি। তাঁর উপস্থাপিত বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে বিভিন্নভাবে তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থার কিছু বর্ণনা এসেছে এবং খানজাহান আলী, বড় খান গাজী, গাজী-কালু চম্পাবতী সহ পঞ্চদশ শতাব্দীর দু'একজন ইসলাম প্রচারকের আলোচনা তিনি করেছেন ঠিকই তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁর আলোচনা নিরপেক্ষ হয়নি। মিত্র মহাশয় মুসলমানদেরকে আতরাফ, আশরাফ ও আরজাল এ তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এছাড়া অধিকাংশ মুসলমান নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত বলে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার এ দাবি মোটেই যৌক্তিক নয়। কেননা ইসলামের সুমহান সাম্যের আহবানে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিম্নবর্ণের ন্যায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এতদ্ব্যতীত আতরাফ-আশরাফ হিসেবে মুসলমানদের মাঝে কথিত ভেদনীতিতে তিনি হিন্দুদের বর্ণ বৈষম্যের নীতির নামান্তর বলে অভিহিত করে তার একান্ত হিন্দুত্ববাদের পরিচয়কে স্পষ্ট করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় পন্ডিতদের বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ইংরেজ প্রীতি ছিল লক্ষ্যণীয়। তাদের আলোচনায় ইংরেজদের দোষ-ত্রুটিকে কৌশলে এড়িয়ে প্রকারান্তরে তাদের গুণকীর্তন করতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মিত্র মহাশয়ও এ থেকে স্বতন্ত্র ছিলেননা। তিনি লিখেছেন- "সব সাহেব একরূপ ছিলেননা। তাহাদের মধ্যে আদর্শ চরিত্রের লোকও ছিলেন।"[১০] আর ইসলাম তথা মুসলমানদের আলোচনায় তিনি একপেশে (হিন্দু জাতীয়তাবোধ) নীতি অবলম্বন করেছেন। সুতরাং সতীশচন্দ্র মিত্রের বিবরণ নিরপেক্ষ ইতিহাস হয়ে ওঠেনি। এতদসত্ত্বেও যশোর-খুলনা অঞ্চলের ইতিহাসের মূল্যবান আকর হিসেবে তাঁর গ্রন্থখানি অনন্য।

নব্বই এর দশকের তরুণ লেখক নাসির হেলালের "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার" গ্রন্থখানি সুলিখিত ও সময়োপযোগী। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি অত্যন্ত সহায়ক। তবে গ্রন্থটি গবেষণাধর্মী নয়। এছাড়া গ্রন্থটিতে ব্রিটিশ শাসনাধীন (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিঃ) সময়ে যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়নি। প্রখ্যাত লেখক অধ্যাপক আবূ তালিব রচিত "যশোর জেলায় ইসলাম" গ্রন্থখানিও অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসার সম্পর্কে সুলিখিত একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিও গবেষণাধর্মী নয়। গ্রন্থটিতে বর্তমান যশোর জেলার সংকুচিত সীমারেখা নিয়ে লিখিত। এছাড়া গ্রন্থটিতে ইসলাম প্রচার-প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় স্থান পায়নি। যেমন- মসজিদ, মাদ্‌রাসা সমূহের অবদান, এমনকি অনেক সূফী-দরবেশ, পীর-আউলিয়া কিরামের আলোচনাও উপেক্ষিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে মরমী মণীষী সাধকদের (লালনশাহ, পাঞ্জুশাহ) এবং গাজী-কালু, চম্পাবতী, পীর তাহের নানাবিধ কাহিনী বেশি আলোচিত হয়েছে। সেকারণে গ্রন্থখানি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

" যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীঃ' গবেষণাকর্মে পূর্বোল্লেখিত গবেষণাকর্ম ও গ্রন্থগুলোর উল্লেখিত ঘাটতি পূরণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাসের উৎস ব্যবহার করে অত্র গবেষণা কর্মকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উৎস সমূহ ঃ

"যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীঃ' গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং গৌণ উৎসের (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত। প্রাথমিক উৎস সমূহের মধ্যে রয়েছে সমকালীন সরকারি রেকর্ড সমূহ। ঔপনিবেশিক আমলে

[১০]. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলিকাতাঃ ২য় সংস্করণ, ১৯৬৫), পৃ. ৭৮২।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় District Gazetteer ও বিভিন্ন Report প্রকাশিত হয়। যশোর জেলাকে কেন্দ্র করেও এমন একাধিক Gazetteer ও Report প্রকাশ করা হয়। যেমন L. S. S. O'Mally-এর Bengal District Gazetteer, Jessore যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস থেকে; এছাড়া James Westland এর "A Report on the District of Jessere" : Its Antiquities, Its History and its commerce (যেটি কলকাতা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস হতে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জেলা কালেক্টরেট এবং অন্যান্য সরকারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-বিচার, ভৌগোলিক অবস্থান, রাজস্ব ও আদম শুমারি সংক্রান্ত Report সমূহকে এক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা আবশ্যক, স্থানীয় ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উৎস জেলা রেকর্ডরুম সমূহে সংরক্ষিত আছে। যশোর জেলার ইতিহাসের অনেক উৎস যশোরের বিভিন্ন রেকর্ডরুম যেমন- জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম, জেলা জজ অফিস রেকর্ডরুম ইত্যাদিতে সংরক্ষিত আছে। তৎকালে কালেক্টর ও তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ তাঁদের এলাকার উপর Report প্রদান করতেন। সাধারণত বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক আকারে সম্পাদিত এ সকল Report থেকে জেলার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

এছাড়া প্রাক ঔপনিবেশিক আমল ও আমাদের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে স্থাপিত প্রাসাদ, ইমারত, মসজিদ, মাযার ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ ও এগুলোর গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি সমূহ এবং বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মুদ্রা সমূহকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিঃ) ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত গ্রন্থসমূহ যেমন W. W. Hunter এর The Indian Musalmans; A Stastical Account of Bengal এবং সমসাময়িক লেখক যেমন- W. Adams, H. Beverly প্রমুখের রচিত গ্রন্থ Report সমূহকেও প্রাথমিক উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। এ সকল উৎসের পাশাপাশি "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭- ১৯৪৭ খ্রিঃ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি রচনায় অনেক গৌণ উৎস (বাংলা, ইংরেজি, আরবী, উর্দূ, ফার্সী গ্রন্থ) ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

"যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীঃ" গবেষণা কর্মটি একটি ঐতিহাসিক গবেষণাকর্ম। গবেষণা কর্মটির সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হলেও সমাপ্তিকাল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হওয়ায় এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতকার, তাঁদের লিখিত পান্ডুলিপি ও প্রদেয় জনশ্রুতিমূলক তথ্য সমূহ উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে "আর্কাইভাল" (ar-chivel) উৎস ও প্রত্নতাত্ত্বিক এবং প্রাথমিক (Primary) ও দ্বিতীয় পর্যায়ের (Secondary) গ্রন্থাবলি উৎসের উপর বেশিরভাগ নির্ভর করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি (Historical Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পরিকল্পনা

আলোচ্য " যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭খ্রীঃ" গবেষণা কর্মকে ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে- ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়- যশোর জেলার ভৌগোলিক বিবরণ এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ে রচিত। কেননা ভৌগোলিক অবস্থান স্ব-স্ব অঞ্চলের ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। শুধুমাত্র ভূ-প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মন-মেজাজ ও জীবনধারায় ব্যাপক বৈচিত্র ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যে কোন দেশে বা অঞ্চলে কোন ধর্ম বা মতবাদ প্রচার-প্রসারের সুস্পষ্ট কারণ থাকে। আর এ ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সে কারণে সন্দর্ভটি আলোচনার সুবিধার্থে এ জেলার ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রাক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার আলোচনা উপস্থাপন করেছি। এক কথায় এর উদ্দেশ্য জেলার ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা ইসলাম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে কতটুকু অনুকূলে ছিল তা বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষা করা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে- বাংলাদেশে ইসলাম কখন, কাঁদের মাধ্যমে প্রচার-প্রসার ঘটেছে এবং যশোর অঞ্চলে সর্বপ্রথম কখন, কাঁদের দ্বারা এর প্রচার-প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সংখ্যক ইসলাম প্রচারকগণের জীবনী ও এ অঞ্চলে তাঁদের ইসলাম প্রচার-প্রসার সম্বলিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে- ইংরেজ শাসনামলে কোম্পানির কালো শাসনের ফলে বাংলার অন্যান্য অংশের ন্যায় যশোর অঞ্চলের মুসলমানরাও যখন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, খ্রিস্টানদের ধর্মান্তরিত করণের অপচেষ্টা ও হিন্দুদের করালগ্রাসে যখন মুসলিম সমাজ ধ্বংসের মুখে নিপতিত ঠিক সে সময়ে যে সকল নিবেদিত প্রাণ -মুজতাহিদ, সূফী, ওলী-দরবেশ, পীর, মুজাদ্দিদ, মুজাহিদ, 'আলিম সমাজ ও সাহিত্যিকবৃন্দ মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি এ অঞ্চলে মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন সে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনী ও এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাঁদের অবদান সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে- ইসলাম প্রচার-প্রসারে অত্র অঞ্চলের মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও খানকাহ সমূহের ভূমিকার বিষয় স্থান পেয়েছে। কেননা ইসলাম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে সে অঞ্চলের তৎকালীন মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও খানকাহ সমূহ কেন্দ্রীয় ও প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। সেকারণে যশোর অঞ্চলের মসজিদ, মক্তব-মাদ্‌রাসা ও খানকাহ সমূহের পরিচিতি ও কার্যকরী ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপন করেছি।

সপ্তম অধ্যায়- উপসংহারে সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্তসার আলোচনার মাধ্যমে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার প্রয়াস পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

যশোর জেলার ভৌগোলিক বিবরণ

- ভৌগোলিক অবস্থান
- নামকরণ
- যশোর জেলা গঠন
- সীমারেখা ও বিবর্তন
- জনসংখ্যা
- ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপ
- নদ-নদী ও খাল-বিল
- যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আবহাওয়া ও জলবায়ু

Dhaka University Institutional Repository

যশোর জেলার ভৌগোলিক বিবরণ

ভৌগোলিক অবস্থান :

কোন অঞ্চলের সঠিক ইতিহাস জানতে হলে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা ভৌগোলিক অবস্থান স্ব-স্ব অঞ্চলের ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। একই রাজনৈতিক সীমানাভুক্ত অঞ্চলে শুধমাত্র ভূ-প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে ঐ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক পরিবেশের ভিন্নতা সে অঞ্চলের অধিবাসী ও তাদের সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও সমতল অধিবাসীদের মন-মেজাজ ও জীবন ধারার তুলনামূলক বৈচিত্রময়তা। ভৌগোলিক কারণেই পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের মেজাজ রুক্ষ্ম আর সমতল অঞ্চলের মানুষের মেজাজ অপেক্ষাকৃত শান্ত ও কোমল প্রকৃতির হয়। বলা বাহুল্য, মন-মেজাজের রুক্ষ্মতা ও কোমলতার প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয় সুদূর মক্কা ও মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও এর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। এর অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে ভৌগোলিক পরিবেশের ভিন্নতাকে সহজেই দায়ী করা যায়। এজন্য "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারএকটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রী" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আলোচনার সুবিধার্থে যশোর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করা গেল:

বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- প্রাচীনকাল থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুক্ষ্ম, ব্রক্ষ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বংগ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল।[১] আর সপ্তম শতাব্দীতে (৬৩৯ খ্রিঃ) চীনা পরিব্রাজক হিউয়াংচাং[২]-এর বংগ ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায় যে, বংগ তথা গাংগীয় ব-দ্বীপ কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণ, সুবর্ণ, ওর্ডা (orda) এবং গঞ্জাম এই ৬টি প্রশাসনিক কাঠামোতে বিভক্ত ছিল।[৩] উভয় বর্ণনাতেই সমতটের উল্লেখ রয়েছে। সমতট ব-দ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত; আর যশোর সম্ভবত সমতটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেকজান্ডার কানিংহাম এ সম্পর্কে আরো একধাপ এগিয়ে যশোরকে

---

১. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বাংলা), পৃ. ১২৩।

২ এই পরিব্রাজকের নামের উচ্চারণ ও বানান নিয়ে বহু মতভেদ আছে। Huentsang (Encyclopedia), Huentsiang (V.A. Smith) এবং Thomas Watters এর সম্পাদিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংস্করণের উপক্রমণিকায় Rhys Davids বহু গবেষণার পর Yuan chwang এই উচ্চারণ স্থির করেছেন। আমরা এর অনুবাদ ইউয়াংচোয়াং করলাম। দ্রষ্টব্য: সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৩ ইং), পৃ. ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

সমতটের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন- "এটা নিশ্চিত যে, সমতট গাংগীয় ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত এবং এদেশ বেষ্টিত স্থান থেকে ৩০০০ লী বা ৫০০ মাইল দূরে অবস্থিত ভাগীরথী এবং গংগার প্রধান প্রবাহের মধ্যবর্তী সমগ্র ব-দ্বীপ এর অন্তর্ভুক্ত।[৪] টলেমীর [৫] মানচিত্রেও এ মতের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] সতীশচন্দ্র মিত্র কানিংহামের সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, "সমতটের রাজধানী ছিল যশোর শহর সংলগ্ন মরুলী বা মুরুলীর আশ-পাশের কোন স্থানে।[৭] "জেমস ওয়েস্টল্যান্ড"[৮] তার রিপোর্টে যশোরের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে সমতটের স্থলে উল্লেখ করেন যে, গংগা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যভাগে ব-দ্বীপ আকৃতির জায়গাকে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সমান তিনভাগে বিভক্ত করলে মধ্য পশ্চিম-উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ব্যতীত বাকী অংশই যশোর। তিনি তাঁর রিপোর্টে ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে

---

৩. S. R. Majumdar Sastri (ed.), ***Cunninghams Ancient Geography of India*** (Calcutta: Chucker vertty, Chatterjee and Co. Ltd., 1924), p. 572.

৪. *Ibid*, p. 576.

৫. টলেমী ভূ-কেন্দ্রিক (Geo-centric) মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। উল্লেখ্য, এরিস্টোটল ভাবতেন পৃথিবীটা স্থির এবং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারকারা পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষে চলমান। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী (Ptolemy) এই ধারণা বিস্তার করে ব্রহ্মাণ্ডের একটি সম্পূর্ণ প্রতিরূপ (cosmological model) তৈরি করেছিলেন। পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে এবং তাকে ঘিরে ছিল আটটি গোলক। এই গোলকগুলি বহন করত চন্দ্র, সূর্য, তারকা এবং সেই যুগে জানিত পাঁচটি গ্রহ-বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। গ্রহগুলি নিজেরা তাদের নিজ নিজ গোলকের সংগে যুক্ত ক্ষদ্রতর বৃত্তে ভ্রমণ করে। ....টলেমীর (Ptolemy) প্রতিরূপ থেকে মহাকাশের বস্তুপিণ্ডগুলির আকাশে অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল। ..... খ্রিস্টীয় চার্চ এই প্রতিরূপ গ্রহণ করেছিল। কারণ তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে এই প্রতিরূপের মিল ছিল। দ্রঃ স্টিফেন ডব্লু হকিং, A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes উদ্ধৃত, শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত অনূদিত "কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহবর (কলকাতাঃ বাউল মন প্রকাশন ২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, ১৯৯৩ইং), পৃ. ২২-২৩।

৬. Ptolemy, Geography of India, উদ্ধৃতঃ শেখ মাসুম কালাম ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, *বাদ্বতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (সাতক্ষীরা: জেলা প্রশাসন সাতক্ষীরা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬), পৃ. ১৩।

৭. এ স্থানকে তিনি ঐতিহাসিক বারবাজারের অভিন্ন মনে করে ৭টি যুক্তির অবতারণা করেন এবং পরিশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বারবাজারই সমতটের রাজধানী ছিল। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৫-৯১।

৮. জেমস ওয়েস্টল্যান্ড যশোরের অন্যতম কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি কালেক্টর থাকা কালে যশোরের বিভিন্ন বিষয়ের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ অঞ্চলের বসতবাটি ও লোক সংখ্যার উপরও একটি জরিপ করেন। আর এখানে ওয়েস্টল্যান্ডের রিপোর্ট বলতে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্টকে বুঝানো হয়েছে। দ্র : J. Westland, ***A Report on the District of Jessore: Its Antiquitees: its History, and its commerce*** (Calcutta: Bengal Secretariat press, 1874), p. 1.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেন যে, যশোর জেলা যথাক্রমে ২১°৪৫ থেকে ২৩°৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৫ থেকে ৮৯°৫৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[৯]

নামকরণ ঃ

যশোর নামের উৎপত্তি ও নামকরণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তৎকালে যশোর অঞ্চল নদী-নালা, খাল-বিলে ভরা ছিল। আর এ সকল নদী-খাল পার হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে বহু সাঁকো বা সেতু ছিল। আরবীতে 'জসর' (جسر) শব্দের অর্থ সেতু। পরবর্তীতে এটি যশোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১০] আলেকজান্ডার কানিংহাম এ মতের সমর্থনে বলেন- "The name of Jessore, the bridge, shows the nature of the country which is so completely intersected by deep water course."[১১]

কারো মতে প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের[১২] রাজত্বকালে প্রথম 'যশোহর' নাম হয়। ঘটনাটি হল বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দাউদ শাহ[১৩] ১৫৭৬ সালে মোঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা টোডরমল্ল ও মুনিম খাঁ কর্তৃক পরাজিত হয়ে পালানোর সময় রাজধানী গৌড় ও তান্ডার অধিকাংশ রাজকীয় ধনরত্ন বিক্রমাদিত্যের হস্তে সমর্পণ করেন। নব প্রতিষ্ঠিত যশোর নগরী এ রূপে গৌড়ের যশ: হরণ করে বলেই এর নাম হয়েছিল যশোহর। জেমস ওয়েস্টল্যাণ্ড এ মতের সমর্থন করে বলেন- Jessore means "glory depriving".[১৪]

অপর এক বর্ণনায় জানা যায়, দাউদ শাহের পর বিক্রামাদিত্যও ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত সম্পদ নিয়েসুন্দরবনের দিকে পালিয়ে আসেন এবং সেখানে একটি নতুন শহরের সন্ধান পান। হরিশচন্দ্র

---

৯. *Ibid.*

১০. নাসির হেলাল, ***যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*** (ঢাকা: সীমান্ত প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯২), পৃ. ১৪; অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিব, ***যশোর জেলায় ইসলাম*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসে: ১৯৯১), পৃ.২।

১১. ***Cunninghams Ancient Geography of India***, p. 502.

১২. বিক্রমাদিত্য দাউদ খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। তাঁর প্রকৃত নাম শ্রীহরি। মেধা, বুদ্ধি এবং রাজ্য পরিচালনার কাজে দক্ষতার জন্যই দাউদ খাঁ তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি মূলত দাউদ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। দ্র: ***ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,*** পৃ. ২২।

১৩. সুলেমান কররানীর পুত্র দাউদ খাঁ কররানী গৌড়-বঙ্গের শেষ স্বাধীন সুলতান। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই দিল্লীর সম্রাট আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। এই সময় ক্ষুব্ধ আকবর বাংলা বিজয়ের জন্য রাজা টোডরমল্ল এবং মুনিম খাঁ কে পাঠান। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হন এবং সন্ধি করেন। কররানী বংশের শাসনকালেই যশোর পরগণা হিসেবে স্থান পায়। দ্র: ***প্রাগুক্ত।***

Dhaka University Institutional Repository

তর্কালংকারের[১৫] মতে বিক্রমাদিত্য এই নতুন শহরের নামকরণ করেন 'ইউশোহারা' [১৬] (Yasohara)। আবার কেউ বলেন, গৌড়ের সাথে তুলনা নয়, বরং এ রাজ্য অত্যধিক যশস্বী ছিল বলে কোন ব্যক্তি এ অর্থে এর নাম দিয়েছিলেন যশোহর ।[১৭] জেমস ওয়েস্টল্যান্ডের অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি বলেন- It was in intended to express the idia "Supermely glorious".[১৮]

প্রখ্যাত লেখক সতীশ বাবু তাঁর'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'গ্রন্থে লিখেছেন- "প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যেখানে যশোর রাজ্যের প্রসঙ্গ আছে, সেখানে 'যশোর' নামই দৃষ্ট হয়, 'যশোহর' নাম নেই। প্রতাপাদিত্য এই যশোর রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। বর্তমান খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কালীগঞ্জ হতে ১২ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁর রাজধানী ছিল।[১৯] সে রাজধানীর নামও যশোর।"[২০] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "এই রাজধানীর অন্তর্গত ঈশ্বরীপুর নামক স্থানে এখনও যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠ মন্দির ও মূর্তি আছে। 'এক্ষণে লোকে সাধারণ কথায় একে যশোর বলে, এবং বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ করে যশোহর লেখা

---

১৪. J. West Land, *op. cit.*, p.23.

১৫. Haris chandra Tarkalanker, ***The History of Raja pratapditya*** (Calcutta: Vernacetar Literature Society, 2nd ed. 1856), p. 17.

১৬. "According to local tradition, the name is a corruption of "Yasohara" meaning the depriver of glory, and that this name was all egedly given to the capital of Bikramaditya in the sundarbans which was so magnificent that the eclipsed the capital of Goud". cf: K. G. M. Latiful Bari, ***Bangladesh District Gazetteers Jessore*** (Dacca: Bangladesh Government press, 1979), p.1.

১৭. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।

১৮. J. West Land, *op. cit.*, p. 23.

১৯. কবি ভারত চন্দ্র প্রতাপাদিত্যের বিক্রম সম্পর্কে লিখেছেন:

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকী পাতালে
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মন্ডলে।"

উল্লেখিত অবনী মন্ডলই ছিল সমকালে সুন্দরবন এলাকা।

২০. অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারত চন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যেও (১৭৫২ খ্রিঃ) যশোর নামই উল্লেখিত হয়েছে। যেমন-

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূ পতি দারস্থ।

দ্র: ভারত চন্দ্র রায়গুণাকর, অন্নদামঙ্গল, উদ্ধৃত- *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

হয়।' যশোর প্রাচীন কথা; 'যশোহর' বিশুদ্ধ বা অর্থসঙ্গত হলেও আধুনিক কথা।"[২১] বাংলা ভাষায় যশোর ও যশোহর উভয় নামের প্রচলন থাকলেও যশোর নামটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তৎকালে যশোর অঞ্চল নদী-নালা ও খাল-বিলে পূর্ণ ছিল। আর এগুলো পার হওয়ার জন্য বহুস্থানে সাঁকো, পুল নির্মিত হয়েছিল। যা আরবী; ফারসী জসর (جسر) এর প্রতিশব্দ। উপরন্তু ইংরেজি জসর (Jessore) উচ্চারণই এর স্বাক্ষর বহন করে।

যশোর জেলা গঠন ঃ

জেলা একটি দেশের প্রশাসনিক একক (Unit)। জেলার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'district'। এর অর্থ একেক দেশে একেক ধরনের।[২২] যদিও জেলা সৃষ্টিলগ্ন থেকে বাংলার প্রশাসনিক একক (Unit) হিসেবে এ শব্দটি এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে। এ কারণেই জেলা ও জেলা প্রশাসন জনগণের নিকট খুবই পরিচিত শব্দ। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার ব্রিটিশ কলোনিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পরিভাষার প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।[২৩]

আধুনিককালে প্রশাসনিক একক হিসেবে জেলা যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এটি মূলত: ভারত বর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা ছিল একটি অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র।[২৪] ১৭৫৭ সালের পর বাংলায় মোঘল শাসন পদ্ধতি যখন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে, তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্রুত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন কল্পে জেলার প্রবর্তন করেন।[২৫]

---

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৯।

২২. In Britain, a district is a division of parish or unit of local Government; In India, a district is the unit of adminstration of a province; In U.S.A. a district is the Federal Government area and; In Franc, a district is called department, cf: ***The World Book Encycolop edia***, Vol-4 (London: Field Enterprises Educational Corporation, 1966), p. 144.

২৩. N. Abedin, ***Local Administration and politics in Modernising Socities, Bangladesh and Pakistan*** (Dacca: National Institute of public Adminstration, 1973), p. xxiii.

২৪. M. M. Siddiquee, "Origin and Development of District studies in Bangladesh," ***Journal of the Institute of Bangladesh Studies***, Vol-xv, 1993, p. 9.

২৫. Mohammad Mohibullah Siddiquee, ***Socio-Economic Development of A Bangal District: A study of Jessore, 1883-1925*** (Rajshahi: Institute of Bangladesh studies, University of Rajshahi, 1997), p. 29.

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বাংলায় জেলা গঠনের ইতিহাস দুই শতকের কিছু বেশি সময়ের। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে সুষ্ঠু শাসনের প্রয়োজনীয়তায় বিভিন্ন প্রশাসনিক একক প্রতিষ্ঠা করা হত। গুপ্তযুগে ৩২০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভূক্তি, বিষয়, মন্ডল, বীথি, গ্রাম ইত্যাদি প্রশাসনিক এককে বিভক্ত ছিল।[২৬] তৎকালীন ভূক্তি ও বিষয় আধুনিককালের বিভাগ ও জেলার সমতুল্য ছিল। ভুক্তি ও বিষয়ের শাসনকর্তাকে যথাক্রমে উপরিক এবং কুমারামাত্য বা বিষয়পতি নামে আখ্যা দেয়া হত। এরা ছিল বর্তমান সময়ের 'কমিশনার' এবং ডেপুটি কমিশনারের সমতুল্য।[২৭]

বাংলায় হোসেন শাহী শাসনামলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে) সমগ্র বাংলাকে ১৩টি প্রশাসনিক এককে ভাগ করা হয়।[২৮] এ সকল এককের নাম ছিল আর্যা।[২৯] যশোর সে সময়ে 'খলিফাতাবাদ'[৩০] এবং 'ফাতাহবাদ'[৩১] নামক দুটি আর্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুঘল শাসনামলে বাংলার প্রশাসনিক বিভাজনে পুনরায়

---

২৬. *Ibid*, p. 28; *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃ. ৩২১।

২৭. R. C. Majumder (ed.), ***The History of Bengal***, Vol- 1, Hindu period (Dhaka: University of Dhaka, 2nd imp., 1963), p. 205.

২৮. M. R. Tarafder, ***Husain Shahi Bengal. 1494-1538 AD: A Socio political study*** (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1965), p. 144.

২৯. *Ibid*, p. 115.

৩০. **খলিফাতাবাদ** শব্দের অর্থ প্রতিনিধির শহর। খানজাহান আলী গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন বলে জানা যায়। এ কারণেই এ স্থানের নামকরণ করা হয় খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। খলিফাতাবাদ ছিল বহু বিস্তৃত পরগণা। ১৫৮২ সালে সম্রাট আকবরের সময় রাজা টোডরমল্ল বঙ্গ দেশ জরিপ করে যে বিজয় তালিকা প্রস্তুত করেন তাতেও খলিফাতাবাদ পরগণা নামে একটি বিভাগের উল্লেখ ছিল বলে জানা যায়। দ্র: ড: শেখ গাউস মিয়া, ***বাগেরহাটের ইতিহাস***, ১ম খণ্ড (বাগেরহাটঃ বেলায়েত হোসেন ফাউণ্ডেশন, জুলাই ২০০১), পৃ. ১৭; খলিফাতাবাদ এর অবস্থান সম্পর্কে বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- দক্ষিণ যশোর ও পশ্চিম বাকেরগঞ্জ নিয়ে এটি গঠিত। বাগেরহাট এই পরগণার অন্তর্গত ছিল। দ্র: আকবরউদ্দীন অনূদিত, *বাংলার ইতিহাস* (রিয়াজ-ইস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ), মূলঃ গোলাম হোসাইন সলীম (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ৩৫৬; *বাংলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৩১. **ফাতাহবাদঃ** ফরিদপুরের পূর্বের নাম ছিল ফাতাহাবাদ। আইন-ই আকবরীতে উল্লেখ আছে, ফাতেহাবাদ ছিল হুসাইন শাহের প্রধান শহরের নাম। ইহা লক্ষণাবতীর শাসক জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহর (১৪৮১-৮৭ খ্রিঃ) নামানুসারে ফতেহাবাদ নামকরণ করা হয়েছে। কেননা আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ ছিলেন একজন আরব দেশীয় ভাগ্যান্বেষী। ফতেহ শাহর ভাই রুকনুদ্দীন বরবক শাহ তাঁকে রাজ দরবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তখন থেকেই জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফলে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৪৯৩ সনে ফতেহ শাহর নামানুসারে পূর্বের ধলেশ্বরী 'পরগণার' নাম বদলিয়ে ফতেহাবাদ রাখেন। দ্র: নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, ফরিদপুর, পৃ. ৩৭; সৈয়দ মুর্তজা আলী, পূর্ব পাকিস্তনের আউলিয়া দরবেশ, পৃ. ৩৭; উদ্ধৃত- মোঃ আব্দুস সাত্তার, ***ফরিদপুরে ইসলাম***, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৯৩), পৃ. ৫; ফাতাহবাদ- এর সীমানা সম্পর্কে 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে,

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাকে সে সময় 'সুবা'[৩২] নামে অভিহিত করে ১৯টি প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করা হয়। আর এ সকল এককের নাম দেয়া হয় 'সরকার'। যশোর অঞ্চলে মাহমুদাবাদ[৩৩], খলিফাতাবাদ এবং ফাতহাবাদ এই ৩টি সরকার অবস্থিত ছিল।[৩৪] এ সময় যশোর অঞ্চল একজন মুঘল কর্মকর্তা কর্তৃক শাসিত হতে থাকে। তিনি যশোরের ফৌজদার নামে খ্যাত ছিলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যের পতনের সময় (সম্ভবত ১৬১০ খ্রিঃ) পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনা বহাল ছিল। ১৭১৭ খ্রিঃ বাংলার সুবাদার হিসেবে মুর্শিদ কুলি খাঁন দায়িত্ব নেয়ার পর প্রশাসনিক কাঠামোয় পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনি ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সুবা কে ১৩টি প্রশাসনিক এককে ভাগ করেন। আর এ সকল প্রশাসনিক একক 'চাকলা' নামে পরিচিত ছিল।[৩৫] যশোর অঞ্চল যশোর এবং ভূষণা নামক দু'টি চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল;[৩৬] এবং প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে যশোর একটি প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক এককের স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৭]

বাংলা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পূর্বে 'আঞ্চলিক প্রশাসন' ৩টি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হত। শান্তি-শৃংখলার দায়িত্বে ছিল ফৌজদার। বিচারের দায়িত্বে ছিল কাযী এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিল

যশোরের ক্ষুদ্রাংশ ফরিদপুরের বৃহৎ অংশ, উত্তর বাকেরগঞ্জ, ঢাকা জেলার একাংশ, দক্ষিণ শাহবাজপুর দ্বীপ ও সন্দ্বীপ (মেঘনার মোহনায়) নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। ফরিদপুর শহর এই ফাতহাবাদ হাবেলী পরগণার মধ্যে অবস্থিত। দ্রঃ *বাংলার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৩২. 'সুবা' নামের উৎপত্তি হয় বাদশাহ আকবরের আমলে। তিনি দশ- বার্ষিকী বন্দোবস্তির সময় রাজস্ব বিভাগগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। এর ভিতরে সুবা একটি। কতকগুলো সরকারের সমন্বয়ে সুবা গঠিত। আর সরকার কতকগুলো দস্তুরের সমন্বয়ে গঠিত; দস্তুর কতকগুলো পরগণা বা মহলের সমন্বয়ে গঠিত। দ্রঃ ইলিয়টের Glossary; আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৫; তবকত-ই-নাসিরি, পৃ. ১৪৮ ও ২৬২ উদ্ধৃত, আকবর উদ্দীন অনূদিত, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৩২৪।

৩৩. বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের নামে সরকার মাহমুদাবাদের নামকরণ হয়েছিল। নদীয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল, যশোরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ও ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। এই সরকারের ছিল ৮৪টি মহল। সান্তোর, নলদী, মাহমুদশাহী ও নসরতশাহী ছিল এর প্রধান মহল। দ্রঃ আকবর উদ্দিন অনূদিত, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৯ ও ৩৫৬।

৩৪. Abul Fazl Allami, *Ain-i-Akbari*, Vol-II, Translated by H.S. Jarret (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 3rd ed., 1978), p.135.

৩৫. A Karim, ***Murshid Quli Khan and His Times*** (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963), p. 79.

৩৬. J. Westland, ***op. cit.***, p. 53.

৩৭. M. M. Siddiquee, ***op. cit.***, p. 28.

Dhaka University Institutional Repository

'আমিল বা তহশিলদার। ফৌজদারের সীমানাকে "সরকার" তহশীলদারের এলাকাকে 'পরগণা'[৩৮] এবং কাযীর এলাকাকে জেলা বলা হত। এগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল একে অপরের অন্তর্ভুক্ত।[৩৯] কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর বিচার, রাজস্ব এবং ফৌজদারী এই ত্রিমুখী দায়িত্ব একজন কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলশ্রুতিতে পূর্বেকার সরকার, জেলা ও পরগণাকে একত্রিত করে একটি প্রশাসনিক একক 'District" বা জেলা গঠিত হয়। তবে এ জেলা গঠনের প্রক্রিয়া কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পরপরই শুরু হয়নি বরং বেশ কিছু পরে তা শুরু হয়েছে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভের পর এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পরও কোম্পানির কর্মকান্ড বাণিজ্য পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় কোম্পানি কতকগুলো অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে এবং বাংলাকে একটি পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্থানে সুপারভাইজার ও কালেক্টর নিয়োগ করে।[৪০] কোম্পানির শাসন কাঠামোয় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস নতুন গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম সমন্বিত জেলা সৃষ্টি করেন; তিনি সারা দেশকে মোট ১৯টি জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর[৪১] নামে একজন জেলা প্রশাসক নিযুক্ত করেন। জেলাগুলোর তালিকায় যশোরের নাম বিদ্যমান।[৪২] এ সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর নিয়ে গঠিত তহশিল বিভাগ একজন কালেক্টরের হাতে

---

৩৮. পরগণা এটি ফার্সী (پرگنه) পরগণাহ এর প্রতিশব্দ, যার অর্থ অনেকগুলো গ্রামের সমষ্টি; জেলার অংশ বিশেষ। দ্রঃ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৭১৯; রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থে পরগণার অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, পরগণা এর প্রতিশব্দ মহল; পরগণা বা মহল মুঘল সম্রাটদের অধীনে স্থানীয় প্রধানদের অধীনস্থ এক একটি রাজস্ব বিভাগের প্রাথমিক স্তর, দ্রঃ আকবর উদ্দিন অনূঃ *বাংলার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪।

৩৯. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশ শাসন কাঠামো* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১৭৪।

৪০. M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 29.

৪১. জেলায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান ব্যক্তির পদবী ছিল কালেক্টর।

৪২. জেলাগুলোর নাম যথাক্রমে, হুগলী, মোহাম্মদশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বীরভূম, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, লশকরপুর, রোকনপুর, ত্রিপুরা, কালিন্দা, নোয়াখালী, জাহাঙ্গীরপুর, চুনাখালী, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও কলকাতা প্রভৃতি। দ্রঃ Raj Monohar Chakrabatti Bahadur, ***Summary of changes in the Jurisdiction of District in Bengal, 1757-1916*** (Calcutta: Bengal Secratariat press, 1918), pp. 9-10; ডঃ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

অর্পণ করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে নানা সমস্যাজনিত কারণে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৪৩] ১৭৭৩ সনে জেলা প্রথা প্রত্যাহার করে প্রদেশ প্রথা চালু করা হয়; এ প্রথায় মোট জেলা সংখ্যা ছিল ২৮।[৪৪]

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে হেংকেল সাহেব যশোরের মুড়ুলীতে প্রতিষ্ঠিত আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন।[৪৫] এ সময়ে বর্তমান মাগুরা নড়াইল, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর এবং ইছামতি নদীর পূর্বতীরে চব্বিশ পরগণা জেলার অংশের উপরও এ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। [৪৬] অতঃপর ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে মোটামুটিভাবে ঈশপপুর[৪৭] ও সৈয়দপুর[৪৮] পরগণা সমষ্টি বা চাঁচড়া রাজ্য নিয়ে যশোর জেলা গঠিত হয়। এটিই বাংলার প্রথম জেলা এবং টিলম্যান হেংকেল ছিলেন এর প্রথম কালেক্টর।

সীমারেখা ও এর বিবর্তন ঃ

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেলা গঠনের সময় যশোরের সীমানা ছিল উত্তরে পোড়াদহ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে মধুমতি নদী এবং পশ্চিমে যথাক্রমে উত্তর থেকে চুয়াডাঙ্গা, মহেশপুর, বনগাঁ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা, ঈশ্বরীপুর ও ধুমঘাট দ্বারা পরিবেষ্টিত।[৪৯] তবে বিভিন্ন সময় যশোর জেলার এই সীমানার পরিবর্তন, পরিবর্ধন সূচিত হয়। বলা আবশ্যক, বাংলার বিভিন্ন স্থানে কোম্পানি প্রশাসন তাদের সুবিধার্থে প্রথমে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা প্রতিষ্ঠা করলেও পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় ঐ সমস্ত জেলার সীমানার পরিবর্তন করে। যশোর জেলার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় এ রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়। যে সকল কারণে বাংলার জেলা সমূহের সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে এ পর্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

---

৪৩. সতীশ চন্দ্রমিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলকাতা) পৃ. ৭০২।

৪৪. R. M. C. Bahadur, *op. cit.*, p. 11.

৪৫. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৬-৮৭।

৪৬. J. Westland, *op. cit.*, p. 54.

৪৭. পূর্ব দিকে ভৈরব ও পাসার নদী থেকে পশ্চিমের ইছামতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এ জমিদারি/ পরগণা অবস্থিত ছিল। এর উত্তর সীমানা ছিল কলকাতা থেকে যশোর হয়ে ঢাকা যাওয়ার মহাসড়ক বরাবর। cf: J. Westland, *op. cit.*, p. 54.

৪৮. সৈয়দপুর জমিদারি, মূল সৈয়দপুর জমিদারির বারো আনা অংশ। এ জমিদারির চার আনা অংশ একজন মুসলিম জমিদারের জন্য আগেই ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। প্রথমোক্ত অংশ সৈয়দপুর পরগণা ও শাহুর পরগণা এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। এদের নাম এসেছিল সৈয়দপুরের নাম থেকে। cf: *Ibid.*

৪৯. মোঃ রেজাউল করিম, "*যশোর জেলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২: একটি সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক সুবিধার্থে ঃ (ক) জেলা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলোর আয়তন ছিল বিশাল। এ জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা সমূহ জেলা শহর ছাড়া এর অন্যান্য অংশের উপর সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হত। ফলে চুরি, ডাকাতি, হত্যা নারী ধর্ষণসহ সার্বিক আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটত। এ সকল সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ নিরসনের জন্য সরকার আইন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে কোম্পানি পুরাতন সীমানার পরিবর্তন করে নতুন জেলা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।[৫০]

(খ) প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের কাজের পরিমাণ কম থাকলেও ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫১] এজন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা এবং গুটিকয়েক কর্মচারীর পক্ষে একটি বৃহৎ এলাকার কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেকারণে জেলা প্রশাসনের কাজের চাপ হ্রাস করার জন্য বৃহদাকার জেলা সমূহ ভেঙ্গে একাধিক জেলা গঠন করা হয়। এছাড়া ক্ষুদ্র জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ জেলার একাংশকে সম্পৃক্ত করে অবস্থা নিরসনের চেষ্টা চালানো হয়। যে কারণে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে হিজলী ও তমলুককে এবং আলীপুরের সাথে বারাসাতকে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়।[৫২]

বিদ্রোহ দমনার্থে ঃ জেলার সীমারেখা পরিবর্তনের আর একটি কারণ এ অঞ্চলের আদিবাসীদের সংযমী মনোভাবের অভাব ও তাদের আক্রমণাত্মক আচার-আচরণ। আদিবাসীদের এহেন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সীমান্ত এলাকায় কোন কোন সময় বিদ্রোহ দেখা দিত। এছাড়াও তাদের কর্মকান্ডে বসতিপূর্ণ এলাকায় লুটতরাজ, ঘরবাড়ি জ্বালানো, হত্যা এবং নারী নির্যাতন ইত্যাকার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেত। এ সমস্ত হিংস্র-বন্য জাতিকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার কয়েকটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ রকম পদক্ষেপের ফলে দার্জিলিং, চট্টগ্রাম, পাহাড়ি এলাকা, সাওতাল পরগণা এবং জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয়, ফলে যশোর জেলার সীমানারও পরিবর্তন সূচিত হয়।[৫৩]

অর্থনৈতিক/ রাজস্ব সংক্রান্ত কারণ ঃ কোম্পানি প্রশাসনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায় করা। মূলত রাজস্ব আদায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করেই তাদের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হত। এজন্য কতকগুলো অর্থনৈতিক নীতিও তারা গ্রহণ করে। যেগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাকে তারা একটি প্রশাসনিক পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করে।[৫৪] পরীক্ষার অংশ হিসেবে

---

৫০. R. M. C. Bahadur, *op. cit.*, p. 23.

৫১. প্রথমদিকে জেলা প্রশাসনের কর্তৃত্ব আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে দেওয়ানী প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্বও তার উপর অর্পিত হয়। ফলে জেলা কর্তৃপক্ষের কাজের চাপ বেড়ে যায়।

৫২. R. M. C. Bahadur, *op. cit.*, p. 24.

৫৩. *Ibid.*

৫৪. M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 18.

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন স্থানে সুপারভাইজার, কালেক্টর বা বিচারক নিয়োগ আবার বিভিন্ন সময় তাদের প্রত্যাহার বা পদের বিলুপ্তি এ সকল পদক্ষেপ জেলা গঠন ও এর সীমানা পরিবর্তনের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে।[৫৫]

জমিদার ও সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদাররা তাদের নিজস্ব এলাকা বিক্রি করার অধিকার লাভ করে। নতুন ক্রেতারা তাদের সুবিধার্থে সরকারের নিকট ক্রয়কৃত জমিদারির অংশ নিজ জেলায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করা হত। এছাড়া অনেক সময় কোন জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার নাগরিক কোন কারণ দেখিয়ে তাদের গ্রামকে পার্শ্ববর্তী জেলার সাথে সংযুক্তির আবেদন জানালেও তা সদয় বিবেচনা করা হত। ফলে এসব কারণও জেলার সীমানা পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ভৌগোলিক কারণ ঃ

বেশ কিছু এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও জেলার সীমানার পরিবর্তন করা হত। জনগণের সুবিধার্থে জেলা শহরের নিকটবর্তী অন্য জেলার কোন গ্রাম বা পরগণাকে ঐ নিকটবর্তী জেলায় স্থানান্তর করা হয়। আবার অনেক এলাকা জেলা শহরের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বাধার কারণে অন্য জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হত। ভূমি জরিপের সময় যে সব অঞ্চলের অংশ বিশেষ ভুলবশত এড়িয়ে যেত পরবর্তীতে তা সুবিধামত জেলার সাথে সংযোগ করে দেয়া হত।[৫৬] এছাড়াও নতুন ভূ-খন্ড অধিকার এবং নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলেও জেলার সীমারেখার পরিবর্তন তরান্বিত হয়।[৫৭]

বাংলার জেলা সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জেলা প্রতিষ্ঠা ও এর সীমারেখা পরিবর্তনে উপরোক্ত কারণগুলোর কোন না কোনটি দায়ী ছিল। যশোর জেলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে যশোরকে যখন জেলা হিসেবে গঠন করা হয় সেখানে একজন কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। এ সময় মাহমুদশাহী[৫৮] ও ভূষণা পরগণা[৫৯] এ রাজস্ব এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিলনা বরং নলদী

---

৫৫. R. M. C. Bahadur, *op. cit.*, p. 25.

৫৬. M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 19.

৫৭. R. M. C. Bahadur, *op. cit.*, pp. 24-25.

৫৮. বর্তমান কালে যশোর জেলার যে ভৌগোলিক সীমারেখা পরিদৃষ্ট হয় এর উত্তরাংশ জুড়ে ছিল মাহমুদ শাহী পরগণা। cf.: J. Westland, *op. cit.*, p. 50.

৫৯. যশোরের অন্যতম বৃহৎ পরগণা ছিল ভূষণা পরগণা। এটি যশোরের উত্তরাঞ্চল সহ ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরগণা বা ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬০] অবশ্য মাহমুদশাহী পরগণা ১৭৮৭ খ্রিঃ ও নলদী সহ ভূষণা পরগণাকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে যশোরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬১]

এ সময় যশোর একটি বৃহৎ জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে যশোর, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী এবং ঢাকার সীমানার পুনর্বিন্যাস করা হয়।[৬২] ফলশ্রুতিতে নওয়াপাড়া ও কুষ্টিয়া-মুর্শিদাবাদ থেকে যশোরে স্থানান্তর করা হয় এবং জোদিয়া ও গজনবিপুর যশোর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬৩] পরিবর্তিত সীমানানুযায়ী ঝিকরগাছার নিকট কপোতাক্ষ নদ জেলার পশ্চিম সীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়। ঝিকরগাছা থেকে বনগ্রাম যাওয়ার রাস্তার উত্তরাংশকে যশোর জেলা হতে বিচ্ছিন্ন করে নদীয়া জেলার সাথে যুক্ত করা হয়। কিন্তু দক্ষিণাংশ অর্থাৎ কপোতাক্ষ ও ইছামতির মধ্যবর্তী অঞ্চল যশোরের মধ্যেই রয়ে যায়।[৬৪] প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মীর্জানগরকে নদীয়া থেকে যশোরে স্থানান্তর করা হয়।[৬৫]

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে যশোর এবং বাকেরগঞ্জ উভয়ের সীমানা নির্ধারণকল্পে ঝিনঝুনিয়া ঝিল, বালেশ্বর এবং গোপালগঞ্জ থেকে মকছেদপুর পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তাকে যাশোর জেলার পূর্ব সীমানা নির্ধারণ করা হয়। একই কারণে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে বারাসিয়া, মধুমতি এবং বালেশ্বর স্থানীয় প্রশাসনের সুবিধার্থে তকিয়া থানা যশোর থেকে নদীয়ায় স্থানান্তর করা হয়।[৬৬] ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবনের জন্য একজন কমিশনার নিয়োগ করা হয় কিন্তু প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড উন্নয়ন কল্পে এ পদ বিলুপ্ত করে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবনের মূল অংশকে যশোরের সাথে সংযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ডাকাতি ও অসামাজিক কার্যকলাপরোধ কল্পে যশোরের ধরমপুর, কুষ্টিয়া, মধুপুর এবং খোকসা থানা এবং রাজশাহীর কিছু থানা

---

৬০. L. S.S. O'Malley, ***Bengal District Gazetteers Jessore*** (Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot. 1912), p. 43.

৬১. J. Westland, ***op. cit.***, p. 73; ***যশোহর খুলনার ইতিহাস***, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০২; M. M. Siddiquee, ***op. cit.***, p. 20.

৬২. L. S.S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 44; ***যশোহর খুলনার ইতিহাস***, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০২।

৬৩. R. M. C. Bahadur, ***op. cit.***, p. 45; L. S.S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 43.

৬৪. ***যশোহর খুলনার ইতিহাস***, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০২; M. M. Siddiquee, ***op. cit.***, p. 21.

৬৫. R. M. C. Bahadur, ***op. cit.***, p. 45.

৬৬. M. M. Siddiquee, ***op. cit.***, p. 21.

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে পাবনা জেলা গঠন করা হয়। [৬৭] ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে খুলনাকে মহকুমায় পরিণত করা হয়। এটাই বাংলার সর্বপ্রথম মহকুমা।[৬৮]

এ সময় বাগেরহাট, যশোর সদর ও নড়াইলের কিছু অংশ এ মহকুমার শাসনাধীন ছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে কচুয়া থানা বাকেরগঞ্জ থেকে যশোরের সাথে এবং কোটচাঁদপুর থানার একটা অংশ যশোর থেকে নদীয়ার সাথে সংযুক্ত হয়।[৬৯] নীল আন্দোলনের ফলে ১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং যশোর পৃথক পৃথক মহকুমায় পরিণত হয়। [৭০] আর এ সনেই (১৮৬১) সাতক্ষীরা মহকুমার সৃষ্টি হয়। অবশ্য ২ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এটি চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটও একটি পৃথক মহকুমায় পরিণত হয়।[৭১]

এ সন থেকেই (১৮৬৩) পুনরায় জেলার সীমানা পুনর্গঠন করা হয়। সতীশ চন্দ্রমিত্র ও W.W. Hunter এর বর্ণনা থেকে এ সময়কালে যশোরের সীমানার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭২]

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মধ্য হতে খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা এবং চব্বিশ পরগণা থেকে সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে পৃথক খুলনা জেলা গঠিত হয়[৭৩] এবং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বনগাঁ মহকুমাকে নদীয়া

---

৬৭. R. M. C. Bahadur, *op. cit.,* p. 45.

৬৮. J. Westland, *op. cit.*, p. 221; *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০২

৬৯. R.M.C. Bahadur, *op. cit.*, p. 45.

৭০. L. S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 44; এ সম্পর্কে K.G.M. Latiful Bari বলেন- Jessore has undergone a long series of changes with regard to its area, almost from the date of its establishment as a separate district, In 1860-61 as a result of the indigo trubles separate subdivisions were created with head quarters at khulan, Jhenidah, Magura, Narail and Jessore. cf.: *Bangladesh District Gazetteers Jessore*, pp. 1-2.

৭১ *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৩।

৭২. সতীশ বাবুর বর্ণনা মতে- এ সময় জেলার সীমানা ছিল পূর্বে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা, উত্তরে নদীয়া জেলা, পশ্চিমে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলা এবং দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও বঙ্গোপসাগর। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩; W.W. Hunter এ সম্পর্কে বলেছেন- Jessore is bounded of the north by Nadiya districtt, on the east by Faridpur, on the south by the Sundarbans and of the west by Nadiya. cf: W.W. Hunter, ***A statistical Account of Bengal*** (Delhi: DK Publishing house. first reprint, 1973), pp. 169-70.

৭৩. *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৩; K.G.M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 1; R.M.C. Bahadur, *op. cit.*, p. 23; L. S.S. O'Malley এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- In 1882 the sub-division of Khulna and Bagherhat were separated from Jessore and formed into the district of

Dhaka University Institutional Repository

থেকে যশোরের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৭৪] L. S.S. O'malley তার 'Report'-এ এসময়ে যশোর জেলার একটি সম্ভাব্য সীমারেখার বর্ণনা প্রদান করেছেন।[৭৫] এ সকল নতুন জেলা সৃষ্টির ফলে যশোরের সীমানারও পরিবর্তন সাধিত হয়। উল্লেখ্য, প্রশাসনিক সুবিধার্থে এ সব পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় অবশ্যম্ভাবীভাবে যশোরের সীমানার পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময়ে যশোরের সীমানার উল্লেখ করতে গিয়ে K.G.M. Latiful Bari বলেন- যশোরের উত্তরে কুষ্টিয়া, পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলা ও পশ্চিম বাংলার নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণা জেলা। আর দক্ষিণে খুলনা এবং পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে ফরিদপুর জেলা এছাড়া গড়াই বা মধুমতি নদী এই প্রাকৃতিক সীমানা যশোর ও ফরিদপুরের মধ্যবর্তী সীমারেখা টেনে দিয়েছে।[৭৬]

জনসংখ্যা ঃ

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় কোন আদম শুমারি না হওয়ায় এ সময়ের মধ্যে বাংলার অন্তর্ভুক্ত জেলা হিসেবে যশোর জেলার জনসংখ্যারও সঠিক কোন পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক রিপোর্টে অনুমান নির্ভর কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[৭৭]

---

khulna with the Satkhira subdivision of the 24 parganas, cf.: L. S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 44.

৭৪. R.M.C. Bahadur, *op. cit.*, p. 45; L. S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 44; এ সম্পর্কে K.G.M. Latiful Bari উল্লেখ করেছেন- In 1883 the Bangoan sub-division of Nadiya was aded to this (Jessore) District, cf.: ***Bangladesh District Gazetteers***, p. 1.

৭৫. L. S.S. O'Malley এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- Jessore is bounded on the east by the Faridpur district, on the north and west by Nadia, and on the south by the 24 parganas and Khulna. On the east and north east the Garai or Madhumati river consitutes a natural boundary for a considerable distance. cf.: L.S.S. O'Malley, *op. cit.*, p.-1.

৭৬. K.G.M. Latiful Bari তার Report এ উল্লেখ করেন- The district is bounded on the north by the district of Khulna, On the west by the district of Kushtia and the district of Novadwip of west Bengal (India) and 24 parganas (west Bengal), On south by the district of Khulna and on the east and north-east by the district of Faridpur. The Garai or the Madhumati river constitutes a natural boundary for a considerable lenth between Jessore and Faridpur. cf.: K.G.M. Latirul Bari, *op. cit.*, p. 2.

৭৭. ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে যশোরের কালেক্টর জেলার জনসংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করেন। তাঁর হিসেব মতে সে সময়ে যশোরের জনসংখ্যা ছিল ১০৫৬১০৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৫৪৭২৫০ জন ও মহিলা ৫০৮৮৫৯ জন। cf.: J. Westland, *op. cit.*, p. 137.

Dhaka University Institutional Repository

W.W. Hunter তার বর্ণনায়, যশোর জেলার জনসংখ্যা নিরূপণে ৪টি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয়টি ১৮৫৬-৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, তৃতীয়টি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এবং সর্বশেষ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদম শুমারি রিপোর্ট।[৭৮]

প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে যশোরের তৎকালীন কালেক্টর জেলার জনসংখ্যা ১২০০০০০ বলে নির্ধারণ করেন।[৭৯] অবশ্য সে সময়ে ফরিদপুরের বৃহৎ একাংশ যশোরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮০] তাঁর হিসেব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৫৬% ছিল মুসলমান।[৮১]

১৮৫৬-৬৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার জনসংখ্যা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সার্ভে বিভাগ কর্তৃক একটি জরিপ পরিচালিত হয়। এ জরিপ অনুযায়ী সে সময়ে যশোরের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯০৯৮৭৫ জন[৮২] এবং মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৫৭৮টি।[৮৩] এ জরিপটিও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ জেলার গ্রামগুলোর বসতবাড়ি হিসেব করে বাড়ি প্রতি ৫ জন লোক ধরে এ শুমারি করা হয়। এ হিসেব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৪৭৮১৬০ জন ছিল মুসলমান ও ৪৩১৭১৫ জন ছিল হিন্দু।[৮৪]

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতির আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কালেক্টর জেমস ওয়েস্টল্যান্ড গ্রাম পাহারাদারদের মাধ্যমে ছাপানো ফরম বিতরণ করেন। পরিবারের

---

৭৮. W.W. Hunter, *op. cit.*, p. 185.

৭৯. H. Beverley, ***Report on the census of Bengal 1872*** (Calcutta: Bengal Secretaiate press, 1872), p. 98; সে সময়ে জেলার গ্রাম সংখ্যা ছিল ১২ হাজার এবং প্রতি গ্রামে গড়ে ১০০ জন লোক হিসেব করে এই সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। তৎকালীন কালেক্টর এ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন- There are about 12000 villages, and they contain on an average 1000 inhabitants apiece. cf.: J. Westland, op. cit., p. 137.

৮০. K.G.M. Latirul Bari, ***op. cit.,*** p. 47; W.W. Hunter, ***op. cit.***, p. 185.

৮১. H. Beverley, ***op. cit.***, p. 135; J. Westland, ***op. cit.***, p. 137.

৮২. উক্ত জনসংখ্যা নিরূপণের সময় ফরিদপুর যশোরের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। W.W. Hunter, ***op. cit.***, p. 185; K.G.M. Latirul Bari, ***op. cit.,*** p. 47.

৮৩. H. Beverley, ***op. cit.,*** p. 135; K.G.M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 47.

৮৪. K.G.M. Latiful Bari বলেন- The Census being based on an enumeration of the houses, and allowing five persons to each house. The houses were found to number 1885 masonry, and 180090 mud and thatch houses. Of the total population thus estimated, 478160 were returned as muslims and 431715 Hindus. cf.: ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 47.

Dhaka University Institutional Repository

কর্তারা এ সব ফরম পূরণ করেন।[৮৫] শুমারি অনুযায়ী সে সময়ে যশোরের লোক সংখ্যা ছিল ১৫২৪৮০৭ জন এবং বসতবাড়ির সংখ্যা ছিল ২২৯৭৪৬টি।[৮৬] এ শুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৮৩৩৫০২ জন ছিল মুসলমান; ৬৯০৯০৮ জন ছিল হিন্দু এবং ৩৯৭ জন ছিল খ্রিস্টান।[৮৭]

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আদম শুমারির[৮৮] রিপোর্ট অনুযায়ী যশোরের মোট জনসংখ্যা ছিল ২০৭৫০২১ জন এবং বসতবাড়ির সংখ্যা ছিল ৩১৩৬৬০ টি। অবশ্য এই জরিপ পরিচালিত হয়েছিল যশোরের ৩৬৫৮ বর্গমাইল সীমানা নিয়ে।[৮৯]

L.S.S. O'malley তাঁর 'Bengal District Gazetters Jessore'-এ ১৮৭২ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫টি শুমারি রিপোর্টের (যেগুলো প্রতি দশ বছর পর পর) উল্লেখ করে সে সময়ে যশোরের জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছেন। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৭২ সনে যশোরের জনসংখ্যা ছিল ১৪৫১৫০৭ জন, ১৮৮১ সনে ১৯৩৯৩৭৫ জন, ১৮৯১ সনে ১৮৮৮৮২৭ জন, ১৯০১ সনে ১৮১৩১৫৫ জন, ১৯১১ সনে ১৭৫৮২৬৪ জন। তাঁর এ বর্ণনায় শুধু ১৮৮১ সনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে, এ সনে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৬৬৩ জন। আর অবশিষ্ট সনগুলোতে যথাক্রমে ১৮৯১ এ শতকরা ২.৬ ভাগ, ১৯০১ 'সনে শতকরা ৪ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। তিনি ভূ-প্রকৃতির প্রতিকূলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ম্যালেরিয়া, কলেরার মতো মহামারিতে জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহারের

---

[৮৫]. In the autumn of 1869, Mr. James westland the acting collector, took a census by means of printed forms filled in by the chief inhabitation. cf.: W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 185; K.G.M. Latiful Bari, *op.cit.*, p. 47.

[৮৬]. H. Beverley, *op. cit.*, p. 98; W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 185; K.G.M. Latiful Bari, *op.cit.*, p. 47; মোঃ নূরুল ইসলাম, *খুলনা জেলা* (খুলনাঃ জেলা প্রশাসন কার্যালয়, ১৯৮২), পৃ. ২৯৭।

[৮৭]. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 187; K.G.M. Latiful Bari, *op.cit.*, p. 47.

[৮৮]. বস্তুত এই শুমারিই আধুনিক পরিসংখ্যান বিজ্ঞান ভিত্তিক আদম শুমারির সূত্রপাত। শুমারির জন্য এলাকার বিশিষ্ট লোকদের নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শুমারকারদের কাজ তদারকীর জন্য উপ-পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। মহকুমা সমূহকে শুমারি বুকে ভাগ করা হয়। cf. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 188.

[৮৯]. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 185; K.G.M. Latiful Bari, *op.cit.*, p. 47; H. Beverley, *op. cit.*, p. 98; উল্লেখ্য, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেমস ওয়েস্টল্যান্ডের জরিপের সাথে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদম শুমারির ফলাফলের বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আদম শুমারি রিপোর্টে ওয়েস্টল্যান্ডের রিপোর্ট সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। তবে অনেক ঐতিহাসিক ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ খ্রিঃ এই মধ্যবর্তী সময়ে যশোরের সীমানা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা ও বসতবাড়ি বৃদ্ধির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৯০] এছাড়া ১৮৮২ সনে খুলনা-যশোর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক জেলায় রূপান্তরিত হওয়ায় সীমানা সংকোচন এই জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

১৯২১ সনের আদম শুমারি অনুযায়ী যশোরের লোকসংখ্যা ১৭২২২১৯ জন যার মধ্যে ৮৯৩৫৯২ জন পুরুষ ও ৮২৮৬২৭ জন মহিলা। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৫৯৩ জন। এ সনেও জনসংখ্যা শতকরা ১.২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।[৯১]

১৯৩১ সনের আদম শুমারি অনুযায়ী যশোরের লোকসংখ্যা ১৬৭১১৬৪ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৮৭১৪৪৬ জন ও মহিলা ৭৯৯৭১৮ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৫৭৬ জন। এ জরিপে আরও শতকরা ৩ ভাগ জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এ ১০ বছরের ব্যবধানে এ পরিমাণ জনসংখ্যা হ্রাসের পিছনে দেশান্তর ও অভিবাসন হয়ে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী; জনসাধারণ এবং শ্রমিক শ্রেণী স্বদেশ (কলকাতা) প্রত্যাগমনকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মৃত্যু প্রায় নদীর জলাবদ্ধতায় মশার উপদ্রব বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এটাও জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।[৯২]

১৯৪১ সনের জরিপ অনুযায়ী যশোরের লোকসংখ্যা ১৮২৮২১৬ জন। যার ৯৫৭৮৭৬ জন পুরুষ এবং ৮৭০৩৪০ জন মহিলা।[৯৩] জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৬৫১ জন। উল্লেখ্য, জেলার সর্বত্র জনসংখ্যার ঘনত্ব একরকম ছিলনা। যশোরের উত্তর-পূর্বের থানা সমূহে জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি। অন্যদিকে খুলনা, বাগেরহাট এবং নড়াইলের একাংশে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই কম। এ অংশের অনেক জায়গাই জনাকীর্ণ ও জনবিরল।[৯৪]

---

৯০. This decadence has therefore continued for 20 years, representing a loss of 1,81,111 and the reasons for it are patent for Jessore is a land of moribund rivers and obstructed drainage. The banks of the rivers are higher than the country behind them and depressions are thus formed between the main water courses ... The loss of population was greatest in the country running west and south west from the Mohammadpur thana on the eastern boundary which possesses the evil reputation of having been the matrix both of epidemic cholera and of Burdwan fever. cf.: L.S.S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 45.

৯১. K.G.M. Latiful Bari, ***op.cit.,***p. 48.

৯২. ***Ibid***, p. 50.

৯৩. ***Ibid***.

৯৪. এ থানা সমূহ যশোর সদর, ঝিনাইদহ এবং মাগুরা মহ কুমায় অবস্থিত। cf.: J. Westland, ***op. cit.***, p. 2.

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপ ঃ

যশোর জেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপ সাধারণত উর্বর ও সমতল। জেলার সমগ্র অঞ্চল বিভিন্ন নদী প্রবাহ দ্বারা বিভক্ত।[৯৫] ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপের উপর ভিত্তি করে সমগ্র যশোর জেলাকে কেশবপুর থেকে মুহম্মদপুর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকগামী একটি সরলরেখা এবং বাগেরহাটের সমান্তরালে পূর্ব পশ্চিম দিকগামী অন্য একটি সরল রেখা কল্পনার মাধ্যমে তিনটি স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত করা যায়।[৯৬] এই কল্পিত প্রথম রেখাটির উত্তর এবং পশ্চিম দিকের অংশ জেলার উচচ ভূমি। এখানকার নদী প্রবাহ নাগালের বাইরে এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ছাড়া তা দু'পাশের ভূমিকে প্লাবিত করেনা। এখানকার জমিতে সামান্য পলি রয়েছে। এ অঞ্চলকে বন্যা মুক্তও বলা যায়।[৯৭] এ অঞ্চলে প্রচুর খেজুর গুড়, চিনি এবং ধান উৎপন্ন হয়। এখানকার প্রধান ধান আউশ। কিছু কিছু জমিতে আমন ধানও উৎপন্ন হয়। অবশ্য ধান উৎপাদনে এ অঞ্চল স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। এখানে শাক-সব্জি ও শীতকালীন ফসল বেশি উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চলের আবহাওয়া তুলনামূলক তৃপ্তিদায়ক।

জেলার মধ্যভাগ নিচু এবং জলাকীর্ণ। নদীগুলোর প্রবাহ কখনও অগ্রগামী আবার কখনো পশ্চাৎমুখী। অসংখ্য বিলে ভরপুর এ অঞ্চল বিভিন্ন খালের মাধ্যমে নদীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বছরের অধিকাংশ সময় এ অঞ্চলে পানি জমে থাকে। এমনকি শুষ্ক মৌসুমেও লোকজনের যাতায়াত এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। বন্যা বিধৌত এ অঞ্চল ব-দ্বীপীয় পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এখানকার উচ্চভূমি নদী সমতল। সমতল ভূমিতে জমি অনেকটা ঢালু। এজন্য নদীর পানি বিল হয়ে খালের মাধ্যমে আবার নদীর সাথে সংযুক্ত হয়। নদী সমতল জমি উঁচু এবং বাকী অঞ্চল নিচু হওয়ায় এখানকার জমি গামলা বা বেসিন আকৃতির সাথে তুলনা করা যায়। এই এলাকার পশ্চিমাংশে শুষ্ক অঞ্চল কম হওয়ায় জনবসতিও বেশ কম। অবশ্য নদী তীরবর্তী এলাকা কিছুটা উঁচু এবং বসবাস উপযোগী।[৯৮] এই এলাকার পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আর নদীগুলোও বেশ প্রবাহমান। এখানে নদীর তীর সংলগ্ন অঞ্চলে একাধিক বড় বড় গ্রাম ও জনবসতি গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে প্রচুর ধান জন্মায়। জলমগ্ন এলাকায় অবশ্য তেমন চাষাবাদ হয়না।[৯৯]

---

৯৫. বিভিন্ন নদী প্রবাহ যশোর জেলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে। এর পূর্বসীমা অর্থাৎ মধুমতি থেকে কুমার-নবগঙ্গা, চিত্রা ইত্যাদি নদী পর্যন্ত প্রথম ভাগ। কুমার-নবগঙ্গা-চিত্রা থেকে কপোতাক্ষ নদ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ এবং কপোতাক্ষ থেকে ইছামতি-যমুনা পর্যন্ত তৃতীয় ভাগ। এই তিনটি ভাগের প্রত্যেকটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু। দ্রঃ ***যশোহর খুলনার ইতিহাস***, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

৯৬. J. Westland, ***op. cit.***, pp. 1-2.

৯৭. W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 1.

৯৮. J. Westland, ***op. cit.***, p. 2.

৯৯. L.S.S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 3.

Dhaka University Institutional Repository

জেলার দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ দ্বিতীয় সরল রেখাটির দক্ষিণের অংশ বিভিন্ন খাল ও নদী দ্বারা বিভক্ত সমতল ভূমি। এ অঞ্চল জেলার মধ্যভাগ থেকে কিছুটা উঁচু বলে মনে হলেও বাস্তবে তেমন উঁচু নয়; উত্তরের উঁচু ভূমির ঠিক নিচে অবস্থানের কারণে মধ্যভাগের ভূমিকে অনেকটা নিচু বলে অনুমান করা হয়। জেলার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ এলাকা নিয়ে দক্ষিণের নিচু অঞ্চল বিস্তৃত। যা সুন্দরবনে গিয়ে পৌঁছেছে। অ-জরিপকৃত সুন্দরবন হল এর অবশিষ্টাংশ।[১০০] দক্ষিণের এই অঞ্চলে নদীর দুই কূল ব্যতীত অন্যত্র তেমন জন বসতিও বিস্তৃতি লাভ করেনি, এভাগের অধিকাংশ ভীষণ জঙ্গলে আবৃত। এ অঞ্চলে দু'একটা নারকেল গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ জন্মেনা বললে চলে।[১০১] যশোর জেলার মাটি মেটেল, দোয়াশ ও বেলে এই তিনভাগে বিভক্ত।[১০২] বিল অঞ্চলের মেটেল মাটিতে রবিশষ্য ভাল জন্মায়। দোয়াশ মাটিতে আউশ ধান, পাট ও রবিশস্য ভাল হয়। এখানকার বেলে মাটি কৃষি কাজের জন্য বিশেষ উপযোগী।[১০৩]

নদ-নদী ও খাল-বিল ঃ

নদীমার্তৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতিহাসের পাতায় সুপরিচিত। বিশেষত যশোর অঞ্চলে এই নদীই সব। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় শিরা-উপশিরার মত অসংখ্য নদ-নদী এবং খাল-বিল এ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যা জেলার ইতিহাসকেও প্রভাবিত করেছে। এজন্য ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনার প্রেক্ষিতে যশোর জেলার নদ-নদী ও খাল-বিল সম্পর্কে একটা সম্যক আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভৌগোলিক দিক থেকে যশোর জেলার অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- পদ্মা, ভাগীরথী এবং ব্রহ্মপুত্রের সংগম স্থলের ব-দ্বীপাংশের মধ্যভাগ দিয়ে যশোর জেলা গঠিত। এ জেলার বিস্তীর্ণ পলিময় সমতলভূমি নদী ও জলখাত দ্বারা বেষ্টিত।[১০৪] যশোর জেলার প্রধান নদীগুলো হলঃ কুমার, নবগঙ্গা, ভৈরব,

---

[১০০]. J. Westland, *op. cit.*, p. 2.

[১০১]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

[১০২]. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- M. A. Mommen, ***Final Report on the survey and settlement operation in the District of Jessre, 1920-24*** (Calcutta: Bengal secretariate Book Depot, 1925) ; K.G.M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 4.

[১০৩]. D. N. Mookerjee, ***Note on the soil of Bengal*** (Calcutta: Bengal Secrtariate press, 1909), p. 22.

[১০৪]. শ্রী নগেন্দ্র বসু (সংকলিত), *বিশ্বকোষ*, পঞ্চম ভাগ (কলিকাতাঃ বসু এ্যাণ্ড কোং, ১৩১১ বাং), পৃ. ৬৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

কপোতাক্ষ ইত্যাদি। এ সকল নদী ১০/১৫ মাইল পর পর প্রবাহিত হয়ে জেলার ভূ-খন্ডকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করেছে, পাশাপাশি এ অঞ্চলের জন জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাবও বিস্তার করেছে। এ জেলার উত্তরাংশে কুমার নদী, পূর্বে গড়াই-মধুমতি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদ। এ সকল নদী পদ্মা থেকে উৎপত্তি হয়ে জেলার একাধিক অঞ্চলের উপর দিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণাভিমুখী সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

যশোর জেলার অধিকাংশ নদীই পদ্মা নদীর (গঙ্গার) শাখা বা প্রশাখা।[১০৫] ফলে পদ্মার গতিপথ পরিবর্তন এ অঞ্চলের নদীগুলোর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ জেলার উত্তর দিকে পদ্মা নদীর অবস্থান। ফলশ্রুতিতে জেলার অধিকাংশ নদীই উত্তর দিক থেকে এ জেলায় প্রবেশ করেছে। বলা আবশ্যক, এ জেলার জমি উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু। যে জন্য অধিকাংশ নদীই দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ববাহী। অবশ্য কিছু খাল জাতীয় নদীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- কুষ্টিয়ার কাছে গৌরী অর্থাৎ গড়াই নদী পদ্মা হতে বের হয়ে কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে উত্তর পূর্ব কোণে যশোরে প্রবেশ করেছে।[১০৬] এ নদী দক্ষিণ পূর্ব দিকে কুমারের সাথে মিলিত হয়েছে এবং পরে কুমারের শাখা বারাসিয়া হয়ে এলেংখালি নামে একটি পৃথক শাখায় প্রবাহিত হয়েছে।[১০৭] গড়াই নদী পূর্বে অত্যন্ত প্রবল ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এর পূর্বের অবস্থা হ্রাস পায়।

যশোর জেলার সবচেয়ে পুরাতন নদীটির নাম কুমার। এটি আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের কাছে মাথাভাঙ্গা থেকে উৎপত্তি হয়ে যশোর ভূ-খন্ডে প্রবেশ করেছে।[১০৮] এ নদী দক্ষিণ পূর্ব দিকে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে জেলার মধ্যে প্রায় ২০ মাইল ভূ-খন্ডকে বিভক্ত করেছে।[১০৯]

---

[১০৫]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩।

[১০৬]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮; এ্যাডাম উইলিয়ামস বলেন- ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে গড়াই নদীর উৎপত্তি স্থল থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে নদীর প্রস্থ ছিল ১৩০ থেকে ২০০ গজ এবং পানি ছিল ১৫-৬০ ফুট। ১.২৫ মাইল ভিতরে নদীর গভীরতা হ্রাস পেয়ে ৪/৫ কিউবিট হয়। cf.: Addams William, ***History of the river in the Gangetic Delta 1750-1918*** (Calcutta: Bengal Secretariate press, 1919), p. 52.

[১০৭]. বারাসিয়া ও কুমার মোঘল আমলে ফতেহবাদ পরগণার ফৌজদারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দু'নদীর তীরে সে সময় হতে মুসলিম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। দ্র: এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২য় সং, ১৯৮৬)., পৃ. ১০।

[১০৮]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯; মাথাভাঙ্গার'মূল শ্রোত দুর্বল হওয়াতে এবং কুমারের প্রতাপ খর্ব করার জন্য ১৮১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে কুমারের মুখে বাঁধ দিয়ে শ্রোতের গতি ফেরানোর সরকারি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুনরায় ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে কুমারের মুখ বাঁধার উদ্যোগ নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাও সফলতার মুখ দেখেনি। cf.: Addams William. ***op. cit.***, pp. 52-53; এই কুমার এবং গড়াই নদীর মাধ্যমে গঙ্গার পলি প্রবাহিত হত। বস্তুত কুমার মাথাভাঙ্গা হতে বের হয়ে বর্তমান গড়াই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে গড়াই, মধুমতি শিলাইদহ, বালেশ্বর নাম ধারণ করে হরিণঘাটার নিকট সমুদ্রে পতিত হয়েছে। দ্র: *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারের পর মাথাভাঙ্গা হতে আর একটি শাখা বের হয়; তার নাম নবগঙ্গা। কিন্তু চুয়াডাংগার পূর্বদিকে এক বিলের মধ্যে পড়ে মাথা ভাঙ্গার সাথে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। মাগুরা শহরের উত্তরে মুচিখালি নামক একটি খালের দ্বারা কুমারের সাথে পুনরায় নবগঙ্গার মিলন হয়। এ সংযোগের ফলে নবগঙ্গা পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। ফলে নবগঙ্গা কুমারের পানিতে সঞ্জীবিত হয়ে উভয়কূলে শস্য ফলানোর মাধ্যমে যশোর জেলার উত্তরাংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১১০] নবগঙ্গা যশোর ভূ-খন্ডে প্রবেশ করে ঝিনাইদহ, মাগুরা, নৌহাটা, নলদী এবং লক্ষ্মীপাশা হয়ে কালনার নিকট মধুমতিতে মিলিত হয়েছে।[১১১] এ্যাডাম উইলিয়ামসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, একবার নবগঙ্গায় প্রচন্ড বন্যার কারণে দক্ষিণ তীরে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল এবং ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে এ বাঁধ সংস্কার করা হয়।[১১২]

নবগঙ্গা যেখানে মাথাভাঙ্গা হতে জন্মলাভ করেছে ২/৩ মাইল অনতিদূরে জয়রামপুর রেলওয়ে স্টেশনের উত্তরে (বর্তমান দামুড়হুদা) যশোরের অপর পুরাতন নদী 'চিত্রার' উৎপত্তি হয়েছে।[১১৩] ১৮৪০ সালে একজন নীল কর্মকর্তা এ নদীর মুখে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন।[১১৪] নবগঙ্গার মত চিত্রাও মাথাভাঙ্গার পানি-শ্রোতে বঞ্চিত হয়ে একে-বেঁকে পূর্ব-দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়েছে। [১১৫] ঝিনাইদহের উত্তর-পশ্চিম কোণে মথুরাপুরের সন্নিকটে ব্যাঙ নামক একটি শাখা নদী নবগঙ্গা হতে বের হয়ে নলডাঙ্গার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফটকী [১১৬] বা যদুখালি নাম ধারণ পূর্বক চিত্রার সাথে মিলিত হয়েছে। গোয়ালখালির খাল নলদীর নিম্নে নবগঙ্গাকে নড়াইলের উত্তরে অবস্থিত চিত্রা ও ফটকী/খটকীর সম্মিলিত প্রবাহের সাথে সংযোগ

---

[১০৯]. J. Westland, *op. cit.*, p. 4.

[১১০]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।

[১১১]. J. Westland, *op. cit.*, p. 4.

[১১২]. উল্লেখ্য, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের উক্ত বন্যায় ভূমির উপর দিয়ে ৭ থেকে ৯ ফুট পানি প্রবাহিত হয়েছিল। cf.: Addams William, *op. cit.*, p. 55; ফলে ধারণা করা হয় যে, নবগঙ্গার মুখ তখনও খোলা ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং ৬ মাইল দূরে এ নদী ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে নৌ-চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

[১১৩]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

[১১৪]. Addams William, *op. cit.*, p. 55.

[১১৫]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০; W.W. Hunter এর বর্ণনা মতে চিত্রা নদী কালীগঞ্জ, খাজুরা, গোবরখালী নড়াইল এবং গোবরা হয়ে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। cf.: W.W. Hunter, *op. cit.*, p. 5; এছাড়া J. Westland তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, কালীগঞ্জ এবং গোবরখালীর মধ্যে এ নদী দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত শাখাকে চিত্রা এবং উত্তর দিকে প্রবাহিত শাখাকে খটকী বলা হয়। cf.: J. Westland, *op. cit.*, p. 5.

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করে দিয়েছে। বস্তুত চিত্রা নদী আফরা ও শেখহাটির সন্নিকটে ভৈরবের সাথে মিলিত হয়েছে। প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রে চিত্রা ও ভৈরব সংগম স্থানের প্রসিদ্ধি আছে।[১১৭]

যশোর জেলার সর্ব প্রধান এবং সুদীর্ঘ নদ হল ভৈরব।[১১৮] এটি একটি তীর্থনদ। উপদ্বীপে বড় বড় নদীগুলো দক্ষিণবাহী হলেও ভৈরব তা নয় বরং এটি প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত।[১১৯] ভৈরবের উৎপত্তি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের পদ্মা বা গংগা থেকে। কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের নিকট প্রথম বাংলাদেশে প্রবেশ করে ক্রমে দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছে। ঐ জেলার দামুড়হুদা থানার কাপাসডাঙ্গা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পদ্মার আরেক শাখা নদী মাথাভাঙ্গার সাথে মিলিত হয়ে কিছুদূর অতিক্রম করার পর আবার বিমুক্ত হয়ে যশোর ভূ-খন্ডে প্রবেশ করেছে।[১২০] ভৈরব নদ দু'টি সেকশন নিয়ে গঠিত। প্রথমটি নদীয়ার উচচ ভৈরব এবং দ্বিতীয়টি যশোরের নিম্ন ভৈরব। পদ্মার ২/৩ টি শাখার সাথে ভৈরবের সংযোগ ছিল বলে এতে যথেষ্ট পার্বত্য শ্রোত প্রবেশ করার সুবিধা ছিল।[১২১] তথাপি ভৈরবের সাথে এক সময় পদ্মার সংযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য ১৮৭৪ সনের বন্যায় তা আবার চালু হয়।[১২২] নিঃসন্দেহে ভৈরব যশোরের জন্য সভ্যতার দীপালোকের বাহক হিসেবে এককালে কাজ করেছে। সে সময়ে ভৈরব নদের তীরে যশোর, রাজারহাট, রূপদিয়া, বসুন্দিয়া, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, সেনহাটী, খুলনা, সেনের বাজার, আলীয়াপুর, ফকিরহাট প্রভৃতি

---

১১৬. ফটকীকে কেউ কেউ কটকী ও কেউ কেউ নটকী নামে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

১১৭. *প্রাগুক্ত*।

১১৮. এ নদীর ভয়ংকর তাণ্ডব এবং গর্জনের জন্যই নাম হয়েছিল ভৈরব।

১১৯. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।

১২০. *প্রাগুক্ত*, *খুলনা জেলা*, পৃ. ১৯; নদীটি যশোর জেলার কোটচাঁদপুরের পাশ দিয়ে চৌগাছার সন্নিকটে উপস্থিত হয়। এখানে এক শাখা সোজা দক্ষিণে অগ্রসর হয়। তবে মূল ভৈরব পূর্ব দিকে যশোরের সাতমাইল উত্তরে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের নিকটে যশোর ঝিনাইদহ মহসড়ক অতিক্রম করে। যশোর খুলনা মহাসড়কের অনেকটা সমান্তরাল ভৈরব পূর্ব-দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে যশোর-নওয়াপাড়া অতিক্রম করে ফুলতলা থানার উত্তর দিহীর সন্নিকটে খুলনা স্পর্শ করে। দ্রঃ *খুলনা জেলা*, পৃ. ২০।

১২১. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।

১২২. ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে যশোরের কালেক্টর উল্লেখ করেন যে, ভৈরবের মুখ চর পড়ে বন্ধ হয়ে যাচেছ এবং গরমের সময় শুষ্ক থাকে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে চরকাটা শুরু হয়। অনেক দিন পর কপোতাক্ষের পানি ভৈরব দিয়ে প্রবাহিত করার জন্য তাহিরপুরের নিকট বাঁধ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে বাঁধ ভেঙ্গে পুনরায় কপোতাক্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। cf.: W.W. Hunter, *op. cit.*, p. 73.

Dhaka University Institutional Repository

শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[১২৩] বিচিত্র গতির নদ ভৈরব কোথাও গতি হারিয়েছে, কোথাও প্রমত্তা হয়েছে, আবার কোথাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশ্য কপোতাক্ষের স্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভৈরবের প্রবাহ হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়া ইস্টার্ণ রেলওয়ে নির্মাণ একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এ উভয় কারণে ভৈরব নদে চর পড়ে এটি একটি গতিহীন নদে পরিণত হয়।

যশোরের বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেই কপোতাক্ষ নদ; এটি এ জেলার আরেকটি প্রধান নদ। যশোরের চৌগাছার নিকট তাহিরপুর নামক স্থানে ভৈরবের যে প্রবাহ ধারা সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছে তার নাম কপোতাক্ষ। এ নদ ক্ষুদ্রাকারে, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, চাকলা, ত্রিমোহিনী, সাগরদাড়ী, পাটকেলঘাটা, তালা প্রভৃতি স্থানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনের খোল পটুয়ার সাথে মিলিত হয়েছে।[১২৪] ভৈরবের যেমন উপরের অংশ মজে গেছে তেমনি কপোতাক্ষের অবস্থাও তাই বলা যায়। এ নদ পুর্বে বিশালাকৃতি থাকলেও বর্তমানে এটি কোথাও কোথাও বিলুপ্তির পথে। বিশেষ করে সাগরদাড়ী থেকে ত্রিমোহিনী হয়ে ঝিকরগাছা পর্যন্ত এখন পলি দ্বারা ভরাট হয়ে নদের নাব্যতা হারিয়েছে।

যশোরের পূর্ব সীমানার সবচেয়ে বৃহৎ নদীর নাম মধুমতি। এটি গংগার একটি প্রধান শাখা গড়াই যা কুষ্টিয়ার সন্নিকটে কুমারখালি থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মধুমতি নামে পরিচিতি লাভ করে।[১২৫] নবগঙ্গা, চিত্রা এবং ভৈরব নদীর শাখা এসে এ নদীতে মিলিত হয়েছে। নবগঙ্গার সংযোগ স্থলের নিম্নে এ নদীর নাম দেওয়া হয়েছে মধুমতি। এটি আরও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে খুলনার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এসে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করেছে। কচুয়া থানা এলাকায় এসে এটি নাম পরিবর্তন করে বালেশ্বর হয় এবং এই বালেশ্বর হরিণঘাটার বিখ্যাত মোহনায় বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।[১২৬]

কপোতাক্ষের দু'টি প্রধান শাখা হরিহর ও ভদ্রা নদ।[১২৭] ঝিকরগাছার নিকট কপোতাক্ষ হতে হরিহরের উৎপত্তি হয় এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দিকে লাওজানী, মনিরামপুর, কেশবপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান অতিক্রম করে ভদ্রা[১২৮] নদীর সাথে মিলিত হয়। প্রাচীন কালে এই ভদ্রাই যশোর রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল। ভদ্রার সাথে কপোতাক্ষের সংগমস্থলে ত্রিমোহিনী ও মীর্জানগরে মোঘল ফৌজদারের রাজধানী ছিল;

---

১২৩. J. Westland, *op. cit.*, p. 6.

১২৪. *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ১২।

১২৫. K.G.M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 5.

১২৬. ***Imperial Gazetteers of India***, Vol-11 (Oxford: Clarendor press, n.d), p. 232.

১২৭. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

১২৮. যশোরের (কেশবপুরের) ত্রিমোহিনীর নিকটে কপোতাক্ষ হতে ভদ্রার জন্ম হয়। দ্র: *খুলনা জেলা*, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সেখান থেকে ভদ্রা কেশবপুর হয়ে গৌরীঘোনা, ভরত ভায়না ঘুরে ডুমুরিয়ায় নাব্যতা হারায়। অবশ্য এ সকল অঞ্চলে বসতি স্থাপনে এ নদী বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।[১২৯] এ সকল নদী ছাড়াও যশোরের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও ছোট-বড় অনেক নদী রয়েছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নদী হলো রূপসা,[১৩০] সাহেবখালি, এলেংখালি ইত্যাদি।

যশোরের উল্লেখিত নদ-নদী সমূহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শুধু প্রবাহমান নদীগুলোই নয়, ক্ষীণ প্রভা নদীগুলোর বেশ কিছু অংশ উনিশ শতক পর্যন্ত নাব্য ছিল। এ সকল নদী সারা বছর নৌ চলাচলের উপযোগী ছিল। ফলে ইউরোপীয়রা এ জেলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং জেলার নদীগুলোর নাব্যতা ইউরোপীয়দের নীল চাষ প্রবর্তনে উৎসাহিত করে।[১৩১] যশোরের এ সকল নদীর তীরে বিভিন্ন জনবসতি, শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, উদাহরণ স্বরূপ যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কোটচাঁদপুর, ঝিকরগাছা, ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, নওয়াপাড়া, খুলনা, ডুমুরিয়া প্রভৃতি স্থানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। "যশোর অঞ্চলে কোন হ্রদ নেই তবে অনেক স্থানে বিল-ঝিল ও বাঁওড়গুলো হ্রদের মত বারো মাস পানিপূর্ণ থাকে।[১৩২]

যশোর জেলায় বিল-বাঁওড়ের অভাব নেই। যেখানেই নদী আছে তার পাশেই বিল বাঁওড়[১৩৩] রয়েছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর থেকে খুলনা যখন একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয় তারপরও যশোর জেলায় ১৫টি বিল ছিল। এ সকল বিলের মোট আয়তন ছিল ৯৮ বর্গমাইল। এ সকল বিলের অধিকাংশই খালের মাধ্যমে নদীর সাথে সংযুক্ত। জেলার উত্তর-পূর্ব দিকে নদীর সাথে সংযোগ খাল বিশিষ্ট বিলগুলো অবস্থিত। নদীর সাথে সংযোগ বিহীন কিছু বিল রয়েছে এগুলোতে শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি ও স্থানীয় পয়ঃনিষ্কাশন পানি সারা বছর জমে থাকে। এ ধরনের বিলগুলো জেলার পশ্চিম-দক্ষিণাংশে অবস্থিত।[১৩৪]

---

[১২৯]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

[১৩০]. রূপসার সৃষ্টি হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। মূলত এটি প্রাকৃতিক কোন নদী নয়। এটি ভৈরব থেকে উৎপত্তি হয়েছে। কথিত আছে রূপচাঁদ সাহা নামক এক লবন ব্যবসায়ী নড়াইলের উত্তরে খোন্দা নামক স্থানে বাস করতেন। তিনি কাচিপাতা মোহনা হতে সোজা পথে তার লবন ভৈরবের তীরে আনার জন্য একটি খাল খনন করেন। ভৈরবের প্লাবনে কালক্রমে এটি প্রকান্ড নদীতে পরিণত হয়। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

[১৩১]. মোঃ রেজাউল করিম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৭-২৯।

[১৩২]. *যশোহর খুলনায় ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১।

[১৩৩]. প্রবাহমান নদী অনেক সময় মরে গেলে বা স্থানান্তর হলে ঐ স্থান কিছুটা খাতযুক্ত বা নিচু হয়ে থাকে। সে নিচু খাতে পানি জমে এক সময় বড় জলাকারে রূপ নেয়। এ ধরনের পানিপূর্ণ বড় জলাকারকে বাঁওড় বলে। কোথাও একে বানর, গোগ বা ঝিল নামেও আখ্যায়িত করে। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

[১৩৪]. L.S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 15.

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বেও যশোর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। নৌ, সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে এই জেলার যোগাযোগ রক্ষা করা হত। পূর্বে নৌপথের উপর অধিকাংশ যোগাযোগ নির্ভরশীল থাকলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে খান জাহান আলী (রহ:) কর্তৃক ভৈরব তীরে রাস্তা নির্মাণের ফলে স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে।[১৩৫] পরবর্তীতে জেলার অধিকাংশ নদীর নাব্যতা হারাতে থাকলে স্থলপথই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Valintijin এর মানচিত্র অনুযায়ী যশোরের সড়ক ব্যবস্থার একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একটি রাস্তা বর্ধমান থেকে হুগলী এবং যশোর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।[১৩৬] ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের Messrs, Rennel, Martin এবং Rechards এর মানচিত্রে দেখা যায় তৎকালে নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মুহম্মদপুর, মাগুরা, মুড়ুলী, মীর্জানগর এবং মহেশপুরসহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ছিল।[১৩৭] 'জেমস ওয়েস্টল্যান্ড' তাঁর রিপোর্টে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে যশোরে একটি সরকারি রাস্তা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৮] অবশ্য W.W. Hunter এর বর্ণনা মতে ১৭৯৪/৯৫ খ্রিস্টাব্দে দু'টি রাস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়; একটি যশোর থেকে ঝিনাইদহ হয়ে কামারখালী পর্যন্ত অপরটি চৌগাছা থেকে খুলনা পর্যন্ত।[১৩৯]

---

১৩৫. Khan Bahadur M. A. Momen Recorded. "There still exist traces of broad roads here and there, the construction of which is attributed to Khan Jahan Ali, Who proceeded to the sundarbans through the district in the fifteenth century. cf.: M. A. Momen, Final Report on the survey and settlement operations in the District of Jessore (Calcutta: 1925), Quted by K.G.M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 123.

১৩৬. L.S.S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 106; K.G.M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 123.

১৩৭. L.S.S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 3; K.G.M. Latiful Bari আরো উল্লেখ করেন- From Naldaga emerged three roads-one towards Murali, another towards Kushtia and the third towards Mahespur, Jhenidah was on the road from Naldanga to Kushtia Rennels map showed that Jhenidah was also connected by roads with Kishnanagar and Muhammadpur. cf.: K.G.M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 123.

১৩৮. J. Westland, ***op. cit.,*** p. 136.

১৩৯. W.W. Hunter, ***op. cit.***, p. 279; K.G.M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 124.

Dhaka University Institutional Repository

১৮০২ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র যশোর জেলায় ২০ মাইল রাস্তা ছিল।[১৪০] ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে W.W. Hunter এর তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যশোরের প্রধান সড়কের দৈর্ঘ ছিল মোট ২৬৪ মাইল। আর মহকুমা শহর এবং মিউনিসিপ্যাল শহর ব্যতীত যশোরের রাস্তার সংখ্যা ছিল ২০টি।[১৪১] ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র যশোরে নির্মিত রাস্তার দৈর্ঘ ছিল ১০০০ মাইলের বেশি। এর ভিতর ১২৮ মাইল ছিল পাকা ও ৪৬১ মাইল ছিল কাঁচা। আর ৪৫১ মাইল রাস্তা ছিল মিউনিসিপ্যাল শহরের বাইরে গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা।[১৪২] ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মোট রাস্তার দৈর্ঘ ছিল ১৫৪৫ মাইল। এর মধ্যে ১৭২ মাইল ছিল পাকা ও বাকী কাঁচা রাস্তা পরিচালনা করত জেলা বোর্ড।[১৪৩] এ সকল রাস্তায় সাধারণ পরিবহণও চলাচল করত।

যশোর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার আরেকটি মাধ্যম রেলপথ। এটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এ জেলায় নির্মিত হয়।[১৪৪] পূর্ববাংলা রেল বিভাগ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পরে এ জেলায় আরো তিনটি রেলপথ নির্মাণ করেন। এগুলো খুলনা থেকে যশোর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত গেছে।[১৪৫] ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত একটি হালকা লাইন নির্মিত হয়। অবশ্য দেশ বিভাগের পর এ লাইনটির বিলুপ্তি ঘটে।[১৪৬]

আবহাওয়া ও জলবায়ু ঃ

যশোর জেলার জলবায়ু দেশের অন্যান্য এলাকার মত একই রূপ। তবে কিছুটা স্থানীয় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় এখানে ষড়ঋতুর পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। এপ্রিল-মে মাসে

---

১৪০. J. Westland, *op. cit.*, p. 137; W.W. Hunter, *op. cit.*, p. 279; L.S.S. O'Malley ferther recorded that in 1802, only 20 miles of road, properly so called existed in the district and none of the considerable rivers were bridged. cf.: K.G.M. Latiful Bari, *op. cit.*, p.-124.

১৪১. W.W. Hunter, *op. cit.*, pp. 278-79; K.G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, pp. 124-25

১৪২. L.S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 108; The main metalled road in this district was the Jessore-Calcutta road Maintained by the district Board. It was the principal high way used by the people travelling to Dhaka and Assam. cf.: *Ibid.*

১৪৩. M.A. Momen, *op. cit.*, pp. 4-6.

১৪৪. L.S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 108.

১৪৫. Ibid; It traversed about 58 miles and covered ten station within the district. This line was connected with the main line from sealdah to Goalanda by a branch line from Bangoan to Ranaghat and the distance of this branch line within the district was 10 miles. cf.: M.A. Momen. *op. cit.*, p. 10.

১৪৬. L.S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 108; A branch line from Kaliganj to Kotachandpur and covered a distance of 37 miles. cf.: M. A. Momen, *op. cit.*, p. 10.

Dhaka University Institutional Repository

আবহাওয়া বেশ গরম হয়, এ সময়টা গ্রীষ্মকাল।[১৪৭] এ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। ব্যতিক্রম ছাড়া তেমন বৃষ্টিপাত হয়না। মে মাসের শেষের দিকে অল্প বৃষ্টিপাত হয়। যশোরের ভাষায় একে ছোট বারসাৎ বলা হয়। এ সময় চাষীরা ফসল বোনার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। জুনের মাঝামাঝি সময়ে সাধারণত মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়না। জুলাই-আগষ্ট মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। খাল-বিল মাঠ-ঘাট সব পানিতে ভরে যায়। এ সময় আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।[১৪৮] সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় থেকে শীতের আগ পর্যন্ত আবহাওয়া সাধারণত গরম ও আদ্র থাকে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত মেঘ ও বৃষ্টিপাত প্রায় হয়না বললে চলে। অবশ্য জানুয়ারী মাসে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।[১৪৯] জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে শীত আসে অর্থাৎ এ দু'মাস শীতকাল। এ সময় উত্তরের বায়ু প্রবাহিত হয়, রাতে ব্যাপক হারে শিশির পড়ে। শীতের পর ফেব্রুয়ারীর শেষের দিক থেকে মার্চ মাসে বসন্তের আগমন হয়। বসন্তে সূর্য যখন দক্ষিণায়ন শেষ করে বিষুব রেখার নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছাতে থাকে তখন জেলার বায়ুর গতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। এ সময়ও ব্যাপক শিশির পড়ে। কখনো কখনো সকালে কুয়াশা দেখা দেয়; তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৫০] উত্তরের ঠান্ডা বাতাস ধীরে ধীরে অন্তর্নিহিত হয়ে দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করে।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা ঃ

আল্লাহ পাক সৃষ্টিতে বৈচিত্রময়। কোথাও অতিবৃষ্টি কোথাও অনাবৃষ্টি আবার কোথাও অতি-ইতির মাঝামাঝি আবহাওয়া বিরাজমান। আলোচ্য যশোর জেলার বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ জেলায় জুন-জুলাই মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু হয়। জুন মাসে জেলার গড় বৃষ্টিপাত ১২.১২", জুলাই এ ১২.৬২, আগষ্টে ৮.৯৫, সেপ্টেম্বরে ১০.০৩। অক্টোবর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তা হয়না বললেই চলে। এ সময়কালে প্রতিমাসে গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১.৯৩, ১.৯৩,

---

১৪৭. এখানে প্রচন্ড দাবদাহ নিয়ে গ্রীষ্মের আগমন ঘটে। এ সময়কাল বৈশাখী তান্ডব, শীলা বৃষ্টি, অকাল বর্ষা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

১৪৮. L.S.S. O'Malley, *op. cit.*, pp. 18-19.

১৪৯. K.G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 12.

১৫০. ফেব্রুয়ারী মাসে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এমনকি তাপমাত্রা ৭০° ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছায়। এ সময় দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করে। অবশ্য শীতকাল ছাড়া সারা বছরই দক্ষিণা বায়ু প্রবাহ অব্যাহত থাকে। cf.: L.S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 19.

Dhaka University Institutional Repository

১.৯৩, ১.০৩, এবং ০.৮২। ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বৃষ্টিপাত কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এ সময় মার্চ মাসে গড় বৃষ্টিপাত ৩.২৫, এপ্রিলে ২.৬৫ এবং মে মাসে ৩.২৪।[১৫১]

জেলার তাপমাত্রা মূলত সূর্যের আয়ন, বৃষ্টিপাত ও দূরবর্তী অঞ্চলে নিম্নচাপ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশি থাকে। এ সময় জেলার তাপমাত্রা যথাক্রমে (মার্চ-অক্টোবর) ৮০.২, ৮৪.৭, ৮৭.৬, ৮৪.৭, ৮৩.২, ৮২.৯ এবং ৭৯.৮ ফারেনহাইটে অবস্থান করে। অক্টোবর-নভেম্বর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে শুরু করে। নভেম্বর মাসে ৭২.৩ তে নেমে আসে। ডিসেম্বরে তাপমাত্রা আরো নেমে ৬৬.৬৩ তে দাঁড়ায়। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত এ সময় আবহাওয়া নম্র হয়ে শীতের সূত্রপাত ঘটায়; এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬৫.৯ ও ৬৯.৪ এ পৌছায়।[১৫২] মূলত যশোর অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, যা চরম ভাবাপন্ন নয়। এ অঞ্চলের লোকদের উপর যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গত কারনে এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে সরলতার ছাপ লক্ষ্যনীয়, যা ইসলামের অনুশীলনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

---

[১৫১]. M. A. Momen, ***op. cit.***, p. 18.

[১৫২]. ***Ibid.***

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

যশোর জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

- সামাজিক অবস্থা
- রাজনৈতিক অবস্থা
- অর্থনৈতিক অবস্থা
- ধর্মীয় অবস্থা
- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

যশোর জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

যে কোন দেশে নতুন ধর্ম অথবা নতুন কোন মতবাদ প্রচার-প্রসারের সুস্পষ্ট কারণ থাকে। আর এ ক্ষেত্রেই সেই অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আরব দেশে মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসারের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে এর যৌক্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী (সঃ) যখন বৈপ্লবিক ধর্ম ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন আরবের সামগ্রিক অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে, ঐ যুগকে ঐতিহাসিকগণ আইয়ামে জাহিলিয়া অন্ধকার যুগ আখ্যা দিয়েছিলেন। আমাদের এ উপমহাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মন্য ধর্মের অত্যাচার-নির্যাতনের ফলে জনজীবন এমন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, জনসাধারণ সাম্যের প্রতীক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বেশ আগ্রহী হয়। কাজেই "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার শীর্ষক সন্দর্ভ আলোচনার সুবিধার্থে এ জেলার প্রাক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। বঙ্গে মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত (১২০৪ খ্রিঃ) যশোর জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থার পৃথক কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়না। সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটই এটার বিচার্য বিষয়। বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পূর্বে (১২০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত) যে সামগ্রিক অবস্থা বিরাজমান ছিল সে প্রেক্ষাপটেই আমাদের আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

সামাজিক অবস্থা

বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পূর্বে যে সামাজিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তা এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা ও জনবসতির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে একটা শিথিল সামাজিক বন্ধনের আভাস পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল:

ব্রাহ্মণ্যবাদ ঃ

বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধরা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করত। নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের কোন গুরুত্বই ছিলনা। ব্রাহ্মণরা পূর্ব হতেই সমাজের উপর পূর্ণ প্রভূত্ব স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হচ্ছিল।[১] সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা শীর্ষ স্থান লাভ করেছিল, ভগবানের পরেই ছিল ব্রাহ্মণের স্থান। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, গো-দান, জল-দান ইত্যাদি অন্য বর্ণের লোকদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। ধর্মীয় কার্যাদি যেমন পুজানুষ্ঠান, ব্রতানুশীলন, যাগ-যজ্ঞের পৌণপুনিক আচরণাদি ইত্যাদি ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্পন্ন হত।[২] দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের এই ছিল যথার্থরূপ।

বর্ণভেদ/ প্রথা ঃ

বাংলাদেশে সেন বংশীয় (১০৯৭-১২০৪ খ্রিঃ) শাসন ছিল সর্বশেষ হিন্দু রাজবংশীয় শাসন। সেনদের রাজত্বকালে এদেশে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। বৌদ্ধদের তারা বিতাড়িত করেন।[৩] বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৬০-১১৭৮) বর্ণ প্রথা[৪] রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কুল প্রথা প্রচলনের ফলে বর্ণ প্রথা আরো প্রকট আকার ধারণ করে।[৫] অধিক সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণদেরকে আরো অত্যাচারী করে

---

১. রামাই পন্ডিত, *শূণ্য পুরাণ*, নগেন্দ্র বসু (সম্পাদিত) (কলকাতা: বংগীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বাং), পৃ. ১৪০।

২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২য় সং, ১৯৯৪ ইং), পৃ. ৫১-৫২।

৩. শ. ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯২ ইং), পৃ. ৩১; তাবাকাত-ই নাসিরীর বর্ণনায় আছে যে, ব্রাহ্মণরা রাজা লক্ষণ সেনের প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারণের বিষয়ে উপদেষ্টা নিযুক্ত ছিল। যেখানে বৌদ্ধ ও নিম্ন হিন্দুদের কোন গুরুত্বই ছিলনা। cf.: Nijam al- Din Ahmad Bakshi, ***Tabakat-i Akbari***, Vol-1, H. Beveridge (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1927), p. 5.

৪. হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪ প্রকারের বর্ণভেদ ছিল। এগুলো হল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বোত্তম। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে তাদের মর্যাদা সবার উপরে। এরপরে ক্ষত্রিয়: এদের পেশা হলো: শিক্ষা-দীক্ষা, অস্ত্র পরিচালনা, অস্ত্রবিদ্যা এবং রাজ্য শাসন সংক্রান্ত। বৈশ্যদের স্থান ক্ষত্রিয়দের পরে। এদের পেশা কৃষি ও ব্যবসা। সর্বশেষ বর্ণটি হলো শূদ্র। এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে নিম্নবর্ণের অধিকারী। এদের সামাজিক কোন মর্যাদা ছিলনা। দ্র: মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৩ ইং), পৃ. ৩৩; মোঃ আমিরুল ইসলাম, *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ: একটি সমীক্ষা, (১৭৮৬-১৯৪৭)* (কুষ্টিয়া: অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ইং), পৃ. ৩৪-৩৫।

৫. বাংলায় বর্ণ বিন্যস্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পরও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি শ্রেণীর বর্ণগতভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিলনা। সকলেই শূদ্রের পর্যায়ে গৃহীত হত। এ দু'টি বর্ণ ছাড়াও অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বলে শূদ্রের নীচে আরো একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব তখন ছিল, বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীটি হচেছ- কাপালিক, যোগী, চন্ডাল, ডোম্বী, কর্মকার, তাঁতি, ধুনুরী, শুড়ী, চর্মকার ইত্যাদি। দ্রঃ সত্যব্রত দে, *চর্যাগীতি পরিচয়*, পৃ. ১১১-১২; উদ্ধৃতঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

তোলে। নিম্ন বর্ণের হিন্দু অথবা শূদ্র কিংবা বৌদ্ধরা তাদের অত্যাচারের শিকার হয়।[৬] এছাড়া তারা দরিদ্রতার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে জীবন যাপন করত।[৭]

ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নির্যাতিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ ও কিছু কিছু উচচ বর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[৮] ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মীয় প্রভাবের বলয়ে পূর্বেকার সামাজিক রীতি-নীতিতে পরিবর্তন আসে। এমনকি হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজেও এ পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। পনেরশ শতকে শ্রী চৈতন্যদেব গ্রাম বাংলার অনড় বর্ণবাদী সমাজের মূলে আঘাত করে বর্ণহীন বাঙালি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত ইসলামী সাম্য চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সমাজের ভিত নাড়িয়েছিলেন। এর ফলে শহরে এবং গ্রামে উল্লেখযোগ্য সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন আসে। ইতোপূর্বে বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত কৌলিণ্য প্রথার ফলে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পরবর্তীতে অন্তজকৈবর্ত সমাজের বিদ্রোহের ফলে বৃত্তিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আর হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণের মধ্যে দুটি বর্ণ যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিদায় নেয়। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নিয়েই বাঙালি হিন্দু সমাজ গড়ে ওঠে।[৯]

---

৬. *শূণ্য পুরাণ*, পৃ. ১৪০।

৭. ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতি এমনভাবে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হত, যাতে তাদের ভোগের পেয়ালা উপচে পড়ত এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীতে চলত নিদারুণ অভাব, দারিদ্র, ক্ষুধা, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। চর্যাপদের কবি ঢেণ্ডণপাদ ৩৩ নং চর্যায় এ দারিদ্র ও ক্ষুধার সকরুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন-

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।

অর্থাৎ- টিলার উপর আমার ঘর; আমার কোন প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্যই (ক্ষুধার্ত) অতিথি এসে ভিড় করে। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৫২-৫৩।

৮. এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন- নিম্ন বর্ণের হিন্দু স্বধর্মী বা নিম্ন শ্রেণীর বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করত বলে নিশ্চয়ই উত্যক্ত ও বিব্রতবোধ করছিল।এমন সময় মুসলমান তুর্কীদের কাছ হতে ইসলামী মানবতাবোধের এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের স্পর্শ লাভ করে তারা যে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল; তাতে সন্দেহ নেই। ফলে তারা বঙ্গে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করে ও ব্রাহ্মণ্য শাসনের আশু নিপাতও কামনা করে। দ্রঃ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৭ ইং, পৃ. ২০; উদ্ধৃত: *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৩৬।

৯. শেখ মাসুম কামাল ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (সাতক্ষীরা: জেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরা, ১৯৯৬), পৃ. ৬১।

মুসলিম সামাজিক শ্রেণীঃ

নব গঠিত মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জোলা,[১০] চাকলাই, [১১] সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান ইত্যাদি শ্রেণী এদের মধ্যে অন্যতম। কারো কারো মতে হিন্দুদের কৌলিণ্য প্রথা কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজকেও কিছুটা প্রভাবিত করে।[১২] সেকারণে সমাজের পূর্ব প্রচলিত আতরাফ-আশরাফ এই ভেদনীতি একেবারে দূরীভূত হয়নি।[১৩] সৈয়দ, শেখ, মোঘল,

---

১০. The Jolahas are desirous of being known as Sheikh or Sheikh-Momins, Jolaha being colloquially used in an opprobrious sense denoting stupidity. cf.: K.G.M. Latiful Bari, ***Bangladesh District Gazetteers Jessore*** (Dacca: Bangladesh Government Press, 1979), p.60.

১১. There is a peculiar class of Muhammadan called chacklai Musalmans from the fact that they dwell in and around the village of chackla situated in thana Manirampur of the left bank of the kabadak. cf.: Ibid; L.S.S. O'Malley, ***Bengal District Gazetters*** (Caslcutta: Bengal Secretariat Depot, 1912), p. 48.

১২. এ সম্পর্কে ডঃ এ. আর মল্লিক তার (Dr. A.R. Mallick) গ্রন্থে মন্তব্য করেন- Thus Long years of association with a non-Muslim people who far outnumbered them, cut off from original home of islam, and living with half converts from Hinduism, The Muslim had greatly deviated from the original faith and had become indianised. This deviation from the faith apart, the Indian Muslims in adopting the caste system of the Hindus, had given a disastrous blow to the islamic conception of brotherhood and equality in which their strength had rested in the past and presented thus in the 19th century the picture of a disrupted society, degenerate and weakened by division and sub-division to a degree, it seemed, beyond the possibility of repair. No wonder, Sir Mohammad Iqbal said, surely we have out Hinduced the Hindu himself, we are suffering from, a double caste system religious caste system, sectarian and social caste system which we have either learned or inherited from the Hindus, This is one of the quiet ways in which the conquered nation revenged themselves on their conquerors, cf.: ***Brithish Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856*** (Dacca: Bangla Academy, 1977); উদ্ধৃত, আব্বাস আলী খান, ***বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*** (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ১৯৯৪), পৃ. ৫৭-৫৮।

১৩. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, ***উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ ইং), পৃ. ৬-৭; ইসলাম প্রচারকে 'সমাজ কালিমা' নামে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, "কালক্রমে মুসলমানদিগের মধ্যে জাতাভিমান এসে উপস্থিত হয়েছে। .... ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট হতে অনেক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকান্ড আয়ত্ব করে নিয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন কূলীন আছে, মুসলমানদের মধ্যেও তেমন শরীফ আছে। এছাড়া

পাঠান এই চার শ্রেণীর মানুষ নিজেদের উচচ বংশ বা আশরাফ বলে মনে করত। এর বাইরের ধর্মান্তরিত নিম্ন শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানদের আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করা হত।[১৪]

যদিও ইসলাম এ ধরনের ভেদনীতি মোটেই সমর্থন করেনা। [১৫] অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক, মুসলিম সমাজের এই ভেদনীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, প্রচলিত সামাজিক ব্যধি থেকে মুসলিম সমাজ সামান্য প্রভাবিত হলেও পরবর্তীতে ইসলামের সুমহান আদর্শে বলীয়ান হয়ে এ ভেদনীতি তাঁরা মুছে ফেলতে সক্ষম হয়।[১৬]

মীর মোশারফ হোসেন পিতামহের আমলে সমাজে প্রচলিত শ্রেণীভেদের উল্লেখ করে বলেছেন- 'সে সময়ে উঠা-বসা, খাদ্য খাওয়া সম্বন্ধে বড়ই বাদ বিচার ছিল। জাতীয় গৌরব, বংশ মর্যাদা, ঘরাণার গৌরব বড়ই কঠিনভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল। দ্রঃ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬-৭।

১৪. বাংলার মুলমানদের মধ্যে অনেক বা অনেকের পূর্ব পুরুষ বহিরাগত একথা সত্য, কিন্তু এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা মূলত এ দেশীয় অমুসলমানদের উত্তর পুরুষ। আমাদের দেশে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে সামাজিক বর্ণ বিন্যাস গড়ে উঠেছিল তার উপরের স্তরে থাকতেন বিদেশাগত মুসলমানেরা। এঁদরে মধ্যে আশরাফ-আতরাফ, শরীফযাদ-আযলাফযাদ হিসেবে বৈষম্য ছিল। এদেশের হিন্দু ধর্মত্যাগী মুসলমানেরা আবার তাদের পূর্বেকার বা পূর্ব পুরুষগণ বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী বিভক্ত থাকত। cf.: Khondkar Fajli Rabbee, ***The origin of the Musalmane of Bengal*** (Calcutta: 1895), ch. 1; Murry. T. Titees, ***Indian Islam*** (Oxford: 1930), p. 169.

১৫. ইসলাম পৃথিবীর সকল মানুষকে এক ও অখন্ড মানব জাতির অংশ বলে শুধু মনে করেনা, জগতের মানুষকে সেভাবে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। আল-কুর'আনে তাই ইরশাদ হয়েছে-

"وَاِنَّ هَذِه اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْن"

দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরাঃ আল-মু'মিনুন, আয়াত-৫২; অন্যত্র বলা হয়েছে-

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ"

দ্রঃ সূরা হুজুরাত, আঃ ১৩। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে একাধিক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- আল-কুর'আন, সূরা নিসা, আঃ ১; সূরা ইউনুছ, আঃ ১৯; সূরা হুদ, আঃ ১১৮; সূরা নহল, আঃ ৯৩; সূরা আম্বিয়া, আঃ ৯২-৯৩; সূরা যুমার, আঃ ৬; সূরাঃ শু'আরা, আঃ ৮; মহানবী (সঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন-

"اَلنَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمشطَ الاَفْضَلُ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِى اِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى"

দ্রঃ শামছুদ্দীন সরাখসী, *আল-মাবসূত,* ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ, ১৪১৪/১৯৯৩), পৃ. ২২-২৩।

১৬. মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণীভেদ বলতে গেলে নর ও নারী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর কল্পনাও করা উচিৎ নয়। জাতিভেদ সম্পূর্ণ হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রথা। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে জাতিভেদের কথা ঐতিহাসকিগণ বলেছেন- সে জাতিভেদ হিন্দুয়ানি জাতিভেদেরই নামান্তর। খুলনা-যশোরের মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের শরাফতীয় কথা অবশ্য শোনা যায় তবে এটা হিন্দু জাতিভেদেরই রূপান্তর মাত্র। অবশ্য মুসলিম সমাজ এই শ্রেণীভেদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। দ্রঃ মুহম্মদ আবূ তালিব, ***খুলনা জেলায় ইসলাম*** (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৮৮ ইং), পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঃ

বঙ্গে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতরে স্বার্থ ও ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হলেও তাদের সামাজিক ব্যবস্থায় তেমন পরিবর্তন আসেনি। হিন্দুদের অনেক রীতি-নীতিই মুসলমানদের ভিতর প্রচলিত ছিল।[১৭] যেমন হিন্দুদের পোষাক-পরিচেছদ, বিভিন্ন উৎসবাদি ও নাম রাখা ইত্যাদি এবং আরো অনেক আচরণের অধিকাংশই মুসলমানরা অনুসরণ করত। যশোর জেলার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিলনা।[১৮] বলা বাহুল্য, ইসলামী সমাজেও ভারতীয় যোগ সাধনা ও সূফীদের তস্বরফ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্মিলিত হয়েছিল।[১৯] মুসলিম নক্সবন্দীয় সম্প্রদায়ের ভিতরে বাংলা দেশী তত্ত্ব চিন্তা ও চর্চার সাথে ইসলামের বহিরাবয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টায় তা পরিণতি লাভ করে। এভাবে বাংলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম মিলনের

---

১৭. W. W. Hunter যশোরের সম্পর্কে লিখেছেন- The Muhammadans do not appear to be a different race from the Hindus of the same social standing, They are believed to have been converts from low Hindu classes, but not even a traditioal date is assigned by the people in the District for their converson. In the south eastern part of the District, as in Bagerhat, numbers of the Muhammadans belong to the Faraizi seet; The collector report that they are a vrey litigious peoples. cf.: W. W. Hunter, ***A statistical Account of Bengal***, Vol-11; Districts of Nadia and Jessore (London: 1875), p. 194; K. G. M. Latiful Bari, op. cit., p. 60.

১৮. মুসলমান ও হিন্দু সমাজের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়, একান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত অনেক বিষয়েই এদের মিল দেখা যায়। মুসলমানরা ধুতি-লুঙ্গি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পাজামা আচকান টুপি ব্যবহার করত। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীন অষ্ট্রিয় আচার যেমন দূর্বা দিয়ে নবীনকে বরণ করে নেওয়ার প্রথা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বে বহুল প্রচলন ছিল। এছাড়াও আরও কতিপয় অভিন্ন সামাজিক বা অর্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান এ জেলার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা হল আশ্বিন মাসের শেষ দিন ভোরে 'গার্শি' অনুষ্ঠান, পৌষ পার্বন, গো-ফাগুনে ইত্যাদি। দ্রঃ শরীফ আব্দুল হাকিম, ***নড়াইল জেলার ইতিহাস*** (নড়াইল: বর্ণছাপ প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ১৯-২০।

১৯. ***ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,*** পৃ. ৬১; জনৈক ইউরোপীয় গবেষক ভারতে ইসলামের উপর হিন্দু প্রভাবের কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো- মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ। cf.: Titees. *op. cit.*, p. 56; হিন্দুদের অনেক আচরণ মুসলমান সমাজে এবং মুসলমানদের অনেক আচরণ হিন্দু সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল তার নানাবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মূর্তিপুজা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ হলেও অনেকে আবেগের বশবর্তী হয়ে পীর বা মুর্শিদের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে কবরে বা মাজারে ফুল প্রদান করত। অনেক ক্ষেত্রে এটা কবর পুজার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। অন্যদিকে স্থানীয় উচচ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীর-ফকির, মৌলভী-মাওলানাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ, পীরের দরগায় মানত ও পানি পড়ার প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। দ্রঃ ***ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,*** পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

মত ইসলাম ও হিন্দু-ব্রাহ্মণ ধর্মের তাত্ত্বিক মিলনের ফলে সামাজিক পরিবর্তনও দেখা দেয়। পরবর্তীতে পর্তুগীজদের আগমনের সাথে সাথে ইউরোপের নতুন ভাব ও চিন্তা এই সমাজে প্রবেশ করে। আরো পরে ব্রিটিশ যুগের সূচনায় পোষাক, খাদ্য, স্থাপত্য কলায় নতুনের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশদের মাধ্যমে পশ্চিমা আধুনিকতা এ দেশে আগমনের ফলে ব্রাহ্মণ এবং ইসলাম ধর্মে মিলিত সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন আসতে শুরু করে।[২০] ইসলামী সমাজে যদিও কিছু দিন পর থেকে ব্রিটিশ বিরোধিতা শুরু হয় এবং পূর্বেকার সামাজিক রীতি-নীতিকেই আকড়ে রাখতে চেষ্টা করা হয় কিন্তু এক শতাব্দী পরে তা ভেঙ্গে পড়ে।

পারিবারিক জীবন ঃ

তৎকালীন সময়ে যশোরে হিন্দুদের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা উল্লেখযোগ্য ছিল যা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছিল। পুরাণ পল্লী সমাজে এই প্রথা ব্যাপক ছিল তবে উচচ বর্ণের তুলনায় কৃষি নির্ভর নিম্ন বর্ণের হিন্দু পরিবারে এই প্রথা বেশি পাকাপোক্ত ছিল।[২১] ইসলামী সমাজেও যৌথ পরিবার প্রথা চালু ছিল।[২২]

বৈবাহিক ব্যবস্থাপনা ঃ

মুসলিম সমাজে বিবাহ প্রথা একটি ধর্মীয় বন্ধন।[২৩] আর হিন্দু সমাজে বিবাহ সর্বাংশেই ধর্মীয় এবং চিরকালীন বন্ধন। যশোরের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় এ দু'সম্প্রদায়ই নিজস্ব ধর্মীয় আঙ্গিকে বিবাহ কার্য

---

২০. আঠার শতকের ব্রাহ্মণ আন্দোলন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কার ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে মুসলিম শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলের কূপমন্ডুক সমাজে গতিশীলতা আনে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সমাজে ধর্মের একচেটিয়া প্রভাব কমতে থাকে। তাই শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জীবন জগৎ সম্পর্কিত বিভিন্ন দার্শনিক মতের প্রভাবে এক নতুন সমাজকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। হিন্দু বর্ণ প্রথার ক্রমাবলুপ্তি এবং মুসলমানদের মধ্যে ভাষা ভিত্তিক জাতীয় চেতনার প্রতিফলন সে জন্যই সম্ভব হয়েছে। দ্র: *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬১-৬২।

21. K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 65.

২২. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬২।

২৩. বৈবাহিক ব্যবস্থা ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। এর অভাবে জগতের মানুষ উশৃংখল, স্বেচ্ছাচারী, অসংযমী ও চরিত্রহীন হয়ে পশু জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এমনকি পশুর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। তাই ইসলামী সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কুর'আনে ইরশাদ করেন-

"وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ– اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه"

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদন করত।[২৪] সাধারণত দুই বিবাহ প্রথাকেই অভিভাবকগণ আলোচনার মাধ্যমে সামাজিকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করত।[২৫] পাত্র-পাত্রী বিবাহের সময়ই পরস্পরকে প্রথম দেখার সুযোগ পেত। অবশ্য পরবর্তীতে শহরাঞ্চলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের নিজেদের পছন্দে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[২৬]

পূর্বে যশোর অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের সব শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল।[২৭] শিক্ষা, অর্থনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ার ফলে বাল্য বিবাহ রীতি কিছুটা কমে আসে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ও বিলম্ব বিবাহ (পুরুষ ২১ বছর, মহিলা ১৮ বছর) আইন চালু হওয়ায়ও বাল্য বিবাহ কমে আসে। তবে গ্রামাঞ্চলে এ প্রথার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি।[২৮]

বৈবাহিক ব্যবস্থাপনায় এ অঞ্চলের মুসলিম সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। যা ধর্মীয়ভাবেই চালু ছিল।[২৯] সাধারণত অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ধনী পুরুষদেরকে মাঝে মধ্যে বহু বিবাহে আগ্রহী হতে দেখা

অর্থাৎ- তোমরা তোমাদের নারীগণকে (কুমার হোক কিংবা বিধবা) বিবাহ দিয়ে দাও এবং তোমাদের সৎ ও চরিত্রবান গোলাম-বাদীগণকেও বিবাহ দাও। যদি তারা দরিদ্র হয়। মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দিবেন। দ্র: আল-কুরআন, সূরাঃ আন-নূর, আ: ৩২।

২৪. বিবাহ প্রথায় প্রাচীন বাঙালি কওমের রীতি রেওয়াজ হলুদ মাখা, আল্পনা আঁকা, ডালা দিয়ে বরণ করার প্রথা যশোর অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। দ্র: *ব্যঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬৯।

২৫. Elderly people such as parints, guardians and relations generally arrange marrige. cf.: K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 65.

২৬. *ব্যঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬২।

২৭. বাল্য বিবাহের কুফল ছিল অধিক। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে এ রীতির প্রচলন ছিল। দ্র: *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, পৃ ১৫।

২৮. আইনটি ১৯৩০ সালে চালু করা হয়। cf.: K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, pp. 65-66.

২৯. ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে বহু বিবাহের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। একই সময়ে সর্বোচ্চ ৪জন মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

"وَ إِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ"

অর্থাৎ- আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবেনা; তবে সে সব মেয়েদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। দ্র: আল-কুর'আন, সূরাঃ আন-নিসা, আঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

যায়। তবে সামাজিক রুচি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায় শহরাঞ্চলে এ পরিস্থিতি ছিল অনেকটা কম। আর পরবর্তীতে গ্রামাঞ্চলেও এ সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কমে আসে।[৩০]

তৎকালীন সমাজের একটি কালো দিক ছিল বিধবা বিবাহ প্রথা। যশোর এ কালিমা থেকে মুক্ত ছিলনা। হিন্দু সম্প্রদায় ছিল বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী।[৩১] তাদের ধর্মে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। স্বামীর চিতায় স্ত্রীকেও প্রাণ বিসর্জন দিতে হত। ইসলাম ধর্মে বিধবা বিবাহ বৈধ[৩২] হলেও হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম সমাজের কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন ছিলনা।[৩৩] অবশ্য পরবর্তীতে আইনের মাধ্যমে এ প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।[৩৪]

---

৩০. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬২।

৩১. K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 65.

৩২. বিধবা বিবাহ ইসলামে সিদ্ধ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে-

"وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْرًا- فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ- وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ"

অর্থাৎ- আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হল নিজেকে চার মাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ অবগত। দ্র: আল-কুর'আন, সূরাঃ বাকারা, আ: ৩৪; উল্লেখিত আয়াতে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা বলতে ঐ স্ত্রীর/ মহিলার অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-

"وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ .... وَلاَ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ...الخ"

অর্থাৎ- আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই .... কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখোনা। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচছা করোনা। দ্র: আল-কুর'আন, সূরাঃ বাকারা, আ: ২৩৫; পূর্বোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় ইসলামে বিধবা বিবাহ জায়েয এবং এতে কোন পাপ নেই।

৩৩. ইসলাম ধর্মে বিধবা বিবাহ জায়েয হলেও হিন্দু প্রভাবিত মুসলিম সমাজের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত ছিলনা। কলকাতার পশ্চিম প্রান্ত প্রবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিমতট হতে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত বিশাল ভূ-খন্ডের অনেক স্থানেই মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিলনা। এই হিন্দু প্রথাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের মধ্যে এমন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, অনেকে বিধবা বিবাহ দেওয়া বা বিধবাকে বিবাহ করা নিতান্ত অবজ্ঞাজনক কাজ মনে করত। *দ্র: উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, পৃ. ১৩।

৩৪. ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা সাগরের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই (Act xv of 1856)) বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এতে করে বিধবা বিবাহের পক্ষে বিপক্ষে সারা ভারতে ঝড় বইতে শুরু করে। এ আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক প্রথা ঃ

দীর্ঘ দিন ধরে পাত্র-পাত্রীকে বিবাহের সময় যৌতুক[৩৫] দেয়া-নেয়ার প্রথা এ অঞ্চলের সামাজিক রীতি-নীতিতে রয়েছে। গ্রামে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী গরীব সমাজে পাত্র পক্ষকে অলংকার, পোষাক এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে বিবাহ রীতির প্রচলন দেখা যায়। আবার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে এর ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে থাকে। শিক্ষা-সামাজিক মর্যাদা, চাকুরী তথা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম পাত্রই সাধারণত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে সু-পাত্র বলে বিবেচিত হত। পাত্রীর পিতাকেও সুপাত্রের জন্য প্রচুর টাকার যৌতুক দিতে হত। সরকার কর্তৃক বিরোধী আইন পাশ হওয়ায় যৌতুক প্রদানের রীতি কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মূল ব্যাধিটি ভিন্ন রীতিতে ব্যবহৃত হতেই থাকে। হিন্দু সমাজে যৌতুক সর্ব শ্রেণীর জন্য সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রচুর অর্থ, অলংকার ও আনুষ্ঠানিক জাঁক জমকের জন্য হিন্দু পিতাকে অকাতরে ব্যয় করতে হয়। পাত্রের যোগ্যতা, শিক্ষা ও সামর্থের উপর ব্যয়ের মাত্রা নির্ধারিত হয়।[৩৬] কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজেও এ প্রথার প্রচলন দেখা যায়; যদিও এটি ইসলাম সমর্থিত নয়।[৩৭] সে সময় মেয়ের অভিভাবকরা যেমন ছেলের নিকট হতে পণ গ্রহণ করতো, তদ্রূপ ছেলে ও

যশোরকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। বিধবা বিবাহে যশোর সমগ্র বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশকে আন্দোলিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্রঃ নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার* (ঢাকা: সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৩২-৩৩।

৩৫. 'যৌতুক' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ জিহাজ (جهاز)। এর শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে বাংলা একাডেমী অভিধানে দুটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে- ১. বিবাহে বর-কনেকে যে সব মূল্যবান দ্রব্য দেয়া হয় ২. মুখে ভাত বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উপহার। দ্রঃ সম্পাদনা পরিষদ, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় মুদ্রণ, ২০০২), পৃ. ১০১৫; তবে প্রচলিত অর্থে বরের পক্ষ কনের পক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা কিছু আদায় করে থাকেন তারই নাম যৌতুক। দ্রঃ অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, *কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন*, ৩য় খণ্ড (ঢাকাঃ ভূঁইয়া প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৭২।

৩৬. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ, সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৬২-৬৩; এ সম্পর্কে K. G. M. Latiful Bari বলেন- Amongst the Hindus, the dowry system has been long prevalent and it is very rare when a Hindu girl can be given in marriage without cash and jewellery which are proportionate to the social position and income of the bridegroom. It is howover, still a big headache for Hindu parents to marry their daughters when they attin a proper age. cf.: K. G. M. Latiful Bari., *op. cit.*, p. 65.

৩৭. ছেলে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে মেয়ের পিতার পক্ষ থেকে দান- জিহাজ (جهاز) ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। বরং বিবাহের সময় স্বেচছায় মেয়েকে কিছু উপঢৌকণ দেয়াকে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায়- মহানবী (সঃ) তাঁর প্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ের অভিভাবকের নিকট থেকে যৌতুক দাবি করত। ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের গরীব অভিভাবকেরা কন্যা দায়গ্রস্ত হয়ে পড়ত এবং অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের ভয়ে সদা-সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। মুসলিম সমাজের এহেন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন- "এমন অবস্থায় বাড়ীতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত, 'পোড়ার মুখী বিদায় হলেই বাচি" ।[৩৮]

কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কে বিবাহের সময় বেশ কিছু জিনিস যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

جَهَّزَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَ قِرْبَةٍ و وِسادةٍ ادمٍ حَشْوُهَالِيْفُ الاَذْخِرِ (مسند أحمد)

"রাসূল (সঃ) ফাতিমাকে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন একটি পাড়ওয়ালা কাপড়, একটি পানির পাত্র, আর একটি চামড়ার তৈরি বালিশ, যার মধ্যে তীব্র সুগন্ধিযুক্ত ইযখির খড় ভর্তি ছিল।" তবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথা যা পরবর্তীতে মুসলিম সমাজেও অনুপ্রবেশ করেছে, এই প্রচলিত যৌতুক ইসলাম সমর্থন করেনা। কেননা এই প্রথায় কন্যার পিতার উপর বাড়াবাড়ি শর্তারোপ করা হয়, যার ফলে অনেক বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এছাড়া যৌতুকের অভাবে অনেক মেয়ে তালাক প্রাপ্তা হতে বাধ্য হয়। ক্ষেত্র বিশেষ অনেক মেয়ে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। দ্রঃ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ইং), পৃ. ১৬১। তাইতো ইসলাম এহেন অমানবিক প্রথাকে বর্জন করার পাশাপাশি স্বামীকে স্ত্রীদের সাথে সৎভাব বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আর স্ত্রীর নির্ধারিত মোহর আদায় করাকে ফরয করে দিয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন- "وَعَاشِرُوْا هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ" অর্থাৎ- তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎ ভাবে জীবন যাপন কর। দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরা নিসা, আ: ১১; মোহরানা আদায় সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- "وَ اٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً" অর্থাৎ- আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দাও। দ্রঃ আল কুর'আন, সূরা নিসা, আ: ৪।

[৩৮]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*, অখন্ড (ঢাকা: এস. আর. প্রিন্টার্স, ৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন ১৯৯৫), পৃ. ৫৫২।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অবস্থা

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই যশোরের রাজনৈতিক ইতিহাস দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন গুরুত্বের দাবিদার। কেননা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা 'Pereplus to the Erythrean sea' নামক গ্রীক ইতিহাসের বর্ণনানুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দ পর্যন্ত বাংলায় যে গঙ্গারিডি জাতির বাস ছিল, সম্ভবত যশোরের বারবাজারই ছিল তাদের রাজধানী।[৩৯]

খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যশোরসহ সমগ্র বঙ্গ (গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ) স্বাধীন এবং শক্তিশালী রাজ্য ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর টলেমীর মানচিত্রে তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০] পরবর্তীকালে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত যশোর বঙ্গের অধীনে ছিল বলে অনুমান করা হয়।[৪১]

গুপ্ত বংশ ক্ষমতারোহণের পূর্বে বঙ্গ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। এগুলো হচেছ গৌড়, বঙ্গ, সমতট, রাঢ, পুন্ড্র, বরেন্দ্র প্রভৃতি। যশোর ছিল সমতটের অন্তর্গত। সমুদ্র গুপ্ত (৩৩৫-৮০ খ্রিঃ) এর রাজত্বকালে সমতট অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বঙ্গ তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সমতট ছিল করদ রাজ্য। গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে নিলেও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে এটা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো।[৪২] এলাহাবাদ স্তম্ভে খোদিত তথ্যানুযায়ী যশোরসহ সমগ্র বঙ্গ সমুদ্র গুপ্ত এর শাসনামলে (৩৪০-৮০ খ্রিঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গুপ্ত বংশ কর্তৃক শাসিত হয়।[৪৩] সপ্তম শতাব্দীতে

---

৩৯. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ১ম খণ্ড (কলিকাতাঃ শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় সং, ১৯৬৩), পৃ. ৩২১; এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস* (খুলনা: প্রকাশক, মেহেদী বিল্লাহ, আহসান আহম্মদ রোড, ১ম সং, ১৯৬৭), পৃ. ২২৭।

৪০. K. G. M. Latiful Bari, ***Bangladehs District Gazetteers Jessore*** (Dacca: Bangladesh Government press, 1979), p. 27.

৪১. আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত, ***যশোর পরিচিতি,*** ৩য় সংখ্যা; নাসির হেলাল, ***যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,*** পৃ. ১২।

৪২. R. C. Majumdar (ed.) ***The History of Bengal***, Vol-1, Hindu period (Dhaka: University of Dhaka, 1963), p. 47.

৪৩. The Allahabad pillar inscription indicates that sumudra Gupta (c-340-380 AD.) in corporated the western and northern part of Bengal in the Gupta empire. Even the ruler of samatata (estern Bengal) acknowledged the suzerainity of the Gupta Emperor. Thus the district came under the authority of the Gupta rulers and was ruled by them most probably up to the middle of the 6th century A.D. cf.: K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 27.

গৌড়ের সম্রাট শশাংক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ) বঙ্গ জয় করলে যশোর তার শাসনাধীন চলে যায়। যশোর যে গুপ্ত বংশ ও শশাংক কর্তৃক শাসিত হয়েছিল কিছু প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্তির মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৪]

রাজা শশাংকের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রিঃ) যশোর সম্ভবত (৬০৬-৬৪৭ খ্রিঃ) সম্রাট হর্ষবর্ধনের অধীনে আসে।[৪৫] বলা বাহুল্য, শশাংকের মৃত্যুর পর থেকে পাল বংশের উত্থান (৬৫০-৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ যুগ বললে অত্যুক্তি হবেনা। বাংলার এই ভাঙ্গা মন্ডলচন্ডীর যুগে "মাৎস্যন্যায়"[৪৬] দেখা দেয়। ফলে তথ্যের অভাবে এ সময়ের যশোর তথা বাংলার ইতিহাস প্রায় তমসাচ্ছন্ন। এ অরাজকতার যুগে বৃহত্তর যশোরে কয়েকজন ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাবের উল্লেখ রয়েছে। কেবর্ত্ত, তিয়র ও ভরত রাজা তাদের মধ্যে অন্যতম।[৪৭]

এরপর আসে পাল রাজত্ব। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১০৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাল রাজবংশ রাজত্ব করেন। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপালের রাজত্বের সময় (৭৮১-৮২১ খ্রিঃ) যশোর তার শাসনাধীন আসে। পালদের পরে আসেন বর্মণ রাজাগণ। তাঁরা (১০৮০-১১৫০ খ্রিঃ) পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্বের সঙ্গে যশোরের কোন প্রকার সম্পৃক্ততা ছিল কিনা ইতিহাস সে ব্যাপারে নিরব।[৪৮] এরপর

---

৪৪. ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার উত্তরাংশে এলেংখালি, মধুমতি নদীর সন্নিকটে একটি কূপ খননকালে মৃৎপাত্রে কিছু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর তিনটি মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। cf.: Raja Rajendra lal Mitra- "Notes on three ancient coins found at Muhammadpur in the Jessore District", cf.: ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, Vol- xxi, 1852, p. 401 ; এ তিনটি মুদ্রায় একটি রাজা শশাংকের, দ্বিতীয়টি পরবর্তী কোন গুপ্ত নৃপতির এবং তৃতীয়টি সম্বন্ধে এখনও কোন স্থায়ী মত ধার্য হয়নি; cf.: ***Indian Muslim catalogue of coins***, Vol-1, p. 122, PL xvi শিমি।

৪৫. K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, pp. 28-29.

৪৬. 'মাৎস্যন্যায়' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, দক্ষ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অভাবে সামন্ত শাসকরা নিজেরাই কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে মাৎস্যন্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দন্ড ধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মত যেখানে ছোট মাছকে বড় মাছ গ্রাস করে।" লামা তারানাথ মাৎস্যন্যায়ের ইতিহাস তুলে ধরেছেন এভাবে, "সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিলনা, প্রত্যেক ক্ষত্রীয় সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। ফলে দুঃখ-দুর্দশার আর সীমা ছিলনা।" দ্রঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, ১ম খণ্ডের প্রাচীন বাংলাদেশ প্রবন্ধ, পৃ. ৪৯।

৪৭. ডুমুরিয়ার কাছে (বর্তমান কেশবপুর থানায়) ভরত ভায়না নামক স্থানে এক ভরত রাজা বাস করতেন। দ্রঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা ১৯৬৩), পৃ. ২০৫।

৪৮. বাংলায় সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বিজয় সেনের রাজত্বকালে ভাগীরথীর পূর্বভাগে বরেন্দ্রের দক্ষিণে মেঘনা নদী, পশ্চিমে এবং লবণ সমুদ্রের উত্তরভাগে বর্মরাজ শ্যামল বর্মা সেন রাজাগণের আশ্রয়ে এক করদরাজ্য লাভ করে স্বধর্ম নিরত হয়ে রাজত্ব করছিলেন। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ, ১৯৬৩), পৃ. ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাব ঘটে সেন রাজত্বের। এই বংশের তৃতীয় নৃপতি বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০ খ্রিঃ) এর রাজত্বকালে যশোর জেলা তাঁর রাজ্যভূক্ত হয়। এ বংশে দু'জন নৃপতি বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রিঃ) এবং লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৬ খ্রিঃ) যশোরসহ প্রায় সমগ্র বাংলা শাসন করেন। উল্লেখ্য ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে[৪৯] মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী রাজা লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়া অধিকার করেন।[৫০] পরবর্তীতে বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০ খ্রিঃ) এবং কেশব সেন (১২২০-১২২৩ খ্রিঃ) পূর্ববঙ্গ এবং সম্ভবত যশোরও তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে রাখেন।[৫১]

---

৪৯. বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের তারিখ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। তাবাকাত-ই নাসিরী অনুবাদক মেজর র‍্যাভারটির (H. G. Raverty) মতানুসারে ৫৯০ হিজরী ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ এবং হেনরী ব্লখম্যানের মতে ১১৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট এবং এডওয়ার্ড টমাস নদীয়া আক্রমণের তারিখ ১২০৩-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। এ সকল ভিন্ন মতের মধ্যে র‍্যাভারটির মতগ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। ৫৮৮ হিজরী (১১৯২ খ্রিঃ) তিরৌরী বা তরাইনের যুদ্ধে চাহমান রাজ দ্বিতীয় পৃথ্বিরাজ নিহত হয়েছিলেন। ৫৯০ হিজরী (১১৯৩ খ্রিঃ) গাহডালরাজ জয় চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। জয়চন্দ্র জীবিত থাকতে কোন মুসলমান গাহডাল রাজ্যের কোন অংশে অধিকার প্রাপ্ত হয়নি সুতরাং ৫৯০ হিজরীতে বখতিয়ার ভগবৎ ও ভৌহলি পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হননি। এতএব, ঐ বছরই তাঁর পক্ষে বিহার ও লক্ষণাবতী অধিকার অসম্ভব। দ্রঃ শ্রী রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (কলিকাতা: ১৩২৪ বাং) পৃ. ১৫। তবে এই তারিখ ১২০০-১২০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। কুতুবুদ্দীন আইবেকের সভাসদ হাসান নিজামীর 'তাজুল মাসীর' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কুতুবুদ্দীন কালিঞ্জর দূর্গ জয় করে সেখান থেকে সরাসরি বাদায়ুনে চলে আসেন। তাঁর চলে আসার পরপরই বখতিয়ার খলজী ওদন্তপুরী বিহার থেকে তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কুড়িটি হাতি, বিবিধ রত্ন ও বহু অর্থ উপঢৌকণ স্বরূপ দেন। মিনহাজুস সির'জের তবাকাতে নাসিরী থেকে জানা যায় যে, বিহার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কুতুবুদ্দীন আইবেক তাঁকে খিলাত দান করেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজী নদীয়া অভিযান করেন বলে মনে করাই সঙ্গত হবে। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৫৮।

৫০. Abdul Karim, Date of Bakhtiyar Khaljis conquest of Nadia, "Journal of the Asiatic Society of Bangal, Vol-xxiv-vi (1979-81), pp. 1-10; L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazeteers Jessore (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1912), p. 22; লক্ষণ সেনের পরাজয় এবং পলায়নের কথা বলে মিনহাজ বলেন- "রায় লাখমনিয়া সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌছে গেলেন.... তার বংশধরগণ এ সময় পর্যন্ত বঙ্গ রাজ্য রাজত্ব করেছেন। cf.: Minhajuddin Siraj, ***Tabakat-i-Nasiri***, Vol-I, Trans by H. G. Raverty (Reprint New Delhi: Oriental Books corporation, 1970), p. 548.

৫১. যশোর অঞ্চল বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন কর্তৃক শাসিত হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কেননা লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষদিকে উপকূলবর্তী সুন্দরবন এলাকায় ডুম্মন পাল নামক একজন বৌদ্ধ নরপতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খাড়ি অঞ্চলে মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়ে তাম্র শাসন জারি করেন। cf.: A. M. Chwdhury, ***Dynastic History of Bengal*** (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1967, p. 247; মিনহাজ, ডুম্মন পালের এই রাজ্য চব্বিশ পরগণা, খুলনা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল বলে মনে

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান মুগিস উদ্দীন তুঘলকের শাসনামলে যশোর মুসলিম রাজ্যভুক্ত হয়।[৫২] মুগিস উদ্দীনের মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের পুত্র নাসির উদ্দীন মোহাম্মদ বোখরা খান এর রাজত্বকালে (১৩২৪ খ্রিঃ) যশোর সরাসরি দিল্লীর শাসনাধীন হয়। পরবর্তীতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিঃ) লক্ষণাবতীর শাসনভার গ্রহণ করেন।[৫৩] আর ১৪১৪ পর্যন্ত যশোর তাঁর শাসনাধীনে থাকে।

সুলতান নাসির উদ-দীন মাহমুদ শাহ এর রাজত্বকালে (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রিঃ) যশোর অঞ্চল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হযরত উলুখ খাজা খান জাহান আলী (র:) কর্তৃক শাসিত হয়।[৫৪] তাঁর শাসনাধীন এ রাজ্যের নামকরণ করেন খলীফাতাবাদ।[৫৫] ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে খান জাহান আলী (রহ:)-এর মৃত্যুর পর যশোর দিল্লীর সম্রাটগণের প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হয়। এ সময় গৌড়ের ইলিয়াস শাহী বংশ কর্তৃক যশোর শাসিত হয়।[৫৬] এরপর ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হলে ক্ষমতায় আসে দাস বংশ (১৪৬৯-৯৩ খ্রিঃ)। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে দাস বংশের পতনের ফলে ক্ষমতার মসনদে আসেন

করেন। দ্রঃ মিনহাজ-ই-সিরাজ; *তবকাত-ই নাসিরী*, আ.কা.ম. যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২৮; সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খলজীর (১২১২-১২১৭ খ্রিঃ) রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে মিনহাজ বলেন- "লাখনৌতি রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সমুদয় অঞ্চল যথা জাজনগর, রঙ্গরাজ্য, কামরূদ ও তিরহুত রাজ্য সমূহ তাকে কর প্রেরণ করত। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬১।

[৫২]. The power of the senas was on the verge of extinction in the second half of the therteenth century on account of Muslim attacks from the west..... the Muslim possession in Bengal included atleast some portions of east Bengal. cf.: Sir. J. N. Sarkar (ed), ***The History of Bengal***, Vol-11, Muslim period (3rd ed., Dacca: University of Dacca, 1974), p. 57.

[৫৩]. A New chapter was opened in the history of Bengal, with the accission of Ilyas Shah to the throne of Lakshmanavati under the litt le of shamsuddin Ilyas Shah in 743 A. H. (1342 A.D.), cf.: ***Ibid.***, p. 103.

[৫৪]. L. S. S. O'Malley, ***op. cit.***, pp. 23-26; A. H. Dani, ***Muslim Architecture in Bengal*** (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), pp. 141-53; ***যশোহর খুলনার ইতিহাস***, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১১-৭১।

[৫৫]. J. Westland, ***op. cit.***, p. 20.

[৫৬]. এ সময় গৌড়ের ইলিয়াছ শাহী বংশ কর্তৃক যশোর শাসিত হয়। cf.: Mohammed Mohibbullah Siddiquee, ***Socio-Economic Development of Bengal District: A Study of Jessore***, 1883-1925 (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi: Copyright, 1997), pp. 24-25.

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। হোসেন শাহী বংশ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করেন।[৫৭] এরপর পাঠান সুলতান শেরশাহ কর্তৃক ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিজিত হলে বাংলায় কররানী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। এ সময় যশোর তাঁদের শাসনাধীনে আসে। এ বংশের শেষ সুলতান দাউদ খান কররানীর রাজত্বকালে তাজখান কররানী (১৫৭২-১৫৭৬ খ্রিঃ) তাঁর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি শ্রী হরি যশোরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইনিই ইতিহাসে মহারাজা বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তাঁর রাজধানী ছিল ঈশ্বরীপুর।[৫৮] ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে যশোরের রাজা হন।[৫৯]

---

৫৭. হোসেন শাহী আমলে যশোর চারটি পরগণার নামে নামকরণ করা হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় হোসেনাবাদ, তাঁর ভাই ইউসুপ শাহের সময় ইউসুপপুর, এবং তাঁর পুত্র নসরত শাহ ও মাহমুদশাহের শাসনকালে যথাক্রমে নুসরত শাহী, মাহমুদ শাহী নামের উল্লেখ রয়েছে। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলিকাতাঃ শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সং, ১৯৬৫), পৃ. ২৭৬; M. A. Momen, ***Final Report on the Sarvey at Settlement Operations in the District of Jessore***, 1920-24 (Calcutta, 1925), p. 85.

৫৮. During the time of Daud Karrani one of the Ramchandra's grandsons, named Srihari was appointed as a minister with the title of Raja Bikramaditya, when Daud came into confict with the Mughals he entrusted all his wealth to Bikramaditya with the order to remove it to some safe place, After the fall of Daud. with all the wealth Bikramaditya fled to Iswaripur situated on the bank of Ichamati. .... Here he set up his capital and established the new kingdom of Jessore. cf.: L. S. S. O'Malley, ***op. cit.***, pp. 25-26.

৫৯. এ. কে. জি. এম লতিফুল বারী বলেন যে, ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খান কররানীর পরাজয় ও হত্যার ফলে বাংলায় মোঘল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হয়। কিন্তু প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত মোঘল শাসন এদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বিশেষ করে যশোর অঞ্চলে বার ভূঁইয়াগণের অন্যতম প্রধান স্বাধীন জমিদার রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক শাসিত হয়। বলা বাহুল্য, ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক সমগ্র বাংলা বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যশোর তাঁর শাসনাধীন থাকে। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমর বাহিনী, ও নৌবহর সর্বোপরি তাঁর ঐশ্বর্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে সমসাময়িক স্বাধীন জমিদারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছিল। তাঁর রাজ্য যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। যমুনা ও ইছামতি নদীর সঙ্গম স্থলে ধুমঘাট নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে সাধারণ্যে যে উচ্চ ধারণা আছে তা ইতিহাস সম্মত নয়। মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি নিজ রাজ্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন বটে কিন্তু একটি যুদ্ধেও তিনি মোঘল বাহিনীকে পরাজিত করতে পারেননি। তাছাড়া তিনি বিনা শর্তে মোঘল প্রভূত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। cf.: K. G. M. Latiful Bari, ***op. cit.***, pp. 36-37; এ সকল কারণে স্যার যদুনাথ বলেন- "হলদিঘাটের যুদ্ধের বীর রানা প্রতাপের সঙ্গে রাজা প্রতাপাদিত্যের তুলনা করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি হাস্যকর। দ্রঃ কে. এম. রাইছ উদ্দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা* (ঢাকাঃ ৮ম সং, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮), পৃ. ৪৩৩; এ সম্পর্কে J. Westland তাঁর Report এ উল্লেখ করেছেন যে, Raja Todarmal introduct pratapaditya to emperor Akber who recived him with great dilight

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ যশোরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। কেননা সুকৌশলে মোঘল সনদ লাভকারী রাজা প্রতাপাদিত্য এ সনেই মোঘলদের সাথে দেয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন।[৬০] যে কারণে মোঘল সুবাদার ইসলাম খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এ যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন।[৬১] এ সময় থেকে যশোর সরাসরি মোঘল শাসনাধীনে আসে।[৬২]

---

and honour, while in 1580 Todarmal left agra for Bengal to subjugat rebeltions, Protapaditya remained in the court of Akber. At this time, for three years, Basant Raj, a causin and chief adviser of Bikramaditya sent the revenew of Jessore to protapaditya for payment to the imperial treasury. But protapaditya deliberately did not make any payment and at a suitable time informed the emperor that the Rajas of Jessore did not pay their revenue properly. At the same time he expressed that if the emperor kindly granted him the sanad of Jessore he would remain grateful and loyal forever. Within a very short time. pratapaditya earned Akbars fevour and was granted a sanad making him the Raja of Jessore. cf.: James Westland. *op. cit.*, pp. 23-24.

৬০. আনুগত্যের প্রতীক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য-এর ছেলে প্রতাপাদিত্যকে সম্রাট আকবরের দরবারে প্রেরণ করেন। সেখানে অবস্থান কালে যশোর রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী বসন্ত রায় মোঘল দরবারে পরিশোধের জন্য খাজনা প্রতাপাদিত্যের নিকট পাঠাতেন কিন্তু প্রতাপাদিত্য এগুলো না পরিশোধ করে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বকেয়া খাজনা পরিশোধের নিমিত্তে চিরজীবন অনুগত থাকার শর্তে আকবরের কাছ থেকে ১৫৮২ সনে যশোর রাজ্যের সনদ লাভ করেন। J. Westland. *op. cit.*, pp. 23-24; সনদসহ রাজা প্রতাপাদিত্য যশোর আসলে বিক্রমাদিত্য ছেলের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং প্রতাপাদিত্য নিজেকে যশোরের রাজা ঘোষণা করে ধুমঘাটে রাজধানী স্থাপন করেন। দ্র: যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮-৬৫; প্রতাপাদিত্য ১৫৯৯ সন পর্যন্ত সম্রাট আকবরের দরবারে নিয়মিত খাজনা প্রেরণ করেন এবং কখনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেননি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান বাংলায় সুবাদার হয়ে আসলে প্রতাপাদিত্য উপঢৌকনসহ বজ্রপুরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে অষ্টাংগে প্রণাম করে এবং পরবর্তী মোঘল অভিযানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। cf.: Mirza Nathan, Baharistan-I, Ghaybi, Trans. M-I Borah (Gauhati: Government of Assam, 1963), pp. 27-29.

৬১. সুবাদার ইসলাম খান ভাটিতে বিদ্রোহ দমনকালে প্রতাপাদিত্য প্রতিশ্রুত সহযোগিতা প্রদান না করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণের নির্দেশ দেন। সেনাপতি গিয়াস খান ১৬১১ সনে ধুমঘাটের যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর জীবনের অবসান হয়। দ্র: আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, মোঘল আমল, ১ম খণ্ড (রাজশাহী: ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২), পৃ. ১৭২।

৬২. প্রতাপাদিত্যের পরাজয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Haris Chandra Tarkalanker, The History of Raja Propaditya, 2nd ed. (Calcutta: Vernaculr literature Society, 1856; J. Westland. *op. cit.*, pp. 23-24.; *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৮-১৩ খ্রিঃ) যশোর সম্পূর্ণরূপে মোঘল শাসনাধীন আসে। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর যশোর রাজ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে মগ, ফিরিঙ্গী ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমনের জন্য সেনাপতি এনায়েত খাঁ কেই[৬৩] যশোরের প্রথম ফৌজদার নিযুক্ত করেন। এ সময় খাজা তাহির মুহাম্মদ বখশী[৬৪] যশোর জেলার রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত হন। এনায়েত খান প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যশোরের রাজধানী ধুমঘাটের নিকটে হামামখানা নামক একটি প্রাসাদে বাস করতেন এবং সেখান থেকেই তাঁর শাসন কার্য পরিচালনা করতেন।[৬৫] অল্পদিন পরেই ১৬১৩ মতান্তরে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে[৬৬] এনায়েতপুরে তিনি মারা যান।[৬৭]

যশোরের ফৌজদার এনায়েত খানের মৃত্যুর পর সুবাদার ইসলাম খান তাঁর আপন চাচা শায়খ মওদুদ চিশতীকে ১৬১৩ সনে যশোরের ফৌজদার নিয়োগ করেন।[৬৮] ১৬১৭ সনে সম্রাট, শায়খ মওদুদকে চিশতী খান উপাধি দেন; এবং তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে তাকে সম্মানিত করেন। ১৬১৭ সনে ইব্রাহিম খান ফতেহজং বাংলায় সুবাদার হয়ে আসেন। তিনি কামরূপের বিদ্রোহ দমন করার জন্য চিশতী খানের নেতৃত্বে ১৬১৮ সনে তাকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন।[৬৯] আর তদস্থলে ঐ বছরই যশোরের ফৌজদার হিসেবে

---

৬৩. এনায়েত খানের আসল নাম শায়খ-গিয়াস উদ-দীন। তিনি বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের আপন ভাই। তাঁর নাম এনায়েত খান হওয়ার পিছনে একটি ঘটনা রয়েছে। যা হল ইসলাম খান সুবাদার হয়ে বাংলায় আসলে বুকাইনগরের খাজা উসমান আফগান মোঘল থানা আলপ সিংহ আক্রমণ করে থানাদার সাজাউল খানকে হত্যা করে। ইসলাম খান তাঁর ভাই গিয়াস উদ্দীনকে আলপ সিংহ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। শায়খ গিয়াস উদ্দীন আলপ সিংহ পুনরুদ্ধারের কৃতিত্বের জন্য সম্রাট তাকে এনায়েত খান উপাধি দেন। cf. Gulam Hussain Salim, Riyad-us-Salateen, Trans Abdus Salam (Delhi: Idarah-i-Aadabiyat-i-Delhi, Reprint, 1975), p. 9.

৬৪. Khwaja Tahir Muhammad Bakhshi was sent to revenue of Jessore and Arrange for its due realisation, cf.: Sir, J. N. Sarkar, ***The History of Bengal***, Vol- II, p. 269; Gulam Hussain Salim, op. cit., pp. 143-44.

৬৫. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪।

৬৬. এম. আই. বোরাহ ও সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে ১৬১৮ সনে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু বাহারিস্তান গায়েবের বর্ণনা মতে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। cf.: Mirza Nathan, ***op. cit.***, p. 796; *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৫৪।

৬৭. বর্তমান সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এনায়েতপুর নামে একটি গ্রাম আছে, ঐ গ্রামটি এনায়েত খাঁ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। আর এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

৬৮. cf.: Mirza Nathan, ***op. cit.***, p. 796.

৬৯. আবদুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাব খানকে নিয়োগ করেন। তিনি (সোহরাব খান) ১৬১৮-২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ পদে ছিলেন তবে সুবাদার ইব্রাহিম খান তাকে একবার পদচ্যুত করেন অবশ্য পরবর্তীতে তাকে আবার স্বপদে বহাল রাখা হয়।[৭০] এরপর ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহজংকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলা দখল করেন এবং আলী খান নিয়াজীকে সুবা যশোরের সুবাদার নিয়োগ করেন।[৭১] অতঃপর ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ খান[৭২] যশোরের ফৌজদার হয়ে আসেন। এরপর ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে যশোর অঞ্চলের ফৌজদারের দায়িত্ব পান মীর্জা সাফাসী খান।[৭৩] তিনি ত্রিমোহিনীর[৭৪] মীর্জানগরে[৭৫] বসতবাড়ি

---

৭০. বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহজং সংবাদ পান যে, যশোরের ফৌজদার সোহরাব খান মদ পান করে দিনরাত নেশায় বিভোর হয়ে থাকার কারণে শাসনকার্যে শিথিলতা দেখা দেয়, এমনকি তাঁর দায়িত্বহীনতার জন্য ফিরিঙ্গী দস্যুরা যশোর অঞ্চলে লুটতরাজ করে এবং পনের শত নর-নারী ধরে নিয়ে যায়। এসব কারণে তিনি সুবাদার সোহরাব খানকে পদচ্যুত করেন। অবশ্য পরবর্তীতে সোহরাব খানের নিকট হতে যশোরের সুশাসনের অঙ্গীকারনামা নিয়ে ফিরিঙ্গী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অতিরিক্ত ষাটখানা রণতরী তার দায়িত্বে দিয়ে ১৬২১ সনে তাকে পুনরায় স্বপদে বহাল করেন। দ্রঃ আবদুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৭-২৮।

৭১. বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহান সাতদিন ঢাকায় অবস্থানকালে বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করে সুবা বাংলাকে দুটো সুবায় বিভক্ত করেন। এগুলো হল সুবা ভাটি ও সুবা যশোর। যুবরাজ আলী খান নিয়াজীকে সুবা যশোরের সুবাদার নিয়োগ করেন। cf.: Mirza Nathan, *op. cit.*, pp. 694-95.

৭২. সরফরাজ খানের আসল নাম মিরজা 'আব্দুল্লাহ, তিনি বাংলার সুবাদার খান-ই আযমের (১৫৮২-৮৩) চতুর্থ পুত্র। গুজরাটের ফৌজদার থাকা অবস্থায় ১৬১৭ সনে তিনি তিন হাজার মনসব সহ সরফরাজ খান উপাধি লাভ করেন। ১৬২২ সনে তিনি বাংলায় আসেন এবং আনুমানিক ১৬২৫ সনে তাঁকে যশোরের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। দ্রঃ যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫; সরফরাজ খানের শাসনামলে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে মগ ও পর্তুগীজরা ডাকাতি করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কিন্তু সরফরাজ খান কৌশলে মগ-ফিরিঙ্গী অত্যাচার হতে নিজ এলাকাকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। জন সাধারণের কাছে তিনি নবাব সরফরাজ খান নামে পরিচিতি ছিলেন। তিনি ইছামতি নদীর তীরে পুড়া পরগণায় বসবাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর প্রশাসনিক কাছারিবাড়ি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে পুড়া পরগণার নাম বিলুপ্ত করে পাশ্ববর্তী পরগণা হতে কয়েকটি মৌজা নিয়ে নিজ নামে সরফরাজ পুর পরগণা সৃষ্টি করেন। এখনো বর্তমান সাতক্ষীরার কলারোয়ার দক্ষিণে পুড়ার নিকটে সরফরাজ পুর নামক একটি গ্রাম আছে যা তাঁর স্মৃতির স্মারক বহন করে। cf.: Somyth, ***Report of 24 parga nahs*** (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1857); উদ্ধৃত: ডঃ মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, যশোরের মোগল ফৌজদারগণ, *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ) ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০০০-২০০১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৫১।

৭৩. আইন-ই আকবরিতে মীর্জা সাফাসী খানের পরিচয় তুলে ধরে বলা হয়েছে- তিনি পারস্য রাজ বংশের সন্তান এবং বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার শ্যালক পুত্র। শাহ সুজা বাংলার সুবাদার থাকাকালীন সময়ে ১৬৫০ সনে তাঁকে যশোরের ফৌজদার নিয়োগ করেন। cf.: Gulam Hussain Salim, *op. cit.*, p. 181.

৭৪. Trimohini is a village of keshabpur Upazila, Situated 15 Miles sowthern of Jessore Town, cf.: M. M. Siddiquee, *op. cit,*, p. 37.

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করেন। মীর্জা সাফাসী খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মীর্জা সাইফুদ্দীন খানকে যশোরের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়।[৭৬] এরপর সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার দুধভাই নুরুল্লাহ খান[৭৭] ১৬৯৫ সনে যশোরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। নবাব নুরুল্লাহ খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মীর খলিল ১৭১০ সনে যশোরের ফৌজদারের দায়িত্ব লাভ করেন।[৭৮] ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার শাসনামলে (১৭২৭-৩৯ খ্রিঃ) মীর খলিল উল্লাহর মৃত্যু হয়। তিনিই ছিলেন যশোরের সর্বশেষ ফৌজদার।[৭৯]

দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর [৮০] পর সম্রাট হন বাহাদুর শাহ। তাঁর শাসনামলে (১৭০৩-২৬খ্রিঃ) মুর্শিদ-কুলি খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তর করেন। এ সময় থেকে কয়েকটি কারণে[৮১] যশোরের ফৌজদারীর সমাপ্তি ঘটে। এরপর

---

৭৫. মীর্জানগর মীর্জা সাফাসীখানের হাতেই জন্ম হয়। সাফাসী খান যশোরের দায়িত্ব গ্রহণের পর দেখতে পান বর্তমান যশোর খুলনা এলাকায় মগ, ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পুড়া বা সরফরাজ এলাকা থেকে তা দমন করা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। এজন্য তিনি কপোতাক্ষ এবং ভদ্রা নদীর সংগম স্থল ত্রিমোহিনীকে রাজধানী হিসেবে পছন্দ করেন। জানা যায়,১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মীর্জা সাফাসীখান তার সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ নিয়ে ত্রিমোহিনীতে শিবির স্থাপন করে রাজধানী নির্মানে হাত দেন। যে স্থানে ভদ্রা নদী কপোতাক্ষ থেকে বের হয়ে পূর্বগামী হয়েছে তার উত্তর ও দক্ষিণ পাশে কয়েকবর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে রাজপ্রাসাদ, দূর্গ,মসজিদ, সৈনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ত্রিমোহিনীর খ্যাতি ছিল। রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় এর খ্যাতি ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। মীর্জা সাফাসীখানের নামানুসারে ত্রিমোহিনীই মীর্জানগর নামে নতুন পরিচিতি লাভ করে। তিনি ১০৭৩ হিঃ মোতাবেক ১৬৬৩খ্রি স্টাব্দে মারা যান এবং মীর্জানগরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। cf.: Gulam Hussain Salim, *op. cit.*, pp. 181-82.

৭৬. *Ibid*, p. 181.

৭৭. Nurullah Khan was a foster- brother of emperor Aurangajeb who appointed him Faujdar of Jessore, Hughli, Burdwan, and Midinepur before 1696. An able administrator, he established peace and prosperity within a short time, cf.: J. Westland, *op. cit.*, p. 40; M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 37.

৭৮. J. Westland, *op. cit.*, p. 40.

৭৯. M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 27.

৮০. ১১১৮ হিজরী বা ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে রাজত্বের ৫২ তম বর্ষে ৯১ বছর বয়সে আহমদ নগরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় এবং আওরঙ্গবাদে তাঁকে দাফন করা হয়। দ্রঃ *সিয়ার*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫; *রিয়াজ*, পৃ. ৫২৭।

৮১. যশোরের ফৌজদারী উঠে যাওয়ার মূল কারণ সম্ভবত তিনটি। প্রথমত: রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে যশোর রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এর জন্য পৃথক প্রশাসন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়টি: নবাব সুজাউদ্দীনের আমলে কেন্দ্রে অধিক রাজস্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে যশোরের ফৌজদারী তুলে দেওয়া হয়। আর তৃতীয়ত: মুর্শিদকুলি খানের সময় যশোর কয়েকটি জমিদারিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদ কুলি খানের প্রতিনিধি রাজা সীতারাম রায় যশোর শাসন করেন। তাঁর রাজধানী ছিল মাগুরার মুহাম্মদপুর ।[৮২] অবশ্য নরহত্যা ও বিদ্রোহ করার অপরাধে মুর্শিদ কুলি খান সীতারামকে প্রাণদন্ড দেন। রাজা সীতারামের পতনে যশোর তিনটি বৃহৎ জমিদারিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৮৩] এসব জমিদাররা যশোরের রাজস্ব সংগ্রহ করে মুর্শিদাবাদে জমা দিত ।[৮৪] এরপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলেও যশোর মূলত ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় সরাসরি ইংরেজদের শাসনাধীনে আসে এবং ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মুড়ুলীতে প্রথম কোর্ট স্থাপনও Tilman Henckell কে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে যশোর পরিপূর্ণভাবে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয় ।[৮৫]

জমিদাররাই রাজস্ব সংগ্রহ করে কেন্দ্রে পাঠাত ফলে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য আর ফৌজদারীর দরকার ছিলনা। দ্রঃ ডঃ মোহাম্মদ মুহিব উল্যাহ ছিদ্দিকী, *গবেষণা পত্রিকা*, পৃ. ১৫৪।

৮২. L. S.S. O'Malley, *op. cit.*, p. 33; K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 38.

৮৩. K. G. M. Latiful Bari, op. cit., p. 38; After the fall of sitaram Rai, the district was almost entirely devided among three great zamindars. The Rajas of Jessore held the south, the Rajas of Naldahga held the Zamindari of Mahmud shahi in the north and the Rajas of Natore held the Zamindari of Bhusna. cf.: J. Westland, *op. cit.*, p. 50; K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, pp. 38-39.

৮৪. M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 27.

৮৫. The company did not assume direct government until 1781 A. D. and in that year a court was opened at Murli near the town of Jessore. The Jurisdiction of this court extended over the present district of Jessore, Khulna and Faridpur and the First Judge and Magistrate was Mr. Tilman Henekell. cf.: K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 39.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থই হচেছ সমাজধর্মী কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে প্রধান বস্তু। অর্থনীতির উপরই সমাজের বিকাশ ঘটে। যশোরের অর্থনৈতিক ভিত্তি মূলত কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রিক। এ সম্পর্কে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

কৃষি ঃ

অতি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হত। এ অঞ্চলের সর্বত্রই কৃষি কাজের প্রচলন ছিল। শহরে এবং গ্রামে জনবসতি গড়ে ওঠার ফলে কৃষি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। গ্রামে এবং শহরে মানুষের অনুপাত ঠিক কি রকম ছিল তা সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে নির্ণয় করা যায়নি।[৮৬] তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির এলাকাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীর তিনটি তাম্রলিপির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষির সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ অঞ্চলে বসতি স্থাপিত হয়েছিল।[৮৭] এ থেকে ধারণা করা হয় যে, সমগ্র বাংলায় কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

বাংলার অবিচিছন্ন অংশ হিসেবে যশোরও ছিল কৃষি প্রধান অঞ্চল। জেলার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। জেলার উৎপাদন ও আয়ের প্রধান উৎস এবং কর্মসংস্থানের প্রধান অবলম্বন কৃষি। জেলার ভূমি উর্বর ও সমতল। এখানে ধান, শাক-সব্জিসহ অন্যান্য খাদ্য শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। জেলার প্রধান কৃষি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, আখ, খেজুর গুড়, গম, বার্লি, তুলা ও সব্জি-তরকারি ইত্যাদি। সময় মত বৃষ্টিপাতের ফলে এ অঞ্চলের নদী-নালা, খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণে পানি জমে থাকে। ফলে চাষাবাদের কাজ অত্যন্ত সহজ হত। অসংখ্য নদ-নদী বেষ্টিত যশোর অঞ্চলের নদী বাহিত পলিমাটি জমির উর্বরা শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

যশোর জেলার খাদ্য শস্যের মধ্যে প্রধান ফসল ছিল ধান। হান্টারের হিসেব অনুযায়ী জেলায় ১ মিলিয়ন একরের অধিক জমিতে ধান জন্মাত।[৮৮] এখানে প্রধানত আউশ, আমন, বোরো এই তিন প্রকারের

---

৮৬. R. C. Majumdar (ed), ***The History of Bengal***, Vol-1, 2nd imp. (Dacca: University of Dacca, 1963), p. 648.

৮৭. J. Westland, ***op. cit.***, p. 2.

৮৮. W. W. Hunter, ***Emperial Gazetteer of India***, Vol- vii (Oxford: 1907), p. 187.

Dhaka University Institutional Repository

ধানের চাষ হত।[৮৯] জেলার উত্তরাঞ্চলে নিচু জমিতে শীতকালে আমন ধানের চাষ হত। একারণে আমন ধানকে শীতকালীন ধানও বলা হয়ে থাকে।[৯০] উঁচু জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়। বিল-বাঁওড় এলাকায় বোরো ধানের চাষ হয়। শীতকালে বিল-বাঁওড়ের পানি শুকিয়ে গেলে বীজ বপন করা হত এবং বিলের পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হত।[৯১] সদর ও ঝিনাইদহ মহকুমায় ধান উৎপন্ন হলেও তা চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিলনা। এখানে ধান চাযের প্রধান অঞ্চল ছিল সুন্দরবনের আবাদি সমতল ভূমি।[৯২] সদর ও ঝিনাইদহ মহকুমাসহ জেলার অন্যান্যাংশে আউশ ধান এবং নড়াইলে বিশেষ করে বোরো ধান উৎপন্ন হত। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট অনুযায়ী জেলায় মোট ধানের চাষ হয়েছিল ৩,৩৫,৫০০ একর জমিতে। এর মধ্যে আমন ১৯,০০০ একর, আউশ ১,৩৫,০০০ একর এবং বোরো ১০,৫০০ একর জমিতে চাষ হত।[৯৩] উনিশ শতকে যশোরে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ১৩,৮১,৮০০ একর।[৯৪] সুতরাং বলা যায় যশোর জেলার আবাদি জমির অধিকাংশ অংশ জুড়ে ছিল ধানের চাষ।

কৃষির শুরু থেকে ধানের পাশাপাশি বাংলায় আখ চাষ হত।[৯৫] এদেশে যে প্রচুর পরিমাণে আখ চাষ হত চীনাদের বর্ণনায় তার সত্যতা পাওয়া যায়।[৯৬] এই আখ থেকে চিনি উৎপাদন করা হ ত এবং তা বিদেশে রপ্তানিও করা হত। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলায় প্রায় ৬০০০ একর জমিতে আখের চাষ হয়।[৯৭] চিনি উৎপাদনের জন্য আখের পাশাপাশি যে ফসলের নাম এসে যায় সেটি হল যশোরের খেজুর গাছের চাষ আখের চেয়ে বেশি হত। আখ চাযের জন্য ভাল জমির দরকার হত এবং এ জমির উপর ধার্যকৃত কর অন্যান্য জমির চেয়ে বেশি ছিল। তাছাড়া আখ জমিতে বার মাস থাকে এবং সার ও সেচের প্রয়োজন

---

৮৯. M. M. Siddiquee, *op. cti.*, pp. 111-12.

৯০. W. W. Hunter, *A Sta tistical Account of Bengal*, Vol-ii (New Delhi: DK. Publishing House, 1973), p. 241.

৯১. M. A. Momen, ***Final Report on the survey and settlement operation in the District of Jessore 1920-24*** (Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot. 1925), p. 21.

৯২. J. Westland, ***op. cit.***, p. 177; W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 324.

৯৩. M. A. Mommen. ***op. cit.***, p. 21.

৯৪. W. W. Hunter, ***Imperial Gazetteers***, p. 187.

৯৫. R. C. Majumdar, ***op. cit.***, p. 650.

৯৬. P. C. Bagchi (ed.), ***Visva Bharati Annals*** (visva Bharati Publisher Department, 1945), p. 126.

৯৭. J. Westland, ***op. cit.***, App. B. P. iii.

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৯৮] কিন্তু খেজুর গাছ শুকনো জমিতে জন্মাতো এবং ৭ বছর বয়স থেকে রস দেয়া শুরু করে একাধারে ২৫/৩০ বছর পর্যন্ত রস দেয়।[৯৯] এজন্য জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ সর্বত্র কৃষকদেরকে কৃষির অন্যান্য পণ্যের চেয়ে খেজুর গাছ চাষের প্রতি বেশি আকৃষ্ট করে।[১০০] সদর মহকুমা ও ঝিনাইদহ মহকুমাসহ জেলার সর্বত্রই এই খেজুরের চাষ হত।[১০১] ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেলার ১৭৫০০ একর জমিতে খেজুর গাছের চাষ হয়। এ সময় অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, একর প্রতি গড়ে ৩০০টি গাছ লাগানো হয়।[১০২]

বাংলার অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট ছিল অন্যতম। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে এই পাট ব্যবহৃত হত। চতুর্দশ শতাব্দী হতে বাংলায় পাঠ চাষের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।[১০৩] পাট ও পাটের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা হত।[১০৪] যশোর জেলার প্রধান বাণিজ্য সম্ভার ছিল পাট। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপক হারে এর চাষ হতনা। কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সামান্য চাষ করত।[১০৫] পরবর্তীতে এ চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষকরা নীল এবং খেজুর গাছের চাষের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করে। ফলে পাট চাষ ব্যাহত হয়।[১০৬]

যশোরে অন্যান্য খাদ্য শস্যের ন্যায় গম ও বার্লির চাষ হত। বিভিন্ন উৎসবে মানুষ এ সব খাদ্য শস্য খেত। জেলার মাগুরা মহকুমায়ও ৩৬৪ একর ও ঝিনাইদহ মহকুমায় ১১০৯ একর জমিতে গমের চাষ হত।[১০৭] এ ছাড়া ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৭৫০০ একর জমিতে বার্লির চাষ হয়।[১০৮]

---

৯৮. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৯।

৯৯. W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 281.

১০০. J. Westland, ***op. cit.***, p. 161; W. W. Hunter, ***op. cit.***, pp. 188-89.

১০১. M. A. Mommen. ***op. cit.***, p. 41.

১০২. J. Westland, ***op. cit.***, App. B. P. iii.

১০৩. R. C. Majumdar, ***op. cit.***; উদ্ধৃত,মোঃ আমিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২।

১০৪. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, মোহাম্মদ আসদুজ্জামান অনূদিত, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১ বাং), পৃ. ৩৩৪।

১০৫. W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 254.

১০৬. M. M. Siddiquee, ***op. cit.***, p. 131.

১০৭. ***Ibid.***, p. 145.

১০৮. W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 243.

Dhaka University Institutional Repository

যশোরের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে তুলাকে গণ্য করা চলে। এই তুলা দিয়ে দেশীয় তাঁতিরা বস্ত্র বয়ন করত। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলায় ২৪০০মন তুলা উৎপন্ন হয়।[১০৯] কিন্তু ব্রিটিশদের ক্ষতিকর নীতির ফলে যশোরের তুলা চাষ ক্রমান্বয়েহ্রাস পেতে থাকে এবং কালক্রমে তুলা চাষ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়ে।

আঠার শতকের শেষের দিকে যশোরে গাঁজার চাষ শুরু হয়। কেশবপুর, রামচন্দ্রপুর পরগণা, তারাগোনিয়া এবং জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রচুর পরিমাণে গাঁজার চাষ হত।[১১০] ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে ৫০,০০০/৬০,০০০ মন গাঁজা উৎপন্ন হত এবং এ ব্যবসা কেশবপুর, ফকিরহাট, নওয়াপাড়া ও কুষ্টিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১১১] কোম্পানির লোকেরা জেলায় নীল চাষ শুরু করলে গাঁজার চাষ ব্যাপকভাবেহ্রাস পায়।[১১২]

যশোর জেলায় নীল চাষ ঃ

যশোর জেলার অর্থনৈতিক কাঠামোয় যে পণ্যটিকে ঘিরে ইতিহাসের অনেক ঘটনা বিস্তৃত হয়েছে সেটি হল ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত বিতর্কিত নীল চাষ। এটি কোম্পানি শাসন আমলে যশোরের একটি অন্যতম কৃষি বাণিজ্য পণ্য হিসেবে পরিগণিত ছিল। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই যশোরে নীল চাষ শুরু হয়। ফরাসী বণিক লুই বন্ড ছিলেন জেলায় প্রথম নীল চাষের জনক। তিনি আমেরিকা থেকে নীল উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি এ দেশে নিয়ে আসেন। লুই বন্ড ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস- এর অনুমতি নিয়ে রূপদিয়া নামক স্থানে কুঠি নির্মাণ করেন।[১১৩]

---

[১০৯]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৩।

[১১০]. J. Westland, *op. cit.*, p. 124.

[১১১]. *Ibid.*

[১১২]. গাঁজার চাষহ্রাস পওয়ার কারণ হল- ইংরেজ নীলকররা গাঁজার পরিবর্তে নীল চাষ করতে কৃষকদেরকে বাধ্য করে। গাঁজা চাষের শৈশব কাল ছিল যশোর এবং এখান থেকেই নওগাঁয় স্থানান্তরিত হয়। নওগাঁর মাটি ও আবহাওয়া নীল চাষের জন্য উপযোগী ছিলনা। কিন্তু গাঁজা চাষের জন্য উপযোগী ছিল। এতে ধারণা করা হয় যে, নীলকররা উর্বর, সমতল যশোরে নীল চাষ প্রবর্তন করে নওগাঁয় গাঁজার চাষ শুরু করেন। cf.: Md. Wazed Ali, Ganja in Naogaon: A Socio-Economic Study, ***Journal of the Institute of Bangladesh Studies***, Vol- ii, 1977, p. 86; M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 123-. F.n.

[১১৩]. J. Westland, *op. cit.*, p. 135; *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

এর পরের বছর ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে টাফট নামক অন্য একজন ইংরেজ মাহমুদশাহীতে[১১৪] নীল চাষের অনুমতি লাভ করেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে[১১৫] টেইলর নামক একজন ব্যক্তিকে পদ্মা অববাহিকা জুড়ে নীল কুঠি স্থাপনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১১৬] ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে যশোরের সিভিল সার্জন ডা: এন্ডারসন বারান্দী ও নীলগঞ্জে ও দৌলতপুরে কুঠি স্থাপন করেন।[১১৭] সেকারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন ভূমিতে নীল চাষ শুরু হয় এবং ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে যশোরের সর্বত্র নীল কুঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১১৮] বলা বাহুল্য, যশোর অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া ছিল নীল চাষের উপযোগী।[১১৯] ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলায় বসবাসকারী ইউরোপীয় নাগরিকদের তালিকা থেকে সে সময়ের নীলকরদের নাম পাওয়া যায়।[১২০] যশোর ও নদীয়ায় উৎপাদিত নীল সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে উন্নতমানের ছিল।[১২১] ১৮৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার ১৬৮১৮ মন নীল উৎপন্ন হয়।[১২২] কিন্তু ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের নীল বিদ্রোহের পর নীল চাষ হ্রাস পেতে থাকে এবং আখ নীল চাষের স্থান দখল করে।

---

১১৪. মাহমুদশাহী তৎকালীন যশোর জেলার একটি পরগণার নাম। এটি জেলার উত্তরাংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল।

১১৫. এ সনেই জেনিন নামক অপর এক ইংরেজ যশোর থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে চৌগাছায় একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। cf.: *Ibid*, p. 135.

১১৬. *Ibid*; *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৭।

১১৭. J. Westland, *op. cit.*, pp. 135-36; বারান্দী/ রাবুদী ও নীলগঞ্জ যশোর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। দৌলতপুর খুলনার সন্নিকটে অন্য একটি স্থান।

১১৮. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 250.

১১৯. যশোর জেলার মাটি ও আবহাওয়া অন্যান্য অঞ্চলের থেকে নীল চাষের জন্য উপযোগী ছিল এবং শহরটি কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ার ফলে নীলকররা এ জেলায় নীল চাষের প্রতি মনযোগী হয়। cf.: Amalendu-De "Indigo planted its expension in Different Areas of Bengal" *Journal of History*, Vol-vi, 1981, p. 134.

১২০. Letter from A. M. Wilbek, *Collector of Jessore to Mr. Anderson* (dated Jessore the 3rd Dec, 1805), J.C.R. Bandle, No. 321; ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলায় নিম্নলিখিত নীলকররা অবস্থান করত। এ সময় ডেভেরেল অবস্থান করছিলেন হাজরাপুরে ব্রিসবেন ডাতিয়া কাটিতে, টেইলর এবং নুডসন মিরপুরে, বিতস সুন্দরিয়ার এবং র‍্যাজেট নওহাট্টায় নীলচাষ করত। cf.: J. Westland, *op. cit.*, pp. 135-36.

১২১. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৭।

১২২. Report of the Indigo Commission Appointed under Act x1 of 1860: Minute of Evidence 1860.

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ

যশোর জেলায় উৎপাদিত অর্থকরী ফসলের উপর ভিত্তি করে কতকগুলো বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠে। একে ভিত্তি করেই জেলার বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু হয়। এদের মধ্যে বস্ত্র, চিনি ও নীল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বস্ত্র ঃ

সুতা এবং সুতী বস্ত্র শিল্পকে পূর্ব হতেই যশোরের প্রধান শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা চলে। অত্র এলাকার অর্থনীতিতে এই শিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল মুসলিম আমলেও এটিই ছিল প্রধান শিল্প। মুসলিম শাসনামলে যশোরে প্রচুর বস্ত্র তৈরি হত। কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকেও এই ধারা অব্যাহত থাকে।[১২৩] আর সুতা ও বস্ত্র তৈরিতে তুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই তুলা থেকে সুতা তৈরি করা হত। কৃষকদের নিকট থেকে তুলা ক্রয় করে পরিষ্কার করার পর মেয়েদের দ্বারা চরকায় সুতা কাটা হত।[১২৪] এ সুতা নিয়ে তাঁতি ও যোগীরা কাপড় প্রস্তুত করত।[১২৫] ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে যশোরে মোট ২৪,০০০ মন তুলা উৎপন্ন হয়। ঐ বছরে স্থানীয় কারখানার চাহিদা মেটাবার জন্য বাইরে থেকে আরো ৩,৬০০মন তুলা আমদানি করা হয়।[১২৬] এছাড়া ভূষণা থেকে সুতাও আমদানি করা হয়। অবশ্য এর পরিমাণ ছিল অল্প। এই ৬ হাজার মন তুলা ব্যবহার করে ঐ বছর তাঁতিরা ১,৪৮,১০০ খানা কাপড় তৈরি করে।[১২৭] যশোরের সিদ্ধিপাশা নবনীয়া, সাতবাড়িয়া, চিংড়া এবং সাতক্ষীরার বাকসা প্রভৃতি স্থানে উন্নত ধরনের কাপড় তৈরি হত।[১২৮] মুড়ুলির নিকটবর্তী রাজারহাট, কেশবপুর, ধানদিয়া, চান্দুড়িয়া এবং ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী হাট কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।[১২৯] ফরিদপুরের ফারাযী সম্প্রদায়ের মুসলমান ব্যবসায়ীরা কাপড় নিয়ে এসে লক্ষীপাশায় বিক্রি করত। কিন্তু কোম্পানি সরকারের একাধিক অনিষ্টকর নীতির কারণে বাংলায় তথা যশোরে বস্ত্র শিল্প উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। বলা বাহুল্য, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর বাংলার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বস্ত্র শিল্প-বাণিজ্যও কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ শাসনকালে বুড়ন ও সোনাবাড়িয়ায় কোম্পানির দু'জন রেসিডেন্ট অবস্থান করে জেলার তাঁতিদের আগাম দাদন দিয়ে

---

১২৩. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৫/৫৩; J. Westland, *op. cit.*, pp. 134-35; M. M. Siddiquee, *op. cit.*, pp. 115-16.

১২৪. J. Westland, *op. cit.*, p. 135.

১২৫. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৫।

১২৬. J. Westland, *op. cit.*, p. 135.

১২৭. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৫ ও ৫৩।

১২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪৬-৭৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

বস্ত্র ক্রয় করত।[১৩০] তারা এক্ষেত্রে দেশীয় দালাল এবং মৎসুদ্দীদের সহযোগিতায় বিভিন্নভাবে তাঁতিদের দাদন গ্রহণে বাধ্য করত।[১৩১] যশোর জেলার উত্তরাংশে কামারখালিতে একটি রেশম কারখানা ছিল।[১৩২] এখানেও রেসিডেন্টের অন্যায়-অত্যাচার তাঁতিদের উৎপাদনকে ব্যাহত করে।[১৩৩] এমনকি আইন করে[১৩৪] রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা হয় যা তাঁতিদেরকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত করে তোলে। সর্বোপরি আঠার শতকের ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বস্ত্র শিল্পেও বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়। ফলে কোম্পানি বাংলা থেকে বস্ত্র আমদানি বন্ধ করে বাংলাকে একটি বস্ত্রের বাজারে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালায়। ফলে বাংলার বস্ত্র শিল্প পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ওঠে। একইভাবে যশোরের বস্ত্র শিল্পের উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শেষবধি উনিশ শতকের মধ্যেই এটি একটি রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়।

চিনি ঃ

চিনি বাংলার শিল্প-বাণিজ্যিক পণ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। আখ এবং খেজুরের রস থেকে এই চিনি উৎপাদিত হত। এদেশের জনগণের চাহিদাপূরণ করার পর চিনি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হত। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৫০% লাভে ৫০,০০০ মন চিনি বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছিল।[১৩৫]

যশোরের শিল্প পণ্যের মধ্যে এই চিনিই ছিল অন্যতম প্রধান। ব্রিটিশ পূর্ব সময়ে চিনিই ছিল যশোরের প্রধান শিল্প। যশোরে সামান্য আখের চাষ হত, এখানকার সব চিনিই খেজুর রস থেকে তৈরি

---

১২৯. W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 302.

১৩০. W. W. Hunter, ***Imperial Gazetteer***, Vol-vii, p. 188.

১৩১. J. Westland, ***op. cit.***, p. 71; যশোরের কালেক্টরের নিকট প্রেরিত লিখিত অভিযোগ থেকে একথা প্রমাণিত হয়। এছাড়া রেসিডেন্টদ্বয় তাঁতিদের নিকট থেকে প্রচলিত বাজারদরের অনেক কম দামে বস্ত্র কিনত। cf.: ***Ibid.***

১৩২. ***Ibid.***

১৩৩. এখানেও রেসিডেন্টদ্বয় বিভিন্ন কৌশলে তাঁতিদের দাদন দিয়ে বস্ত্র ক্রয় করত। কোম্পানির নি:শর্ত সমর্থন এ সকল কারখানা এবং এর রেসিডেন্টদের লাগামহীন করে তোলে। ফলে তারা বলপূর্বক দাদন প্রদান ও আইন শৃংখলা ভঙ্গ করে প্রজা পীড়নে সমর্থ হয়। cf.: ***Ibid.***, p. 73.

১৩৪. ১৭৮৪ খ্রীস্টব্দে কোম্পানি একটি ফরমান জারি করে। জারিকৃত আদেশে চুক্তিবদ্ধ তাঁতিদের সার্বিক রেসিডেন্টের হাতে অর্পণ করা হয়। cf.: ***Ibid***; এতে আরো বলা হয় যে. চুক্তিবদ্ধ তাঁতিদের বকেয়া খাজনার জন্য জমিদাররা তাদের আটক করতে পারবেনা। এক্ষেত্রে তারা (জমিদাররা) রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করতে পারবে মাত্র। এই আইনের ফলে একদিকে যেমন রেসিডেন্টের উৎপীড়ন বাড়ে, তেমনি জমিদারের খাজনা বাকী পড়তে আরম্ভ করে। এই আইন যশোরের তাঁতিদের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৩৫. J. C. Sinha, ***Economic Annals of Bengal*** (London: Makmillian and co. Ltd. 1929), p. 36.

Dhaka University Institutional Repository

হত।[১৩৬] ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য যশোরের খ্যাতি ছিল ঈর্ষণীয়। ১৭৯১ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, যশোর জেলার বাৎসরিক চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ মন এবং প্রায় অর্ধেক চিনি কলকাতায় রপ্তানি করা হয়।[১৩৭]

যশোর জেলার সব মহকুমায় সমান চিনি উৎপন্ন হতনা। জেলার মাগুরা এবং ঝিনাইদহ মহকুমায় বেশি চিনি উৎপন্ন হত। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাগুরা মহকুমায় ১৮৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে শুধু খেজুর চিনি উৎপাদনের ফ্যাক্টরির সংখ্যা ছিল ২টি ও চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৬৬ মন এবং তা ১৮৭২-৭৩ এ বৃদ্ধি পেয়ে ফ্যাক্টরির সংখ্যা হয় ২০টি এবং চিনি উৎপাদিত হয় ৪৪০৩ মন। আর (১৮৬৩-৭৩) এই দশ বছরে মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫,৭৫৭ মন।[১৩৮] ঝিনাইদহ মহকুমায় ১৮৬২-৬৩ তে চিনি উৎপাদনের জন্য ফ্যাক্টরির সংখ্যা ছিল ১০টি এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৪৬৫ মন। আর ১৮৭২-৭৩ সনে ফ্যাক্টরির সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩ -এ এবং এ সময়ে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ১,৩২,৬৮৯ মন। (১৮৬৩-৭৩) এই দশ বছরে মোট চিনি উৎপাদিত হয় ৬,৭১,৫৩৫ মন।[১৩৯]

যশোরের চিনি স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বিদেশেও রপ্তানি করা হত।[১৪০] জেলায় উৎপাদিত চিনি ইউরোপীয়দের কর্তৃত্বাধীনে দেশীয় কুরি বা কারিগরদের মাধ্যমে বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হত। ইউরোপীয়দের কারখানায় উৎপন্ন চিনি ছিল উৎকৃষ্টমানের তাই এগুলো ইউরোপে রপ্তানি হত। অন্যদিকে দেশীয় কারিগরদের উৎপাদিত চিনি ছিল নিম্ন মানের এগুলো স্থানীয় প্রয়োজন মেটাত। ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে ধুবা[১৪১] কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রথম কোটচাঁদপুরে একটি চিনি কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। একই কর্তৃপক্ষ জেলার ত্রিমোহিনীতে অপর একটি কারখানা বসায়। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে চৌগাছায়

---

১৩৬. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৭।

১৩৭. J. Westland, ***op. cit.***, p. 161; W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 280.

১৩৮. Ramshunker Sen, ***Report on the Agricultural Statistics of Jessore*** (Calcutta: Bengal Secretariate press, 1873), pp. 32-33.

১৩৯. ***Ibid.***

১৪০. যশোরের চিনি উৎপাদন ও রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র ছিল কোটচাঁদপুর, কেশবপুর, ত্রিমোহিনী, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, যশোর সদর, খাজুরা। চিনি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বিদেশে রপ্তানি করা হত। কলকাতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র বাখেরগঞ্জের নলসিটিতে রপ্তানি করা হত। cf.: W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 289.

১৪১. ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে বাংলায় প্রথম চিনি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ধমানের ধুবা নামক স্থানে। এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন ব্লেক নামক ইংরেজ। cf.: J. Westland, ***op. cit.***, p. 162.

Dhaka University Institutional Repository

Gladstone, Wyllie and Company একটি কারখানা গড়ে তোলে। ১৮৪০ এর দশকে জেলায় অনেকগুলো কারখানা গড়ে ওঠে। এছাড়া ১৮৫৩ সনের দিকে জেলার কেশবপুর, ঝিকরগাছা, নারিকেল বাড়িয়া এবং তাহিরপুরে অন্যান্য কারখানাগুলো গড়ে উঠেছিল।[১৪২] কিন্তু বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে[১৪৩] এই শিল্প সাফল্য অর্জনে সামর্থ হয়নি এবং পর্যায়ক্রমে এ সকল কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এমনকি উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে যশোরে কোটচাঁদপুর ও চৌগাছা কারখানা ছাড়া অন্যান্য সকল কারখানা বন্ধ হয়ে যায়।[১৪৪]

নীল ঃ

নীল ব্যবসা ছিল বেশ লাভজনক। এজন্য ইউরোপীয়রা যশোরে অনেকগুলো ফ্যাক্টরি স্থাপন করে।[১৪৫] ইউরোপীয়দের পাশাপাশি দেশীয় ব্যবসায়ীরাও এ ব্যবসায় আসেন। ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে দেশীয়রা ইউরোপীয়দের চাষ পদ্ধতিতে যশোর তথা বাংলার অন্যান্য জেলায় ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন।[১৪৬] এ সময় দেশীয়দের ফ্যাক্টরি ছিল প্রায় ইউরোপীয়দের ফ্যাক্টরির সমান।[১৪৭] নড়াইলের জমিদারদের যশোর, পাবনা এবং ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে নীলের ফ্যাক্টরি ছিল।[১৪৮] ঝিনাইদহের মথুরাপুরের বকশি, পবহাটির মজুমদার, ভগবান নগরের রায়, সাধুহাটির আচার্য এবং মাগুরার তালঘড়ির ভট্টাচার্যের অনেকগুলো কুঠি ছিল। ঝিনাইদহ ও মাগুরার মধ্যে নলডাঙ্গার রাজা এবং হাটবাড়ীয়ার জমিদারদের অনেকগুলো ফ্যাক্টরি

---

১৪২. *Ibid.*

১৪৩. এ সকল প্রতিবন্ধকতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ইউরোপীয় কারখানায় উৎপাদিত চিনি উৎকৃষ্টমানের হলেও এর উৎপাদন ব্যয় ছিল দেশীয় উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে স্থানীয় বাজারে এই চিনি বিক্রি হতনা। আর বাংলার চিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 'লেভি' বাণিজ্যকর প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া এ সময় কলকাতার সন্নিকটে কাসিপুর এবং বালিতে দুটি চিনি কল স্থাপন করা হয়। অবস্থান এবং উৎপাদনগত সুবিধার কারণে এ দুটি চিনিকল ইউরোপের বাজারে চিনি রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ফলে যশোরে উৎপাদিত চিনির বাজার সংকুচিত হয়। cf.: J. Westland, *op. cit.*, pp. 162-63.

১৪৪. *Ibid.* p. 163.

১৪৫. J. Westland, *op. cit.*, pp. 135-36 .

১৪৬. Amalendu De, "Indigo Planted. Its expension in Different Areas of Bengal", ***Journal of History***, Vol-vi (Calcutta: 1981), p. 134.

১৪৭. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 250.

১৪৮. J. Westland, *op. cit.*, p. 160.

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। শ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্দ্র, বসু, খালকুলার মিত্র, নারিকেল বাড়িয়ার সাধুবাদিগের এবং শ্রীরামঘোষদের যশোরের বিভিন্ন স্থানে ফ্যাক্টরি ছিল।[১৪৯]

কিন্তু ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্লাবনে দেশীয় সকল মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এছাড়া ডাকাতির কবলে পড়েও অনেকে ফ্যাক্টরি বিক্রি করে দেয়।[১৫০] উল্লেখিত শিল্পগুলো ছাড়াও যশোরে আরো কিছু ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যমান ছিল যা বাংলার মধ্যে বিখ্যাত ছিল।[১৫১]

বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর ঃ

মুসলিম শাসনামলে শহর খলিফাতাবাদ, ফতেহবাদ, মহাম্মাদাবাদ এবং অনেকগুলো নদী বন্দর যেমন- সেনের বাজার, জাহাজঘাটা, বাণিজ্যিক বন্দর- বারবাজার, মুড়ুলী, পয়োগ্রাম, কসবা প্রভৃতির উন্নতি হয়েছিল।[১৫২] এছাড়া সুলতানী যুগের বাংলায় ২১টি টাকশাল নগরী ছিল যার চারটি ছিল যশোর এলাকায়।[১৫৩] এছাড়া অনেকগুলো নদী বন্দর বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সমৃদ্ধি করেছিল। আরও অনেকগুলো টাকশাল নগরী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যা যশোরের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।[১৫৪]

যশোর জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে স্থানীয়। তথাপি এখানে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছিল। জেলার প্রধান প্রধান শিল্প এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে সদর মহকুমা, খাজুরা, কেশবপুর, রাজারহাট, ত্রিমোহিনী, বসুন্দিয়া, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, রূপদিয়া, চৌগাচা, যাদবপুর

---

[১৪৯]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৬-৬৮।

[১৫০]. W. W. Hunter, op. cit., p. 250; নীলকান্ত জমিদার চৌগাছাতে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। কিন্তু কলকাতা থেকে নীল বিক্রি করে আসার পথে ডাকাতের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে নিজ গ্রামের জমিদার এবং কৃষ্ণনগরের সরকারি উকিল তারিনীর নিকট ফ্যাক্টরি বিক্রি করে দেন। cf.: J. Westland, *op. cit.*, p. 198.

[১৫১]. এসব ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে যশোর অঞ্চলে বাঁশ থেকে গৃহের সরঞ্জাম নির্মাণে যথেষ্ট শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। নানা জলজ গাছের বাকল বা বেত দ্বারা মাদুর ও শীতল পাটি তৈরি করত। এ জেলার ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মৃৎশিল্প প্রাত্যহিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। মৃত্তিকার পাত্রের উপর রঙ দ্বারা মীনা বা এনামেল করত যা বাংলার মধ্যে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এ সকল শিল্পের পতন হয়। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪২।

[১৫২]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮-৭৭।

[১৫৩]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪।

[১৫৪]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

কালীগঞ্জ, নওয়াপাড়া, ঝিনাইদহ মহকুমার কোটচাঁদপুর, আবাইপুর, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, মাগুরা মহকুমার সোলেপুর, কালিয়া, পুরুনিয়া, রাধানগর, লোহাগড়া, লক্ষীপাশা, বনগাঁও মহকুমার বনগাঁও, গোপালগঞ্জ, গোরাপাট্টা, মহেশপুর।[১৫৫] এ সকল মহকুমাগুলো বর্তমানে জেলায় উন্নীত হয়েছে।

[১৫৫]. M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 158.

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় অবস্থা

যশোর জেলায় ইসলাম প্রচারের পূর্বে ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। তা নাহলে এ জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার ও তার সার্বিক বিকাশধারা সম্যক অবগত হওয়া যায়না। এ জেলায় জনসাধারণ মুসলমানদের আগমনের পূর্বে কি ধর্ম পালন করতেন, তারা কিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করেন জানা গেলে নবদীক্ষিত মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য, আগমনকারী মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা জানা সহজ হয়। তবে সবার আগে জানা দরকার এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী কারা ও তাদের সামাজিক- ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ কেমন ছিল। গঙ্গা-করতোয়া-লৌহিত্য বিধৌত; সাগর-পর্বতধৃত, রাঢ়, পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট এই চতুর্জনপদ সম্বন্ধ বাংলাদেশে প্রাচীনতম কাল হতে আরম্ভ করে তুর্কী অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করে এনেছে এবং কালের আবর্তে একে একে কোথায় কে কিভাবে বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাস তার সঠিক হিসেব রাখেনি। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়াশীল মননের রচিত কোন ইতিহাসে তার হিসেব নেই একথা সত্য কিন্তু মানুষ তার রক্ত ও দেহগঠনে ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তা গোপন করতে পারেনা। সকলের উপর এই বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা তার প্রচছন্ন ইঙ্গিত রেখে গেছে বাঙালির প্রাচীন সমাজ বিন্যাসের মধ্যে। কাজেই যশোরের ধর্মীয় অবস্থা আলোচনার সুবিধার্থে বাংলার তথা যশোর অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলার অধিবাসী কারা এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। অতি প্রাচীনকালে এখানে আর্যদের[১৫৬] আগমনের পূর্বে অন্তত পক্ষে আরো ৪টি জাতির নাম পওয়া যায়। সেগুলো হলোঃ নেগ্রিটো, অস্ট্রো-

---

[১৫৬]. আর্য একটি প্রাচীন জাতির নাম। এদের পরিচয় ও উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। নৃতাত্ত্বিক রমা প্রসাদের মতে অবৈদিক আর্যরা ছিল আলপাইন মানব ধারার লোক। যারা এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে। তিনি প্রমাণ হিসেবে বাংলার মানুষের মাথা মধ্য এশিয়ার গালচা ও তাজিকদের গোল মাথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। cf.: Chanda. R. "*The Indo Arayan Races*" (Rajshahi: 1966), pp. 65-71 and 75-78; উদ্ধৃত, এবনে গোলাম সামাদ, *নৃতত্ত্ব* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১০১-২; ডঃ বিরজা শংকর গুহের মতে বৈদিক আর্যরা ছিল ককেশীয় অঞ্চলের অধিবাসী এবং তারা ছিল লম্বা মাথা বিশিষ্ট। তাঁর মতে কালো থেকে গাঢ় বাদামী রং, ছোট ছোট পশমী চুল পুরো উল্টানো ঠোঁট, খর্বকায় নিগ্রো বেটে মানুষদের প্রভাব সুন্দরবন অঞ্চলের জেলে এবং যশোরের বাঁশফোড়দের মধ্যে দেখা যায়। cf.: Dr. B. S. Guha, ***An outline of Racial Ethnology in India*** (Calcutta: 1937), উদ্ধৃত, *খুলনা জেলা,* পৃ. ২৮০; আর্যদের উৎপত্তি ও পরিচয় উল্লেখপূর্বক আবদুল মান্নান তালিব তাদের ভারতে প্রবেশের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- আর্যদের আদিবাস মূলত ইরানে। বাদশাহ গশতাসপের আমলে যরদাশত (যরথুষ্ট্র) নামক একজন ধর্ম প্রচারক সেখানে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। যা হলঃ আল্লাহ হচেছন পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রের একমাত্র মালিক ও প্রভু। কাজেই কোন

এশিয়াটিক, দ্রাবিড়[১৫৭] ও ভোটচীনীয়। [১৫৮] বিখ্যাত ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ সিলভা লেভী এ সম্পর্কে বলেন- অংগ, বংগ ও পন্ড্র নামগুলো আর্য ভাষার নয়। এসব নাম অষ্ট্রিক ভাষার।[১৫৯] এ থেকে তিনি বোঝাতে চান যে, এ সব মানব গোষ্ঠী প্রাক আর্যযুগের।[১৬০] নৃতাত্ত্বিক রিজলের মতে বাঙালিরা মঙ্গোল, দ্রাবিড় বংশোদ্ভুত।[১৬১] তবে বাঙালি নৃতাত্ত্বিক রমা প্রসাদ এ মতের সমালোচনা করে বলেন- বহু প্রাচীনকালে পামীর অঞ্চল থেকে আলপাইন বংশোদ্ভুত লোকেরা ভারতীয় উপমহাদেশে এসে বসতি শুরু করে।[১৬২]

পূর্বোক্ত আলোচনায় অনুমিত হয়ে যে, অতি প্রাচীন কাল থেকে বঙ্গে অনার্যদের আগমন ঘটলেও খিস্টপূর্ব ১ হাজার অব্দে এ উপমহাদেশে আর্যায়নও শুরু হয়। এই আর্যায়ন প্রকৃতপক্ষে ব্রাক্ষ্মণায়ন। এখানকার কালচে রঙের অধিবাসীরা বৈদিক ধর্মের প্রভাবে পড়ে এবং পরবর্তীতে এই বৈদিক ধর্মই হিন্দু ধর্মে রূপ নেয়। উচচ শ্রেণীর অনার্যরা নতুন ধর্মের উচচ বর্ণে একীভূত হলেও অধিকাংশ অনার্যরা নমঃশুদ্রে

দেব-দেবীর ‘ইবাদাত বা পুজা অর্চনা করা যাবেনা। শুধু আল্লাহর‘ইবাদত করতে হবে। পরকাল ও কর্মফলকে বিশ্বাস করতে হবে ইত্যাদি। তাঁর এ সত্য ধর্ম প্রচারে এক সময় রাজা, রাণী ও সভাসদসহ জনসাধারণের অনেকেই আকৃষ্ট হন। কিন্তু বেশ কিছু পন্ডিত-পুরোহিতের দল বাপ-দাদাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং যরথুষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে যরথুষ্ট্র ও তার সত্য ধর্মের অনুসারীদের জয় হয়। ফলে পুরোহিত ও তাদের পৌত্তলিক অনুসারীরা পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে চলে যায়। সত্য ধর্ম বিরোধী এই দলটিকে আর্য নামে অভিহিত করা হয়। এদের বৃহত্তম দলটি পামীর মালভূমি অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। দ্রঃ আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২য় সং, ১৯৯৪), পৃ. ২০-২৪।

১৫৭. দ্রাবিড় এ উপমহাদেশের আরেকটি প্রাচীন জাতির নাম। আজ থেকে প্রায় পাঁচ (৫) হাজার বছর পূর্বে এ দ্রাবিড় জাতি পশ্চিম এশিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় জীবন অতিবাহিতকারী দ্রাবিড়রা স্বভাবতই ভারতের বৃহত্তম নদীগুলোর অববাহিকা ও সমুদ্র উপকূলকে নিজেদের আরাসভূমি হিসেবে বেছে নেয়। তাদেরই একটি দল গঙ্গা মোহনায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলে। দ্রাবিড়রা আর্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে গাঙ্গেয় মোহনা পর্যন্ত তারা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। কৃষিকাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা উপাসনালয় ও গৃহ নির্মাণ করা জানত। মিসর, ব্যবিলন, আসিরিয়া ও ক্রীটের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তারা ছিল সেমেটিক একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের উত্তরসুরী। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২।

১৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

১৫৯. অনেকের মতে ভূ-মধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে আগত প্রোটো অস্ট্রোলয়েডরা বাঙালিদের পূর্বপুরুষ। এ মতের সমর্থনে তারা বাংলা ভাষায় লাঙ্গল, নারিকেল, লাউ, গন্ডা, কুড়ি ইত্যাদি অনার্য অষ্ট্রিক শব্দের উল্লেখ করেন। cf.: Dr. Harunur Rashid, ***Geography of Bangladesh*** (1977), p. 185; উদ্ধৃতঃ *খুলনা জেলা*, পৃ. ২৭৯।

১৬০. ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪।

১৬১. Sir Herbert Risley, ***The people of India***, 1908; উদ্ধৃতঃ খুলনা জেলা, পৃ. ২৭৮।

১৬২. *খুলনা জেলা*, পৃ. ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

অবনমিত হয়। এভাবে বিদেশাগত আর্যেরা আর্মেনীয় এবং আলপাইনদের সাথে মিশ্রিত হয়ে বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়েস্থের সৃষ্টি করে।[১৬৩]

বাংলার অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে যশোরের জনসমাজ সম্ভবত অতীতের আর্য, দ্রাবিড়[১৬৪] ও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মিশ্রণে গঠিত। এছাড়া যশোর জেলায় আরো দুটি সম্প্রদায়ের বাস ছিল তারা হলো: ভগবানীয় সম্প্রদায়[১৬৫] ও কীন্নর[১৬৬] সম্প্রদায়। এসব মানব গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত যশোরের অধিবাসীরা

---

১৬৩. সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণা অনুযায়ী বিচার করলে ভারতীয় বর্ণ বিন্যাস আর্যপূর্ব ও আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্য এই মিলন একদিনে হয়নি। বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম, বিচিত্র মিলন ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এই সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। এ সমন্বয় কাহিনীই এক হিসেবে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির এবং কতক অংশে ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতির ইতিহাস। বাংলাদেশে এই বিরোধ মিলন সমন্বয় সূচনা কিভাবে হয়েছিল তাঁর কিছু কিছু আভাস প্রাচীন আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও আর্য-বৌদ্ধ, জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। দ্রঃ নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২য় সং, আশ্বিন, ১৪০২), পৃ. ২১৬।

১৬৪. দ্রাবিড়ীয়দের আগমন যে, যশোর অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা গ্রীক পন্ডিতদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস যিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তিনি বাংলার অধিবাসীদেরকে গঙ্গারীড়ি বা গঙ্গারীডই নামে উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী বলেন-গঙ্গা মোহনার সব অঞ্চল জুড়ে এ গঙ্গারীডীরা/ রাড়িরা বাস করত। গ্রীক পন্ডিতদের উল্লেখিত এ গঙ্গারীড়িদেরকে বঙ্গ ব-দ্বীপের অধিবাসী বঙ্গ দ্রাবিড় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দ্রঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক, বাংগালীর ইতিকথা, পৃ. ৪০-৪৬; উল্লেখ্য গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় গঙ্গারীডি রাজ্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। আর গঙ্গারীডি রাজ্যের একটি প্রধান নগর ছিল গঙ্গে বা গঙ্গারেজীয়া। পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই গঙ্গারেজীয়াকে যশোর জেলার অন্তর্গত বলে অনুমান করেছেন। দ্রঃ পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, পৃ. ১৪৫; উদ্ধৃত: যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০-৮১; বলা বাহুল্য, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে বাংলার এ দ্রাবিড়দের শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমের কাছে স্বয়ং বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার নতি স্বীকার করেছেন। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের আর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে গঙ্গারিডী। গঙ্গারাড়ীদের অসংখ্য রণতরি ও ৪ হাজার সুসজ্জিত রণহস্তী ছিল। এদের ভয়ে অন্য রাজাগণ তাদেরকে আক্রমণ করতনা। এমনকি সর্বজয়ী আলেকজান্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হয়ে তাদের রণহস্তী ও বীরত্বের কথা শুনে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। দ্রঃ বঙ্কিম চন্দ্রের 'বাঙ্গালার কলংক' প্রবন্ধ, ১২৯১, শ্রাবণ; রজনীকান্ত গুহ কর্তৃক অনূদিত, *মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ*, পৃ. ৭২; উদ্ধৃত: *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০।

১৬৫. ভগবানীয় হিন্দু মুসলমানের মিশ্রণে সৃষ্ট এক অভিনব জাতি। এরা না হিন্দু না মুসলমান। এ উভয় সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি এক উদ্ভট সম্প্রদায়। সম্ভবত এক ভগবান বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন বলে এরা ভগবানীয় নামে পরিচিত। এরা নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায় স্পৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করেনা। যশোর কেশবপুর এলাকায় এদের বাস রয়েছে। তবে বর্তমানে এদের সংখ্যা খুব কম। cf. K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 63; *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৫৬; মুহাম্মদ আবু তালিব, *যশোর জেলায় ইসলাম*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯১), পৃ. ৪; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫।

১৬৬. কীন্নর সম্প্রদায় ভগবানীয়দের মত একটি উদ্ভট সম্প্রদায়। এরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাথে ওঠা-বসা করে। তারা মুসলমান হিসেবে মসজিদে নামায আদায় করে, ঈদ-উল ফিতর এবং ঈদ-উল আযহাতেও যোগদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

শংকর জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও তাদের পূর্ব ধর্মমত, কৃষ্টি, সভ্যতার রীতি-নীতিতে তথা সামগ্রিক জীবন ধারায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে একথা বলা যায়না। যে কারণে পরবর্তী ধর্মমতগুলোতে তাদের পূর্ব রীতি-নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গে ইসলাম আগমনের পূর্বে তিনটি ধর্মমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো: জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু/ ব্রাহ্মণ ধর্ম। এদের মধ্যে জৈন ধর্ম বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করে। প্রাচীন জৈন ধর্ম গ্রন্থে জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর[১৬৭]-এর রাঢ় প্রদেশে আগমনের ঘটনা লিখিত আছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জৈন ধর্ম বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাম্র শাসন হতে জানা যায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বা এর পূর্বে ঐ স্থানে একটি জৈন বিহার ছিল। সপ্তম শতকের চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েংসাং এর বিবরণে দেখা যায় তৎকালে বাংলায় দিগম্বর জৈনের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তারপরই বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়।[১৬৮] খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে জৈন ধর্মগুরু পার্শ্বনাথ নির্বান লাভ করেন। পার্শ্বনাথ পুণ্ড্র ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আগমন করে বহু লোককে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন। পুরাণাদির আলোচনা থেকে জানতে পারা যায় জৈনদের ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে ২৩ জনের সাথে বাঙালির সংশ্রব ঘটেছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় জৈন ধর্ম প্রথমে বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়েছিল।[১৬৯] জৈন ধর্ম প্রচারকদের চেষ্টায়ই বাংলাদেশের মানুষ সুসংঘবদ্ধ ধর্মরীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে জৈন ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত রয়েছে।[১৭০] সঙ্গতই যশোর অঞ্চলে এ ধর্মের প্রচার-প্রসার হয়েছিল কিনা তা জানা যায়না।

এদের একটি শাখা আবার হিন্দুদের মত মৃতদেহ দাহ করার পক্ষপাতি। পেশা হিসেবে এরা নাচ, গান বেশি ভালবাসে। কীন্নর সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান হলেন মধুসুদন কীন্নর। উলুশী অঞ্চলে এদের বাস ছিল। দ্র: *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৪; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫।

১৬৭. মহাবীর (খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭) জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক বর্ধমান মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিয়ে করে ২৮ বছর পর্যন্ত তিনি সংসার ধর্ম পালন করেন। তাঁর এক কন্যা সন্তানও জন্মে কিন্তু ২৮বছর বয়:ক্রমকালে মানবতার দুর্দশা দূরীকরণার্থে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে বনে জঙ্গলে কৃচছতা সাধনে ব্রতী হন। একাধিকক্রমে চৌদ্দ বছর ধ্যান, তপস্যা ও কৃচছতা সাধনের পর তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেন। অত:পর তিনি এই নতুন ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধর্ম প্রচারের পর খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে বিহারে বাওয়াপুরী: নামক স্থানে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল শিক্ষা হচেছ, অহিংসা পরম ধর্ম। দ্র: মুহাম্মদ নুরুল আমিন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪।

১৬৮. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৪৮।

১৬৯. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪-৮৫।

১৭০. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু এর পূর্ব থেকেই এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার চলছিল। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বাংলা বৌদ্ধ ধর্মের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব লাভ করে।[১৭১] বিশেষ করে বাংলায় পালবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে।[১৭২] যশোর অঞ্চলেও এই বৌদ্ধদের আগমন বিস্তৃতি ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর বর্ণনায় বলেন- বুদ্ধদেব স্বয়ং কর্ণ, সুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি অঞ্চলে এসেছিলেন এবং তিনি সমতটের রাজধানীর উপকণ্ঠে যে স্থানে ৭ দিন পর্যন্ত ধর্মমত প্রচার করেন তথায় মগধরাজ অশোকের সময়ে এক স্তুপ নির্মিত হয়। পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এ স্তুপ স্বচক্ষে দেখেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হতেই সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়।[১৭৩] চীন দেশীয় আরেক পরিব্রাজক 'পেংচিচ' সপ্তম শতকের শেষের দিকে লিখেছেন- সমতটের রাজধানীতে চার হাজারেরও বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী ছিল।[১৭৪] এ থেকে অনুমিত হয় যে, সমতট বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও ধর্মানুশীলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। বলা আবশ্যক, যশোর এই সমতটেরই অন্তর্গত ছিল। সুতরাং যশোর অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও ধর্মানুসারীদের যে শক্তিশালী পদচারণা ছিল তা সহজেই বোধগম্য।

সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলায় হিন্দু/ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। এই সেন রাজাদের অধিকাংশই ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী কিন্তু লক্ষণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।[১৭৫] ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সমাজের উপর পূর্ব হতেই প্রভূত্ব স্থাপন করেছিল। সমাজে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। নিম্ন বর্ণের হিন্দু বা শূদ্র এবং বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের শিকার হয়। বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির পথে যায়। এ ধারণা রামাই পন্ডিতের "নিরঞ্জনের রুম্মা" থেকে পাওয়া যায়।[১৭৬] হিন্দু

---

১৭১. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৪৮।

১৭২. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৩৩।

১৭৩. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

১৭৪. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৪৯।

১৭৫. *প্রাগুক্ত*।

১৭৬. নিরঞ্জনের 'রুম্মা'য় বলা হয়েছে-

জাজপুর পুরবাদি, সোল শঅ ঘর বেদি
বেদিলয় কঁনুত্র নগুণ।
দক্ষিণ্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিআ পোড়ায় ভূবন।
মালদহে লাগে কর ন চিনে আপন পর

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বর্ণ ও কুল প্রথা খুব প্রকট ছিল। ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে সেরা বংশ বলে দাবি করত। ফলে হিন্দু ধর্মের মধ্যে নানা শ্রেণীর উদ্ভব হয় এদেরে মধ্যে কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিভিন্ন ভাগ ছিল। সেগুলো হল রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র ও বৈদিক ইত্যাদি।

যশোর জেলায় রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র এবং বৈদিক উভয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুবই কম ছিল। মাগুরার কিছু কিছু এলাকায় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নড়াইলের উজীরপুর, যশোরের বকুলতলা, আউড়িয়া, নহাটা, বাটা জোড়, সরশুনা, পলাশ বাড়ীয়া, কুমড়াদাহ, আবাইপুর প্রভৃতি স্থানে বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল।[১৭৭] রাঢ়ীয় কুলীনদের প্রাচীন স্থান যশোর।[১৭৮] লক্ষীপাশার কুলীন রামানন্দ চক্রবর্তী বাকেরগঞ্জের কালিয়ার নিকটবর্তী সারমংগল থেকে কুল রক্ষার্থে চলে আসেন। লক্ষীপাশার তিন মাইল দূরে ধুপাদাহে তার কন্যাকে বিবাহ দেন। তিনি এবং তার নয় পুত্র সেখানে বসতি স্থাপন করেন।[১৭৯] এভাবে সে সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত লক্ষীপাশার কুলীনরা রামানন্দের বংশধর বলে দাবি করে।

ব্রাহ্মণদের পরেই আমাদের আলোচিত স্থানের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ হল কায়স্থ। আদি সুরের অনেক পূর্ব থেকে তারা গৌড়ে বসবাস করছিল।[১৮০] কায়স্থরা নিজেদেরকে শূদ্র হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচবোধ করত। কারণ এদেশে তাদের আদি বংশধর শূদ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এতে অনুমিত হয় যে, এ ভূ-খন্ডে

জালের নহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইয়া বড় দশবিশ হৈয়্যা জড়
সদ্ধর্মীরে করত্র বিনাশ।
বেদে করি উচ্চারণ বেরাস অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহরণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেত পাইআ মর্ম
মায়াত হইল অন্ধকার।

দ্র: ড: মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙলা সাহিত্য*, পৃ. ১৭; উদ্ধৃত: *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৩৫-৩৬।

১৭৭. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০২-৩।

১৭৮. *প্রাগুক্ত*।

১৭৯. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 220.

১৮০. এন. এন. বসু, *বিশ্বকোষ*, ১৮শ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস, তা.বি.), পৃ. ৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তারা কখনও ক্ষত্রিয় আবার কখনও কায়স্থ হিসেবে পরিচয় দিত। যশোরের কায়স্থরা বরেন্দ্র, উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় এবং বংগজ- এ চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।[১৮১] সেনদের শাসনামলে যশোরের উত্তরাংশে শৈলকুপায় বরেন্দ্র কায়স্থদের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮২] এদের মধ্যে ছিল দাস, নন্দী, চাকী, সিদ্ধ, দত্ত, দেব ও নাগ। রাজা বসন্তরায়ের প্রচেষ্টায় যশোরে বংগজ কায়স্থদের প্রাচীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানের ইতনা ও সূর্যকুন্ডে বংগজদের বসতি লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ছিল।[১৮৩] বল্লাল সেনের শাসনামলে রাঢ়ের দক্ষিণে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণকূলের অধিবাসীদেরকে রাঢ়ীয় সমাজ বলা হত। এরা রাঢ়ের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে গংগা পার হয়ে যশোরে এসে বসতি স্থাপন করে ।[১৮৪] এছাড়াও সদর মহকুমার জংগলবান্দ এবং নড়াইলের বাগুটিয়া কুলীন কায়স্থদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।[১৮৫]

হিন্দু সমাজের অন্যতম বর্ণ হচেছ বৈশ্য। কবি কঙ্কন চন্ডী তাদেরকে কৃষক এবং ব্যবসায়ী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কৃষক হিসেবে পরিচিত বৈশ্য শ্রেণী নিজেদেরকে গরু চরানো ও ভূমি কর্ষণে ব্যস্ত রাখত। ব্যবসায়ী শ্রেণী মৌসুমের সময় ফসল ক্রয় করে রাখত এবং বাজার বৃদ্ধি পেলে তা বিক্রি করত।[১৮৬] পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর চীনা দূতের বিবরণেও এ সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যশোরের উত্তরাংশ বৈশ্যদের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের নিকটবর্তী সাঁকোর বণিক শ্রেণীর সম্পদের এবং প্রতিপত্তির কথা কবি কঙ্কনের চন্ডী কাব্যে উল্লেখ রয়েছে। এদের বাণিজ্যতরি ভারতের বাইরেও যেত।[১৮৭] যেখানে বন্দর বা ব্যবসায়ের কেন্দ্র সেখানেই এদের বাস। পরবর্তীতে বৈশ্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে যশোরের সংামাজিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

---

১৮১. *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১৪।

১৮২. *প্রাগুক্ত*।

১৮৩. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮১৫।

১৮৪. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮১৭।

১৮৫. L. S. S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 56.

১৮৬. A. K. M. Yaqub Ali, ***Aspects of Society and culture of the Barind 1200-1576*** A.D. (Unpublished Ph.D. Thesis, University of Rajshahi, 1981), p. 256.

১৮৭. *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বংগীয় সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈশ্য এ তিনবর্ণের নিচে ছিল শূদ্রদের[১৮৮] স্থান। তারা সমাজের কৃষক বা শ্রমিক ছিল। এরা পেশার উপর ভিত্তি করে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শূদ্রদের একটি শ্রেণী জমি চাষ ও মৎস শিকার করত।[১৮৯] এগুলো ছাড়াও তারা তাঁতি, নাপিত, কামার, মিস্ত্রি, কর্মকার, ধোপা ও অন্যান্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো সমাজের নিচু পেশা হিসেবে বিবেচিত হত। তারা গ্রাম বা শহরের এক কোণে চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে বাস করত।

---

১৮৮. The Namasudras, or as they were formerly called, the chandals, are the most numerous caste in the district. They are one of the most interesting castes in Jessore owing to their independence and self-reliance and their efforts to rise in the social scale. By occupation they are chiefly agriculturists. Education in gradually spreading among them. cf.: L. S. S. O'Malley, *op. cit.*, p. 50-51; K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 63.

১৮৯. M. A. Rahim, ***Social and cultural History of Bengal***, (Karachi: Pakistan Publication House, 1967), Vol-1, p. 347.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

জ্ঞানার্জন মানুষের আদি প্রবৃত্তি। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা এবং অজয়কে জয় করা মানুষের সহজাত গুণ। আর শিক্ষা[১৯০] হল এর একমাত্র হাতিয়ার। আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত শিক্ষার নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ সুসভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিক্ষা ব্যতীত জাতি হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ফলে সমাজের সাথে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর কোন সমাজের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই হচেছ ঐ সমাজের সংস্কৃতি। সুতরাং "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার শীর্ষক সন্দর্ভ আলোচনার্থে জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

শিক্ষা ঃ

প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এ পদ্ধতি জনগণের চাহিদা পূরণ করত। কিন্তু মধ্য যুগে মুসলমানরা বাংলা বিজয়ের পর তারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য এদেশে নিয়ে আসেন।[১৯১] তাদের (মুসলমানদের) শিক্ষা ব্যবস্থা জাতি ধর্ম, বর্ণ,

---

১৯০. শিক্ষা সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ শাসন করা, উপদেশ বা নির্দেশ দেওয়া। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ "Education" ল্যাটিন "Educere" শব্দ থেকে এসেছে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় "e" অর্থ ভিতর হতে এবং duca অর্থ বাইরে আনা। এককথায় ভিতর হতে বাইরে আনা। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত গুণগুলোকে বাইরে আনা। দ্রঃ নীলীমা ঘোষ ও সন্তোষ কুমার কুন্ড, শিক্ষা, ১ম ভাগ (কলকাতাঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ৩; শিক্ষার আরবী প্রতিশব্দ "علم" এর শাব্দিক অর্থ জানা, জ্ঞান আহরণ করা ইত্যাদি। বাংলা বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, শিক্ষা হচেছ মানুষের সহজাত বর্ধনশীল সম্ভাবনার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন। যে সকল অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমশ পরিপক্ক হতে পারে সে সকল শক্তি বাঞ্চিত রূপদানের জন্য পরিকল্পিত যে কোন প্রক্রিয়াকে বুঝায়। দ্রঃ খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পাদিত) *বাংলা বিশ্বকোষ*, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬), পৃ. ৪৫৮; Dictionary of Education গ্রন্থে শিক্ষাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে- "শিক্ষা হচেছ সে সকল পদ্ধতি যার দ্বারা কোন ব্যক্তির সামর্থ উদ্দেশ্য এবং সে যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের অন্যান্য বাস্তব আচরণ উন্নত করা এবং সামাজিক পদ্ধতি যার দ্বারা মানুষের পরিবেশ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।" দ্রঃ Carter V. Good (ed.), ***Dictionary of Education*** (New York: Megraw-Hill Book Company Inc, 1945); সুতরাং শিক্ষা হচেছ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফল, যা কোন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চিন্তা শক্তি, মনযোগ, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, আচার-আচরণ, আদর্শ এবং জাতি সত্ত্বার গুণাগুণের পরিবর্তন প্রভৃতির বিকাশ হয়।

১৯১. অন্যান্য দেশের মুসলমানদের ন্যায় এ উপমহাদেশের মুসলমানগণও তাদের খিলাফত আমলের খ্যাতনামা পূর্ব পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। যেখানেই তারা গিয়েছে সেখানেই মুসলমানগণ তাদের সামাজিক বিধি-বিধান সমূহ সঙ্গে বহন করে নিয়ে গেছে। এভাবে এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ খুলাফায়ে রাশেদূনের ঐতিহ্য ও শিক্ষা পদ্ধতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। এন. এন. ল. বলেন- "মুসলমানদের ভারত আক্রমণ কেবলমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ গ্রহণ করার সুযোগ পায়।[১৯২] কারণ ইসলামে শিক্ষার উপর যে গুরুত্বারোপ[১৯৩] করেছে তা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এদেশের প্রচলিত শিক্ষা অচল হয়ে পড়ে এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় সনাতনী পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলতো টোল,[১৯৪] মক্তব, খানকাহ,[১৯৫] পাঠশালা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তৎকালে টোল দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এ সকল

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। দ্রঃ এন. এন. ল. প্রোমোশন অব লার্নিং ডিউরিং মোহামেডান রুল, পৃ. ১৯; উদ্ধৃত: মোহম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭), মূল: ড: এম. এ. রহিম. ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ২২৩।

[১৯২]. এ উপমহাদেশে মুসলমানগণ সার্বজনীনতা ও উদারতার আদর্শের প্রবর্তন করে। তারা সকল মানুষের নিকট এমনকি ব্রাহ্মণদের উপেক্ষিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের নিকটও শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এ ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারকে একটি পবিত্র কাজ ও আল্লাহর প্রতি অনুরাগের নিদর্শন বলে বিবেচনা করত। সুতরাং মুসলমান শাসনকর্তা, রাজকর্মচারী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা নিজেরা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং মাদরাসা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা জ্ঞানের উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দ্রঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৪।

[১৯৩]. ইসলামে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর নিকট প্রথম যে ওহী আসে তাতে বলা হয় "اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ" পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরাঃ 'আলাক, আঃ ১; তিনি একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার উপাদান হিসেবে শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন। তাঁকে একজন শিক্ষক হিসেবে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলামে একে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ হিসেবে নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী (সঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন- "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مسلم و مسلمةٍ" দ্রঃ *মিশকাতুল মাসাবীহ;* ইবনে মাজাহ, সুনান (করাচীঃ নূর মোহাম্মদ লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ২০; মহানবী (সঃ) এর সময়ে আল্লাহর একত্ববাদকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের বিকাশ লাভ করে এবং বিশ্বাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও অবশ্য পালনীয় সকল কার্যাবলি যা সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট তা শরীয়িতে তুলে ধরা হয়েছে। cf.: A. K. M. Yaquib Ali, ***op. cit.***, p. 289; এতে অনুমিত হয় যে, ইসলাম ধর্মে শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণের জন্য যেভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অন্য কোন ধর্মে সেরূপ করা হয়নি।

[১৯৪]. টোল একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একে চৌপাটী বা চৌবাড়ীও বলা হত, যা চতু:স্পাঠী শব্দ থেকে আগত। কোন সময়ে টোল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়না। প্রধানত: চতু:স্পাঠীতে চার বেদ পড়ানো হত। টোলে ছাত্রদেরকে কেবলমাত্র বিনা বেতনে সাংস্কৃতিক শিক্ষা দেওয়াই হতনা বরং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণত আবাসিক এলাকা গ্রামে বা শহরের বাইরে টোল প্রতিষ্ঠিত হত। এটি সাধারণত: মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাদযুক্ত এক বা একাধিক লম্বা ঘর নিয়ে গঠিত হত। প্রত্যেক ঘর বিভিন্ন কামরায় বিভক্ত ছিল এবং মাঝখানের দেয়াল ছাদ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত এবং উচচ পর্যায়ের ছাত্ররা একের অধিক বিষয়ের অধ্যয়ন করত। অধিত বিষয়গুলো ছিল- হিন্দু আইন ও ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিতর্ক, ছন্দ এবং চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি। যশোর জেলায় ২০টি টোল ছিল। ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে এ সকল টোলে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭২ জন।[১৯৬]

মক্তব ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান। এজন্য মক্তবগুলো মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হত। এখানে সাধারণত কুরআন এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হত। কেননা ইসলামে কুরআন শিক্ষাকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[১৯৭] ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলা বোর্ড ২০৮টি মক্তব পরিচালনা করত।[১৯৮]

পাঠশালা ছিল মধ্যযুগে বাংলার প্রাথমিক, দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং হিন্দু ছেলেরাই এখানে বেশি অধ্যয়ন করত।[১৯৯] এ প্রতিষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত

ছিলনা। টোলের কার্যক্রম সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলত। কোন কোন সময় সন্ধ্যায় আবার শুরু হত। ৯-৩০ বছর বয়সের ছাত্ররা এ টোলে পড়াশুনা করত। cf.: Mahamahopadhay Mahes Chandra Nyayaranta, ***Report on the Tols of Bengal, Bihar and Orissa*** (Calcutta: Bengal Secretatiate Press, 1892), p. 11 Fn; ***ভারত কোষ*** (কলিকাতা: বংগীয় সাহিত্য পরিষদ, তা. বি.), পৃ. ৬২০।

১৯৫. খানকাহ হচেছ প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের আধুনিক রূপ এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধ পুরোহিতরা তাদের পবিত্র পালি ভাষায় শিক্ষা দিত। একমাত্র বৌদ্ধ ছাত্ররা এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেত। cf.: Government of Bengal, ***Report on the public Instruction of Bengal, 1886-87*** (Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot. 1914), p. 110.

১৯৬. ***Ibid***.

১৯৭. হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "عن عثمان بن عفان (رضي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيرُكُمْ مَـنْ تَعلَّـمَ الْقُرأنَ وَ عَلَّمَـه" দ্র: অধ্যাপক মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত সহীহ আল-বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, *কিতাবু ফাযায়েলে কুরআন*, (আধুনিক প্রকাশনী, জুন ২০০১), পৃ. ৬৪৯।

১৯৮. M. M. Siddiquee, ***op. cit***., p. 243.

১৯৯. আব্দুল মমিন চৌধুরী অনূদিত *'পাঠশালা থেকে স্কুল'* মূল: কাজী শহীদুল্লাহ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. মুখবন্ধ, ৯/১০।

থাকলেও এর শিক্ষা ব্যবস্থা মান সম্মত ছিলনা।[২০০] ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে যশোরে ১৬৯টি পাঠশালা ছিল এবং অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩১৬৯ জন।[২০১]

প্রাচীনকাল থেকে সনাতন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যশোরের জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ এবং মিশনারিদের আগমনের সমাজে নতুন ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে সনাতন শিক্ষা পদ্ধতির স্থলে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির বিকাশ লাভ করতে থাকে। এ পট পরিক্রমায় যশোর জেলার শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে W.W. Hunter এর বর্ণনা থেকে যশোর জেলায় দ্রুত শিক্ষার উন্নয়নের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে যশোর জেলায় দ্রুত শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছিল। তিনি আরো উল্লেখ করেন- এসময়ে যশোরে শিক্ষার অবস্থা অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভাল ছিল।[২০২]

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে (পাঠশালা এবং মক্তব নিয়ে) প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচচ প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দেশীয় বিদ্যালয় গঠন করা হয়। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাইমারি এলিমেন্টারি এবং প্রিপারেটরি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।[২০৩] এক জরিপে দেখা গেছে ১৮৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলায় নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৬৮ ও ১২৮টি। আর ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২,৮৮৯ জন এবং ৪,৬৩৮ জন। ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে জেলায় নিম্ন প্রাথমিক ও উচচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৪৬৬ ও ১৪৩টি এবং এ সময় ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩,৭৭২ জন ও ৬,৭৬৭ জনে।[২০৪]

অপর এক জরিপে দেখা গেছে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে জেলায় নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১.২১%, আর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এই অনুপাত ছিল ০.৩৯%। অবশ্য এ সময় বেশ কিছু কারণে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল।[২০৫] এভাবে যশোর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ হয়েছিল।

---

২০০. ***Report on the Public Instruction of Bengal, 1886-87***, p. 110.

২০১. শ্রী ননী গোপাল ঘোষ, *যশোর জেলার শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস*, মাসিক বসুমতি, সংখ্যা, ১৭, বৈশাখ ১৩৪৪ বাং, পৃ. ৭৬।

২০২. W. W. Hunter, ***op. cit.***, p. 313.

২০৩. Even E Biss, ***Report on the Expansion and Improvement of primary Education in Bengal*** (Calcutta: Bangal Secretariate Book Depot, 1902), p. 47.

২০৪. ***Bengal District Gazetteers*** B. Vol, Jessore District (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1903 and 1923), উদ্ধৃত: মোঃ আমিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩-৪।

২০৫. M. M. Siddiquee, ***op. cit.***, pp. 104-5.

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। কারণ রক্ষণশীল সমাজে বালকদের বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার স্বীকৃতি ছিলনা, ফলে ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে যশোরে প্রথম দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি খাজুরাতে অপরটি বালুরিয়াতে।[২০৬] ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ৭টি সরকারি অনুদান প্রাপ্ত এবং ২টি অনুদান ব্যতীত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯।[২০৭] ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে এ সংখ্যা ছিল ২১৬টি।[২০৮] এ সময় মেয়েদেরকে বালকদের বিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমোদন দেয়া হয়।

বাংলায় ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি এবং দেশীয় এই দুই ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল।[২০৯] পরে এগুলোকে আবার উচচ ইংরেজি, মধ্য ইংরেজি এবং মধ্য ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়ে বিভক্ত করা হয়। ভার্ণাকুলার বিদ্যালয় ছাড়া সর্বত্রই একই পাঠ্যক্রম ছিল।[২১০] ১৮৩২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলায় উচচ ইংরেজি ও মধ্য ইংরেজি এবং ভার্ণাকুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১ ও ৩১ এবং ৪২টি। আর এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৯৮, ২২৭৩ ও ২৩০৩ জন। ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট অনুযায়ী এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে- ৩৭, ৪৫ এবং ৮টি। আর এসব প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৯১৯, ৩২৪১ এবং ৩৭৩ জনে।[২১১] এ রিপোর্টে দেখা যায়

---

২০৬. শ্রী ননী গোপাল ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪।

২০৭. *প্রাগুক্ত*. এর মধ্যে ১৪টি ছিল সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত এবং ৫টি অনুদান ছাড়াই চলত। দ্রঃ প্রাগুক্ত।

২০৮. L. S. S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 137; এর মধ্যে ৮টি ছিল উচচ প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হত। ১৮৩টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুদান প্রাপ্ত ছিল এবং ২৫টি সরকারি অনুদান ছাড়াই চলত। cf.: ***Ibid.***

২০৯. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: সরকারি বিদ্যালয়, জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়, সরকারি তহবিল থেকে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং সরকারি সাহায্য বিহীন বিদ্যালয়। শেষোক্ত বিদ্যালয়কে আবার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং অস্বীকৃতি প্রাপ্ত বিদ্যালয় এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। cf.: ***Government of Bengal, Education of Bengal*** (Alipore: Bengal Government Press, 1934), p. 3.

২১০. ***Report on the Public Instruction of Bengal***, 1912-13,...... (1914), p. 8; মক্তবে সাধারণত: ভার্ণাকুলার স্কীমে শিক্ষা দেয়া হত। এছাড়া ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হতনা। cf.: ***List of School of presidency Division*** (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1922), p. 40-46.

২১১. ***Bengal District Gazetteers***, B. Volume, op. cit.; উদ্ধৃত: মোঃ আমিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণ অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য ইংরেজি শিক্ষা লাভের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং সরকারের অবহেলার কারণে ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল।[২১২]

মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যশোরে কোন বিদ্যালয় ছিলনা।[২১৩] মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও মুসলমান সমাজে এর অনুমোদন ছিলনা। ১৯০১-১১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫ জন ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছিল।[২১৪] এতে অনুমিত হয় যে, যশোরে নারী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে ছিল এবং মাধ্যমিক ও উচচ পর্যায়ে শিক্ষার অবস্থা আশা ব্যঞ্জক ছিলনা।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরেই উচচ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় যশোরে উচচ শিক্ষার বিকাশ হয়েছিল। বাংলায় উচচ শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজকে অনুমোদন দান করত।[২১৫] বিশ্ববিদ্যালয় তিন ধরনের কলেজকে উচচ শিক্ষাদানের স্বীকৃতি দিত।[২১৬] যশোরে উচচ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত মাত্র ১টি প্রতিষ্ঠান ছিল এর নাম ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল।[২১৭] এটি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে এটিকে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে নামকরণ করা হয়।[২১৮]

---

২১২. ***Report on the Public Instruction in Bengal***, 1898-99, p. 61.

২১৩. ***List of School of presidency Division***, 1922, pp. 40-47.

২১৪. L. S. S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 137.

২১৫. ***Higher Education in Bengal*** (Alipore: Bengal Secretariate Press, 1934), p. 1.

২১৬. এ কলেজগুলো হল: সরকারি কলেজ, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ এবং সাহায্য বিহীন কলেজ। যে সকল কলেজ সরকারি নয় সে সকল কলেজ কোন সরকারি অনুদান পেতনা। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরী, ব্যায়ামাগার এবং আবাসিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি উন্নয়নের জন্য অনুদান দেওয়ার প্রথা ছিল। cf. ***Ibid***, p.3.

২১৭. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জমিদার বাবু রাম রতন রায় প্রথমে উচচ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইংল্যান্ডের রাণীর সুদৃষ্টির প্রত্যাশায় এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল'। cf.: ***Calcutta University Calendar, 1886***, p. 260; ***নড়াইল জেলার ইতিহাস***, পৃ. ২৫.

২১৮. ১৮৮৬ সালের ২৫শে এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় গ্রেড কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এ কলেজের নামকরণ করা হয় নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ। এই অনুমোদনের মেমো নং-১৬২। cf.: ***Ibid***, p. 274.

Dhaka University Institutional Repository

পরে কলেজটিকে প্রথম গ্রেডে উন্নীত করা হয় তবে এটিকে আবারো ২য় গ্রেডে নামিয়ে আনা হয়।[২১৯] এ কলেজে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত কোন ছাত্রী পড়া লেখা করত না। কিন্তু চল্লিশের দশক হতে ছাত্রীরা ভর্তি হয় তবে সংখ্যায় ছিল কম। ১৮৮৮-৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দশকে এবং ১৯১৬-২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দশকে মুসলমান ছাত্রদের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ২.৩৫% এবং ৪.০১%। হিন্দু ছাত্রদের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৯৭.৩৫% এবং ৯৫.৯৯%।[২২০] এ থেকে অনুমিত হয় যে, যশোরে উচচ শিক্ষা উচচ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। কিন্তু বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও যশোরে কারিগরি শিক্ষার বিকাশ হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জমিদার বাবু কিরণ চন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নড়াইল একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম বৎসর এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি হয়েছিল ১১০ জন এবং তাদেরকে ছুতারের কাজ, সেলাই এবং অন্যান্য স্থানীয় শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হত।[২২১] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দক্ষ পরিচালনার অভাবে এ প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[২২২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, যশোরে উচচ শিক্ষার যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল এবং আধুনিক কারিগরি শিক্ষা জন সাধারণকে বেশ আকৃষ্ট করেছিল।

---

২১৯. ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিলের গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদনক্রমে কলেজটিকে প্রথম গ্রেডে উন্নীত করা হয়। cf.: Ibid: কিন্তু ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে এ কলেজকে পুনরায় দ্বিতীয় গ্রেড কলেজ করা হয় এবং ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীর পরিদর্শন রিপোর্টে এবং অন্য রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, আমরা দুঃখিত যে, এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা এবং অন্যান্য কারণে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের অনুকূলে সুপারিশ করতে অক্ষম। cf.: Printed proceedings (Education), (National Archives of Bangladesh, Fill no, 1-6-54, Srial no, 1-3, February, 1923), p. 1; এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দের অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়। cf.: *Ibid.*

২২০. M. M. Siddiquee, *op. cit.*, p. 230.

২২১. Printed Proceedings (General) (NAB, Vol-288, October, 1887), p. 415.

২২২. *Ibid.*, (NAB, Vol- 377, May, 1900), p. 554.

সাংস্কৃতিক অবস্থা ঃ

একটি জাতির জীবন চর্চাই সংস্কৃতি।[২২৩] জীবন কর্মে লালিত ঐতিহ্য তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক বিকাশ মনন ও উৎকর্ষ জীবিকা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। আর জীবিকা পদ্ধতি গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে। এই পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত জীবিকা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রয়োজন মত সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণের নিয়ম পার্থিব ও অপার্থিব চিন্তা-চেতনার জন্ম দিয়েছে। সমস্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে চিরকালীন অবহেলিত মানবগোষ্ঠীর নিরন্তর নিথর জীবনের ছাপ। এরা এই গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। একে বলা যায় নিথর সংস্কৃতি। চিরকালের ধর্মভিত্তিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশিক উত্তরাধিকার। এরাই নৈরাশ্যের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে গ্রাম্য লোক দেবতা, উৎসব-পার্বণ, মন্দিরে এবং পীরের দরগায় মানত করার প্রথা। সুতরাং যশোরে ইসলাম প্রচার-প্রসারের বিষয়টি আলোচনার পূর্বে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যশোর জেলার ঐতিহ্য অতীব উজ্জ্বল। নিম্নে এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল:

পোশাক ঃ

প্রাচীনকাল থেকে যশোর অঞ্চলের মুসলমান পুরুষরা লুঙ্গি, গেঞ্জি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, টুপি ব্যবহার করত। হিন্দু পুরুষেরা ধুতি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি ব্যবহার করত। শহরের মানুষ জুতা পরত। কিন্তু গ্রাম্য দরিদ্র জনসাধারণ খালিপায়ে চলাফেরা করত। সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরা শাড়ি পরত। তবে শাড়ির সাথে ব্লাউজের ব্যবহার গ্রামীণ মেয়েদের মধ্যে ছিলনা বললেই চলে।[২২৪] অভিজাত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের

---

২২৩. সংস্কৃতি কৃষ্টি, আরবী তাহযীব (تهذيب) ও ইংরেজি Culture শব্দেরই প্রতিশব্দ। ইংরেজি Culture শব্দ জার্মান Kuture শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শিষ্টাচার, সভ্যতা ও অনুশীলন। দ্র: শাহেদ আলী (সম্পা:) ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা (সিলেট: সোশ্যাল অপলিফটমেন্ট কমিটি, ১৯৬৭), পৃ. ৪৭; সংস্কৃতি হচেছ মানুষের জীবন বিকাশ ও আচরণের এক পরিশীলিত ও রুচি সম্মত পদ্ধতি, আর সেক্ষেত্রে মানুষের ধ্যাণ-ধারণাগত ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার যা মানুষকে সামাজিক জীবনে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। বস্তুত কোন সমাজের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই হচেছ সমাজের সংস্কৃত। দ্র: অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, *প্রসংগ সমাজতত্ব* (ঢাকা: সেন্ট্রাল বুক পাবলিশিং, ১৯৮৭), পৃ. ২১৫-১৬।

২২৪. K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 67.

Dhaka University Institutional Repository

মহিলারা ঘরের বাইরে গেলে পর্দা প্রথা[২২৫] মেনে বোরকা পরত।[২২৬] এ ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েদের পর্দার বালাই ছিলনা।[২২৭] বিংশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত অভিজাত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ধুতি ব্যবহারের প্রচলন ছিল।[২২৮] অবশ্য সভ্যতা ও অবস্থা বিকাশের সাথে সাথে পোষাক-পরিচেছদেরও পরিবর্তন হয়।

অলংকার ঃ

অলংকার ব্যবহারের প্রচলন এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব হতেই ছিল। এ সকল অলংকারের মধ্যে হার, কানের দুল, নাকের ফুল, ব্রেসলেট এবং চুড়ি ইত্যাদি ছিল প্রধান। এই অলংকার সোনা অথবা রূপা দ্বারা নির্মিত। স্বর্ণের মূল্য বেশি হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের মহিলারা রৌপ্য নির্মিত অলংকার বেশি ব্যবহার করত।[২২৯] এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অলংকারের বহু প্রকার ছিল। যেমন হার, গোট হার, বিছাহার, বাজুবন্দ, ঝুলী, কোমরে কোমরবন্দ ও হাসুলি, পায়ে মল ইত্যাদি। সোনা-রূপা দুস্প্রাপ্য হওয়ায় নকল ধাতুর কাচ ও প্লাস্টিকের অলংকারের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। গ্রাম্য দরিদ্র রমনীরা এ অলংকার বেশি ব্যবহার করত। শরীর ও মুখমন্ডল অলংকৃত করার পাশাপাশি তৎকালের মেয়েরা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাজল পরত। এছাড়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুরমা ব্যবহারের ইতিহাস পাওয়া যায়। হিন্দু সধবা রমণীরা হাতে শাখা ও সিথিতে সিঁদুর ও কপালে সুন্দর টিপ পরত।[২৩০]

---

[২২৫]. পর্দা প্রথা নারীদের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান। ইসলামে বয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রে পর্দাকে ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- و كُلُ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ..... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরাঃ নূর, আঃ ৩১।

[২২৬]. Contrary to common belief Muslim Women in villages do not remain behind the pardah, They move about in their village freely but do not speak to or come in the presence of strangers and non-related persons. Middle class Muslim women observe pardah, Some use burqa when coming out of home. But the practice is dying out. In Villages women seldom use burqa, cf.: K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, pp. 66-67.

[২২৭]. হিন্দু বা অন্য সমাজে কোন কালেও পর্দা প্রথা ছিলনা। তবে পোশাক পরিচেছদ শালীনতা তৎকালে সকল সমাজে ছিল। এসব সমাজে বয়স্ক মহিলারা মাথায় কাপড় ফেলে গুরুজন বিশেষ করে শ্বশুর-ভাসুর ইত্যাদির সামনে যেতে দ্বিধা করত। দ্রঃ *খুলনা জেলা*, পৃ. ৩২১।

[২২৮]. মুসলমানদের পরাজয়ের পর হিন্দুদের কৃষ্টি সমৃদ্ধ সমাজে মুসলমানরাও ধীরে ধীরে হিন্দু সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছিল। ধুতি পরা যাা একটি অংশ বিশেষ।

[২২৯]. K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 63.

[২৩০]. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ: সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬৫-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসব অনুষ্ঠান ঃ

ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও যশোর জেলার মানুষের মধ্যে নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠান চলে আসছে। এ সকল উৎসবের মধ্যে কোন কোনটা ধর্ম নিরপেক্ষভাবে পালিত হত হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে শরতের সারদীয় দূর্গাপুজা, কালীপুজা, শরস্বতীপুজা, রথ পুজা কার্তিক পুজা, দোলপুজা উল্লেখযোগ্য।[২৩১] আর মুসলমানদের মধ্যে 'ঈদুল ফিতর, 'ঈদুল আযহা, শব-ই বরাত, মহররম বিভিন্ন মিলাদ শরীফ ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব উল্লেখযোগ্য।[২৩২] এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে মেলা বসত। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক এ সকল মেলায় যেত। যশোরের কেশবপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে "ত্রিমোহিনীতে"[২৩৩] প্রতি বৎসর মার্চ মাসে স্নান উৎসবে মেলা বসত। এ মেলা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।[২৩৪] এছাড়া বলরামপুর,[২৩৫] বোদখানা[২৩৬] এবং ঝিনাইদহের মহেশ্বরকুন্ডুতে মেলা বসত।[২৩৭]এসব উৎসব ও মেলাতে যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ ইত্যাদি ছিল মানুষের কাছে বিনোদনের একটি মাধ্যম।

যাত্রা [২৩৮] যশোরের একটি প্রাচীন শিল্প মাধ্যম। তৎকালে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। জেলার সর্বত্রই শীতকালে যাত্রার ধুমপড়ে যেত। এছাড়া বিভিন্ন উৎসব, মেলা ও পার্বণে যাত্রা দল আসত।[২৩৯]

---

২৩১. K. G. M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 63; L. S. S. O'Malley, ***op. cit.***, p. 175.

২৩২. K. G. M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 60.

২৩৩. Trimohini is in the sadar Sub-division; The name signifies the meeting place of three rivers a spot always held sacred by the Hindus, The Fair is held in the middle of March, and lasts three days, There is a tank in the village, sacred to kali the water of which is reputed to have miraculous healing properties, cf.: K. G. M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 68.

২৩৪. Ibid; L. S. S. O'Malley, ***op. cit.***, pp. 175-76.

২৩৫. Balarampur is in the sadar sub-division, and a fair is also held here in march and lasts rhree days, cf. ***Ibid.***

২৩৬. Boddkhana is also in sadar sub-division, and a fair in held here during Dol Jatra Festival of the Hindus, cf. ***Ibid.***

২৩৭. ***Ibid.***

২৩৮. যাত্রা অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয় সমৃদ্ধ একটি শিল্প মাধ্যম। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শিল্প বিকশিত হয়েছে। প্রথমে যাত্রার কোন কাহিনী বা অভিনয় ছিলনা। তখন যাত্রা বলতে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বুঝাত। অবশ্য পরে কাহিনী ও অভিনয় সংযুক্ত হলে যাত্রার নতুন নামকরণ করা হয় গীতাভিনয়। প্রথম দিকে এটি ছিল ধর্মীয় অনুভূতি সমৃদ্ধ। পরে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সামাজিক সচেতনতার সাথে সাথে যাত্রারও পালা বদল ঘটে। ফলে যাত্রার দেব-দেবীর মহত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে এসেছে মানব বন্দনা। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায়, করণীয়

অস্থায়ী মঞ্চে শামিয়ানার নিচে এসব যাত্রাপালা অভিনিত হত। [২৪০] লোকজন দলে দলে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করত। বিশেষ করে জনসাধারণের জমিতে বীজ বপন এবং ফসল কাটার পর অবসর সময়ে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই যাত্রা শিল্প।

সংগীতাঙ্গণে যশোরের ভূমিকা কৃতিত্বের দাবিদার। এ জেলায় অনেক সংগীতের উৎপত্তি ও চর্চা হয়েছে, যা বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে অধিক পরিপুষ্ট করেছে। এ অঞ্চলে বারাশে[২৪১] সংগীত ও মতুয়া[২৪২] সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া যশোরে কবিয়াল, বাউল,[২৪৩] বয়াতী কীর্তনীয়ারাও জন্ম গ্রহণ করেন। লোকগীতির অঙ্গণে তাই যশোরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালে যশোরে বাউল, জারী, ধুয়ো কীর্তন, ভাবগান, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদী, মারফতী, সারিগীতি, ভাটিয়ালি, কবিগান ইত্যাদি গানের জনপ্রিয়তা ছিল।[২৪৪] বাউল গানের প্রবর্তক লালনশাহ[২৪৫] এই যশোরের সন্তান। এছাড়া কীর্তনীয়া মধুসুদন কিন্নর[২৪৬]

ইত্যাদি যাত্রায় প্রতিফলিত হত। জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা শিল্পের চরম বিকাশ ঘটেছিল। যা এখন পর্যন্ত বিদ্যমন আছে। দ্রঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১।

২৩৯. K. G. M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 68.

২৪০. ***খুলনা জেলা,*** পৃ. ৩৩১।

২৪১. যশোর জেলার মুহম্মদপুর ও লোহাগড়া থানার উত্তর-দক্ষিণে ২৫ মাইল প্রলম্বিত বারাসিয়া নামে মধুমতি নদীর একটি উপনদী আছে। এ নদীর নামানুসারে অত্র অঞ্চলে বারাশে সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। বারাশে সংগীত মূলত বর্ষা সংগীত। এ সংগীতের বিষয়বস্তু প্রেম। দ্রঃ হাবিবুর রহমান, ***বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগলিক পরিবেশ*** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২), পৃ. ১১৯ ও ১৩৫; যশোর খুলনা অঞ্চলে এ সংগীতের যেরূপ প্রচলন আছে তা অনেকটা অশ্লীল। কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ। দ্রঃ আব্দুল হাফিজ, ***লৌকিক সংস্কার ও বাংলাদেশ*** (ঢাকা: মুক্তাধারা ১৯৭৮), পৃ. ১৪০-৪১।

২৪২. মতুয়া এক ধরনের প্রতিবাদী সংগীত। যশোর অঞ্চলে এ সংগীতের প্রভাব বিদ্যমান। এ সংগীত শোষণমূলক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করত। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের প্রতিবাদের ভাষা ছিল এ সংগীত। এ কারণে দক্ষিণ বঙ্গে সমাজ বিকাশের গতিধারার বিশ্লেষণে এ সংগীতের মূল্য অপরিসীম। দ্রঃ এস. এম. লুৎফর রহমান, ***বাউল মতবাদের সেকাল একাল,*** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সপ্তদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯০ বাং, পৃ. ১৩১।

২৪৩. তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে এ অঞ্চলে বাউল গানের সৃষ্টি হয়। সামন্ত সমাজের উৎপীড়নে যারা অতিষ্ঠ হয়েছিল, সামাজিক নির্মমতা যাদের চিত্তকে ব্যথিত করেছিল; যারা সমাজ ও জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত ছিল তাদেরই কণ্ঠে নি:সৃত সংগীত হল বাউল গান। দ্রঃ ***বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগলিক পরিবেশ,*** পৃ. ১৪৪।

২৪৪. K. G. M. Latiful Bari, ***op. cit.***, p. 68.

২৪৫. **লালন শাহ ঃ** সুর সাধক বাউল সম্রাট লালন শাহ বাংলা ১১৭৯ সালের পহেলা কার্তিক ইংরেজি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিণাকুন্ড থানার কুল বেড়ে হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দরীবুল্লাহ দেওয়ান, আর মাতার নাম আমেনা খাতুন। লালনের প্রধান শিষ্য দুদ্দু শাহের বর্ণনা থেকে তাঁর সঠিক জীবনী পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ-

এগার শো উনআশি কার্তিকের পহেলা
হরিষপুর গ্রামে সাঁইর আগমন হৈলা।
যশোর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয়

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত মহকুমাধীন হরিষপুর হয়।
গোলাম কাদের হন দাদাজী তাহার
বাংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাকাম।
দরীবুল্লাহ দেওয়ান তার আব্বাজির নাম
আমিনা খাতুন মাতা এরে প্রকাশিলাম।

লালনশাহ বাল্যকাল হতে গান-বাজনা খুব পছন্দ করতেন। হরিশপুর এলাকায় তখন কবিগান, জারীগানের বিশেষ প্রচলন ছিল। বিখ্যাত বয়াতীদের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হত। লালন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে গান শুনে বেড়াতেন। এক সময় তিনি নিজে গান রচনা শুরু করেন। তাঁর গুরু ছিলেন সিরাজ সাই। তিনি তাঁর নিজস্ব সাধন রীতি ও আধ্যাত্ম সংগীত দ্বারা সাধারণ মানুষের চিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ভক্ত শিষ্য ছিল অগণিত। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের মরমী সঙ্গীতের উপর লালন শাহের অতীন্দ্রীয় রসের প্রভাব পড়েছিল। লালন শাহের বিখ্যাত গানের মধ্যে-

খাচার ভিতর অচীন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পায়।

এছাড়া- জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা
সত্য পথে কেউ নয় রাজী, সব দেখি তা-না-না-না-না।

এবং মুখে পড়বে সদয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আইন তেজিলেন রাসুল-উল্লা। ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাউল মতবাদের পরিণতি যাই হোকনা কেন লালন গীতির সাহিত্যিক মূল্য ও সাংগীতিক মর্যাদা বাংলা সাহিত্যে অম্লান হয়ে থাকবে। এই মহান বাউল সাধক, কবি বাংলা ১২৯৭ সালের পহেলা কার্তিক, ইংরেজি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যু তাং সম্পর্কে দুদ্দু শাহের বর্ণনায় এসেছে-

বারশত 'সাতানব্বই' বাংগালা সনেতে
পহেলা কার্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে
সবারে কাদায়ে মোর প্রাণের দয়াল
ওফাত পাইল মোদের করিয়া পাগল।

দ্র: কাজী শওকত শাহী, *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক* (যশোর প্রকাশনায় আফিয়া আমিনুন নাহার, ১৯৯৩), পৃ. ১-৫; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৪৫-৪৭; আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা:), *যশোর জেলার ইতিহাস* (ঢাকাঃ দিগন্ত প্রচারণী লিমিটেড, ১৯৯০), পৃ. ৩৬০-৭০; মীর্জা মোহাম্মদ আল ফারুক (সম্পাঃ), *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, (ঝিনাইদহঃ জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ, ১৯৯১), পৃ. ৭৩-৭৭; তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শৈলকূপার তৎকালীন সাব-রেজিস্ট্রার জনাব আব্দুল ওয়ালী তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন- "Another renowned and most melodious versifier whose dhuas are the rage of the lower classes and sung by boatmen and other, was far famed Lalan Shah, he was a disciple of seraj Shah, and boath were, born at villages Harishpur, Sub-division Jhenaidah, District Jessore ..... where he died some ten years ago. His disciples are many and his songs are numerous," ("On some curious tenets and practies of certain class of Fakirs in Bengal" Journal of the Anthropological Socity of Bombay, 1900, Vol-5, No-4, p. 217), উদ্ধৃতঃ মুহম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী, *বাংলা সাহিত্যে যশোরেরঅবদান* (যশোরঃ প্রকাশক শামসুন্নাহার লিলি, বারান্দী পাড়া, ১৯৮৭), পৃ. ৮; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ঢপ, কীর্তনের প্রবর্তক। জেলা শহরের উত্তরে ঝিনাইদহ ও মাগুরা জারী গানের পীঠস্থান ছিল। এ গানের প্রবর্তক ছিলেন পাগলা কানাই [২৪৭] এবং ইদু বিশ্বাস [২৪৮] ছিলেন দ্বিতীয় প্রবর্তক। [২৪৯] এছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য শিল্পী উদয় শংকর এবং তার ভাই সেতার শিল্পি রবী শংকর এই যশোরের সন্তান। [২৫০] এমনি অসংখ্য শিল্পী যশোরের সংগীতাঙ্গন তথা বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে করেছে গৌরাবান্বিত।

---

[২৪৬]. **মধুসুদন কিন্নর:** কবি মধুসুদন কিন্নর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের (১১২৫ বঙ্গাব্দ) যশোরের উলশী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম তিলক চন্দ্র। তিনি জনসাধারণের কাছে মধু কিন্নর এবং মধুকান নামে পরিচিত ছিলেন। কীর্তন সংগীতে মধু কিন্নরের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি যশোর রায় খাদিয়ার রাধা মোহল বাউলের কাছে ঢপ গান রচনা করেন। মধু কিন্নর ছিলেন বিশেষ সুর স্রস্টা ও কীর্তণ রচয়িতা। কাশিম রাজার রাজবাড়ীতে গান করতে যাওয়ার পথে ১২৭৫ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগরে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র: শাহাদাত আলী আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২-২৩; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৩৮৬।

[২৪৭]. **পাগলা কানাই:** যশোরের আর এক বাউল কবি পাগলা কানাই। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ১২১৬ বঙ্গাব্দে ঝিনাইদহ মহকুমার লেবুতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কুড়ান শেখ। তার আসল নাম কানাই শেখ। কবিত্ব শক্তিতে লালন শাহের পরেই পাগলা কানাই এর স্থান। অশিক্ষিত হলেও তার কবি প্রতিতা ছিল অসাধারণ। তিনি প্রথমে জারীগানের সাথে সম্পৃক্ত হন। তার মুখে গান রচনার শক্তি তাকে গানের রচয়িতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তার রচিত গানগুলোকে দেহতত্ত্ব, জারী, বাউল, ধুয়া, মারফতী, মুর্শিদী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তার উল্লেখযোগ্য গানগুলো হলো:

"গেলো দিন
শুন মুসলমান মোমিন
পড় রবিবল আলামিন
দিন গেলে কি পাবি ওরে দিন।"

401333

তার রচিত জারী গানের একটি অংশ হলো:

"সালাম সালাম সালাম রাখি দেশের পায়
পয়লা সালাম করি আমি খোদার দরগায়
তারপর সালাম করি নবীজিরে
যিনি শুইয়্যা আছেন মদিনায়।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

পাগলা কানাই ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে আষাঢ় ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্র: *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৩৭১-৭৪; *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, পৃ. ৬৭-৭১; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৪৭-৪৯।

[২৪৮]. উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত বয়াতী। তিনি পাগলা কানাইয়ের সমসাময়িক ছিলেন। যশোরের ঝিনাইদহের ঘোড়ামাড়ী গ্রামে তাঁর জন্মস্থান। সেখানে তাঁর কবর আছে। ইদু বিশ্বাসের গানের ওস্তাদ ছিলেন নাইমুদ্দী মুন্সী। পাগলা কানাই ও ইদু বিশ্বাসের মধ্যে প্রায়ই গানের আসরে প্রশ্ন-উত্তরের প্রতিযোগিতা হত। গান রচনায় ইদু বিশ্বাসের অবদান অনবদ্য। অনুমান করা হয় যে, তিনি ১৮৯৬ সালে ইন্তেকাল করেন। দ্র: *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, পৃ. ৮৮; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৩৭৪-৭৭।

[২৪৯]. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬৯।

[২৫০]. K. G. M. Latiful Bari, *op. cit.*, p. 68.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গে মুসলমানদের আগমন ও যশোরে ইসলাম

- জলপথে সাহাবায়ে কিরামের আগমন
- স্থলপথে তাবেয়ীগণের আগমন
- রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের আগমন
- বঙ্গে সূফী, 'আলিম ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার
- বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা
- যশোরে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গে মুসলমানদের আগমন ও যশোরে ইসলাম

জলপথে সাহাবায়ে কিরামের আগমন ঃ

সর্বপ্রথম কখন ও কিভাবে এ উপমহাদেশে তথা বঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কেননা এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য ইতিহাস খুব একটা লিখিত হয়নি। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র, আরব ভূগোলবিদের বিবরণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাপ্ত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সাহায্যে প্রাথমিক যুগে বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়।[১]

মহানবী (সঃ) তাঁর জীবদ্দশাতে ইসলামের দা'ওয়াতী মিশন শুধুমাত্র 'আরব বা তৎসংলগ্ন এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং সারা পৃথিবীতে ইসলামের এ সুমহান বাণী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন বিশ্বনবী তাই তাঁর কর্মক্ষেত্রও ছিল ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেছেন- "হে রাসূল (সঃ) আপনি ঘোষণা করুন; হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"[২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- "(হে মুহাম্মদ) আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শণকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।"[৩] যেহেতু তাঁর কর্মক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তাই মদীনার বাইরের

---

১. ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, *সুলতানী আমল* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৫১।

২. "قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا" দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরাঃ আল-আ'রাফ, আঃ ১৫৮।

৩. আল-কুর'আন, সূরাঃ সাবা, আঃ ২৮; মহানবী (সঃ) ছাড়া অন্য সব নবীগণ শুধু স্ব-স্ব জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। জগতের সমস্ত জাতির জন্য নয়। যেমন হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল-কুর'আনের ঘোষণা- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِـهِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি নূহ (আঃ) কে তার কওমের প্রতি নবী করে পাঠিয়েছিলাম। দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ, আঃ ৫৯; অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আঃ) সম্পর্কে বলেন- "وَ إِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا" অর্থাৎ- আদ বংশের প্রতি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ, আঃ ৬৫; হযরত সালেহ (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা- "وَ إِلَى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا" অর্থাৎ ছামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ (আঃ) কে পাঠিয়েছিলাম। দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরাঃ আল আ'রাফ, আঃ ৭৩; এমনিভাবে আল্লাহ তায়া'লা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন- "وَ رَسُوْلاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ" অর্থাৎ ঈসা (আঃ) কে বণী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম। দ্রঃ আল-কুর'আন, সূরাঃ আলে ইমরান, আঃ ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রগুলোতেও ইসলামের দা'ওয়াত[৪] পৌছানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। অত:পর হিজরতের সপ্তম বর্ষে (৬২৯ খ্রিঃ) মক্কার মুশরিকদের সাথে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'[৫] স্থাপনের মাধ্যমে সে সুযোগ এসে যায়। এ সন্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল ১০ (দশ) বছরের জন্য সকল যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।[৬] ফলে মহানবী (সঃ) এবার সব আশংকা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানগণকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি-পত্র প্রেরণ করেন।[৭]

তাঁর এসব চিঠিপত্র বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। তিনি রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে[৮] পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি[৯], আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর

---

৪. এ দা'ওয়াতের নির্দেশ ও গুরুত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন- "اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" অর্থাৎ তুমি স্বীয় প্রতিপালকের পথের দিকে বুদ্ধিমত্তা ও সদুপদেশের মাধ্যমে আহবান কর। দ্র: আল-কুর'আন, সূরাঃ নাহল, আ: ১২৫; অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেন- "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" অর্থাৎ আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। দ্র: আল-কুর'আন, সূরাঃ হা-মীম সিজদা, আ: ৩৩।

৫. মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে একটি কূপ আছে। যাকে বলা হয় হুদায়বিয়া। এজন্য সেখানকার গ্রামটিও এ নামে খ্যাত। যেহেতু সন্ধি চুক্তি সেখানেই লেখা হয়েছিল, তজ্জন্য এই ঘটনাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ইসলামের অনাগত ভবিষ্যতের জন্য কামিয়াবীর পটভূমি। আর এ কারণেই এ সন্ধি যদিও একটি নিছক চুক্তিমাত্র ছিল এমনকি বাহ্যত অধীনতা সুলভ প্রকৃতির বহি:প্রকাশ ছিল তবুও আল-কুর'আনে তাকে একটি মহৎ ও প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে চিহিত করা হয়েছে। দ্র: আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলাইমান নদভী, *সীরাতুন-নবী*, এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী অনূদিত (ঢাকা: তাজ কোম্পানি, ৩য় সং, ১৯৯৪), পৃ. ২২৭-২৮; এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেন- "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। দ্র: আল-কুর'আন, সূরাঃ ফাতাহ, আ: ১।

৬. 'আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, খাদীজা আক্তার রেজায়ী কর্তৃক অনূদিত, (আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০০), পৃ. ৩৭৯; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৪র্থ সং, ১৯৯৬), পৃ. ৯৬-৯৭।

৭. এ.কে.এম. নাজির আহমদ 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর সমসাময়িক শাসকবৃন্দ, *মাসিক পৃথিবী*, ঢাকাঃ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগষ্ট, ১৯৯৯, পৃ. ৪৬।

৮. মহানবী (সঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে যে পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন সেটি এই: بسم الله الرحمن الرحيم– من محمد عبد الله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم– سلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين– فإن توليت فإن عليك اثم الاريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون– অর্থাৎ- পরম দয়ালু ও দাতা

 Dhaka University Institutional Repository

প্রতি[১০], মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার কিবতীদের বাদশাহ মুকাওকসের প্রতি, বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির ইবন সাওয়া আব্দির, আম্মানের বাদশাহ আবদ লুন্দি ও তার ভাই বাদশাহ জায়ফার-এর প্রতি, ইয়ামামার

আল্লাহর নামে, এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে লিখিত। সত্য অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি)। ইসলাম গ্রহণ করুন; শান্তিতে থাকুন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। আপনি যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন তবে প্রজাবৃন্দের পাপের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে। "হে আহলে কিতাবগণ সংঘাতের চিন্তা ছেড়ে আসুন আমরা এমন একটা মধ্যবর্তী পন্থায় ঐকমত্যে উপনীত হই যে বিষয়ে আমাদের ও আপনাদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর উপাসনা বা আরাধনা করবনা। অন্য কোন কিছুকেই আল্লাহর শরীকরূপে সাব্যস্ত করবনা। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিকে আমাদের পালনকর্তারূপে মান্য করবনা। যদি তারা (এ বাণী) গ্রহণ না করে তবে তোমরা (মুসলিমগণ) বলে দাও- তোমরা সাক্ষী থাক আমরা আল্লাহর অনুগত। দ্রঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড (দিল্লীঃ মাকতাবায়ে মুস্তাফায়ী, ১৩০৪হিঃ), পৃ. ৪-৫।

৯. মহানবীর (সঃ) পারস্য সম্রাট খশরু পারভেজের কাছে প্রেরিত চিঠিটি নিম্নরূপ: بسم الله الرحمن الرحيم– من محمد رسول اللهِ إلى كسرى عظيمِ فارسٍ– سلامٌ على مَن اتَّبعَ الْهُدى– و أمنَ باللهِ وَ رَسُوْله، وَشهدَ انْ لا إلــه إلاَّ اللهُ وَحْــده لا شَريكَ له و انَّ مُحمدًا عبده و رسوله و ادعوكَ بدعايةِ الله– فإنِّي اَنَا رسولُ اللهِ إلى النَّاس كافةً، لِينذرَ مَنْ كَانَ حَيًا و يحقُّ الْقَوْلُ على الكافرين فاسلمْ تسلمْ فــإن ابيــتَ فإن إثــم المجــوس عليــكَ– অর্থাৎ- পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষ থেকে পারস্য অধিপতি কিসরার প্রতি। যে ব্যক্তি সত্য পথের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রতি সালাম, আরও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। আমি সমস্ত মানুষের নিকট আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি। আমি সমস্ত জীবন্ত সত্তাকে সতর্ককারী যেন অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহর দলিল কায়েম হয়ে যায়। ইসলাম গহণ করুন, নিরাপত্তা লাভ করুন। যদি অস্বীকৃত হন, তবে অগ্নি উপাসক জনগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত পাপের বোঝাও আপনাকেই বহন করতে হবে। দ্রঃ আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, *আসাহহুস সিয়ার* (ভারত, ইউপি, দেওবন্দঃ সামাদ বুক ডিপো, হিঃ ১৩৫১/ খ্রিঃ ১৯৩২), পৃ. ৩৯১; হান্না আল-ফাখুরী, *আল-মু'জিম ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারিখুহু*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল জিল, হিঃ ১৪১১/ খ্রীঃ ১৯৯১), পৃ. ৪০০; আল্লামা বাকেল্লানী ,আবুবকর মুহাম্মদ ইবন তৈয়ব, *ইজাজুল কুরআন* (মিসরঃ দারুল মা'রিফ কায়রো, তা. বি.), পৃ. ১৩৪।

১০. নাজ্জাসীর নিকট প্রেরিত পত্রখানি এই: من محمدٍ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ إلى النجاشي ملك الحبشةِ اسلمْ انتَ فإنِّي أحمدَ إليكَ الله الذي لا إلَه إلا هو الملك القدوس السلامُ المؤمنُ المهيمنُ و اشهدث انَّ عِيْسى بــن مريــمَ روحَ الله و كلمته القاها إلى مريم البتولِ الطيبةِ الحصينةِ فحملتْ بعيسى فخلقَه الله من روحِه و نفخَه كمَا خلَــقَ أدم بيــدِه و إنــي ادعوكَ و جنودَكَ إلى اله عزَّ و جلَّ و بلغتُ و نصحتُ فاقبلُوا نصيحتِي والسلامُ على مــن اتبــعَ الهــدى– অর্থাৎ- পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (সঃ) পক্ষ থেকে হাবশা অধিপতি নাজ্জাশীর নামে পত্র। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র শাসক। তিনি পবিত্র শান্তি ও নিরাপত্তাদানকারী এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমি সাক্ষ্য দেই যে, ঈসা (আঃ) ইবন মরিয়ম আল্লাহর তরফ থেকে আগত একটি পবিত্র আত্মা ও একটি কালিমা; যা সর্বপ্রকার কলুষ কালিমা মুক্ত মরিয়মের গর্ভে স্থাপন করা হয়েছিল। এজন্য তিনি (মরিয়ম) গর্ভবতী হন। ফলে মরিয়মের সে গর্ভ থেকে হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ) কে নিজের রূহ ফুৎকার থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার সেনাবাহিনীকে মহান আল্লাহর দিকে ডাকছি। আমি আল্লহর নির্দেশ পৌছে দিয়েছি এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ হাওয়াহ এর প্রতি, দামিস্কের অধিপতি হারেস ইবন আবু শামস গাসসানীর প্রতি এরূপ ফরমান পাঠান। পূর্বদিকে চিন দেশের তদানীন্তন সম্রাট তাইসুন্ড এর কাছেও অনুরূপ একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন।[১১] এরপর দশম হিজীরতে (জিল্‌হজ্জ্ব মাসে) ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সঃ) লক্ষাধিক জনতার সামনে ইসলামকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার উদাত্ত আহবান জানান।[১২] তিনি ঘোষণা করেন, আমার নিকট থেকে একটি বাক্য শুনে থাকলে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিবে।[১৩]

মহানবী (সঃ) এ ঘোষণার সাথে সাথে আরবের বাইরে আ'জমের (অনারবের) যেখানে যেখানে ইসলামের বাণী তখনও পৌঁছেনি সেখানেও তা প্রচার করা উপস্থিত সাহাবীগণের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সাহাবায়ে কিরামের একটা অংশ বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। আর তাঁদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগেই ইসলামের সুমহান

উপদেশ প্রদান করেছি। আপনি আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সঠিক পথের অনুসরণ করে। দ্র: আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯২; ইজাজুল কুরআন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪।

১১. চীন দেশে প্রেরিত পত্রখানির কথা অধ্যাপক H. G. Wells উল্লেখ করেছেন। পত্রখানি এরূপ- To the monarch (Tai-sug) also come (in A.D. 628) messengers from Muhammad, They came to canton on a trading ship. They have sailed the whole way from Arabia along the Indian coasts. Unlike Heraclius and kavadh Tai-sung gave their envoys a courteous hearing. He expressed his interest in their theological ideas and practice and assisted them to build a mosque in canton, a mosque survives, it is said, to this day, the oldest mosque in the world. cf.: H. G. Wells, A Short History of the world (London), p. 175; উদ্ধৃত: ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত, *অগ্রপথিক সংকলন: আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, জুন, ১৯৯৫, ই.ফা.বা., ঢাকা, পৃ. ৩২।

১২. এ ঐতিহাসিক ভাষণের সার সংক্ষেপ মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে- "يا ايها النّاسُ الا انَّ ربكُمْ وَاحِدٌ و انَّ أبَاكُمْ واحدٌ– الا لافضلَ لعربي على عجمي ولا لِعجمِـى علـى عربـي، و لا لِـأحْمَرَ علـى اسـودَ ولا لِا سـودَ علـى أحمـرَ الاَّ بالتقوى– فليبلـغ الشـاهدُ الغـائبَ" অর্থাৎ- হে লোক সকল সাবধান! তোমাদের প্রভূ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের পিতা একজন। সাবধান! আজমী (অনারব) এর উপর কোন আরবের এবং আরবের উপর কোন আজমীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি কালোর উপর সাদার এবং সাদার উপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদার ভিত্তি হল কেবলমাত্র তাকওয়া। যারা এখানে উপস্থিত! তারা যেন (বর্ণিত সকল হুকুম আহকাম) যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। দ্র: মুসনাদে আহমাদ। উদ্ধৃত: এ. কে. এম. মহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফাবা. ১৯৯৬), পৃ. ১৩।

১৩. হাদীসটি নিম্নরূপ- "عن عبد الله إبن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بَلِّغُوْا عَنِّي ولو أية و حدثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ من كذبَ عليَّ مُتعَمِّدً فليتبوأ مقعدَه مـن النـار، رواه البخـاري" দ্র: শায়খ ওলী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-খাতীব আত-তিবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

বাণী পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল থেকে পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে এমনকি সুদূর চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।[১৪]

বলা বাহুল্য, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মহানবী (সঃ) এর কোন বাণীতে সরাসরি বাংলাদেশ বা বঙ্গের নামোল্লেখ না থাকলেও তিনি হিন্দ[১৫] ও সিন্দ এর কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু মহানবী (সঃ) নিজ সাহাবীগণকে পাক ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। "হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন: রাসূল (সঃ) আমাদেরকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিৎ ওয়াদা করেছেন। অতএব যদি আমি সে সময়ে জীবিত থাকি, তবে আমি আমার জান ও মাল উৎসর্গ করব। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয় তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদে পরিণত হব। আর যদি সহীহ সালামতে ফিরে আসি তবে আমি হব দোযখমুক্ত আবূ হুরায়রা।"[১৬] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- "আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনাদলকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখবেন। তার মধ্যে একটি হচেছ ভারত অভিযানকারী সেনাদল এবং অপরটি হচ্ছে 'ঈসা ইবন মারইয়ামের (আঃ) সহযোগী সেনাদল।"[১৭]

পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) এর একটি সম্যক ধারণা ছিল; এবং বিভিন্ন তথ্য সূত্র হতে তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষে ইসলামের সুমহান বাণী এসে পৌঁছেছিল তা জানা যায়। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন- ভারতবর্ষের মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদ্র তীরবর্তী মালাবারের মোপলারাজা চেরুমল, পেরুমল স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে, রাসূল

---

১৪. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০), পৃ. ৫৪।

১৫. মহানবী (সঃ) এর ইন্তিকালের কয়েকমাস পূর্বে একবার হিন্দ শব্দ ব্যবহার করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) যখন মাজরান হতে বনী হারেস ইবন কাবের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর দরবারে আগমন করেন তখন তাদেরকে হুজুর (সঃ) বলেন- এরা কোন জাতি, মনে হয় তারা হিন্দুস্তানী লোক। দ্রঃ ইবনে খালদুন, *রিজালুস-সিন্দ-ওয়াল হিন্দ,* উদ্ধৃত: *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৭।

১৬. "عن إبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن ادركتها انفق فيها نفسي ومالي و ان قتلت كنت افضل الشهداء و ان رجعت فانا ابو هريرة المحرر" দ্রঃ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন সুয়াইব ইবন আন-নাসাঈ, *সুনান আন-নাসাঈ*, ২য় খণ্ড, কিতাবুল জিহাদ (নতুন দিল্লী: মাকতাবায়ে রহিমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৫২।

১৭. "و عن صوبان رضي الله عنه عصابتان من امتي احرزهما الله من النار عصابة تغز والهند و عصابة تكون مع عيسى بن مريم" দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

(সঃ) এর নবুয়াতী জীবনে তার মুবারক আঙ্গুলি সংকেতের ফলে যে চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হয়।[১৮] (شق القمر) এ অলৌকিক ঘটনাটির তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। অত:পর একদল 'আরব মুসলমান জাহাজযোগে মালাবার আসলে রাজা তাদের কাছে চন্দ্র বিদারণের ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন। তাঁদের বর্ণনার সাথে রাজার বর্ণনার (দিনক্ষণ ইত্যাদির) হুবহু মিল হয়। তখন তার হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণের অদম্য বাসনা জাগ্রত হয়। ফলে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে মক্কায় গমন করে রাসূল (সঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯] এ সময় মালাবারের (বর্তমান কেরালা) বহু পৌত্তলিকও ইসলাম গ্রহণ করে।[২০] এছাড়া রাসূল (সঃ) কাছে উপমহাদেশের জনৈক শাসক এক ডেকচি আদা উপহার পাঠিয়েছিলেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।[২১] এমনকি বাংলা রুহমী[২২] রাজ্যের শাসকের মাধ্যমে রাসূল

---

১৮. "شق القمر" এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে- "اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ– وَ اِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُعْرِضُوْا وَ يَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ" দ্র: আল-কুর'আন, সূরাঃ আল-কমার, আঃ ১-২; হাদীস শরীফে شق القمر সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- হযরত আনাস ইবন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন- মক্কাবাসীরা রাসূল (সঃ) এর কাছে নবুয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলো, আল্লাহ চন্দ্রকে দ্বি-খন্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন তারা হেরা পর্বতকে উভয় খন্ডের মাঝখানে দেখতে পেল। দ্র: অধ্যাপক মোজাম্মেল হক অনূদিত, *সহীহুল বুখারী,* ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ২০০১) পৃ. ৫৫৫; হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) অপর এক বর্ণনায় বলেন- মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু-খন্ড হয়ে যায়। কুরাইশ কাফিররা বলতে থাকে, এটা যাদু, মুহাম্মাদ তোমাদেরকে যাদু করেছে। অতএব তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের জন্য অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বি-খন্ড অবস্থায় দেখে থাকেন তবে মোহাম্মদের দাবি সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা যাদু ব্যতীত কিছুই নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বি-খন্ড অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে। দ্র: সুনানে আবি দাউদ, উদ্ধৃত: ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত, *তাফসীর ইবনে কাসীর,* ৭ম খণ্ড, ২য় সং (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২০০১), পৃ. ১৮১-৮২।

১৯. পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর (মালাবারের প্রাচীন নাম) রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণাভিলাসে মক্কা নগরীতে গমন করেন। দ্র: বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম সং, ১৪শ খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২৩৪; সুতরাং মালাবার রাজ্যের রাজার স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করা এবং রাসূল (সঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করার বিবরণটি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া আদৌ সঙ্গত হতে পারেনা। দ্র: মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকাঃ আজাদ এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স লিঃ, ১ম সং, ১৯৬৫), পৃ. ৫০।

২০. আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, *অগ্রপথিক সংকলন,* পৃ. ৩৩।

২১. হাদীসটি এরূপ: Sarbatak, king of kunj (India) sent an earthenware full of ginger to Hazrat Muhammad (sm), the prophet (peace be on him) as present according to a narration by Abu Sayeed Khudri (R.). It is also reported that Hazrat Muhammad (Sm) the prophet (Peace be on him) sent Hudhye Usama and Sohayb to the king inviting him to accept Islam. He had embraced Islam. Sarbatak also said, I Saw the prophets face, first in mecca and then in medina. He was very handsome faced and middle sized

Dhaka University Institutional Repository

(সঃ) এর নিকট উপঢৌকন পাঠানোর ঘটনা বিধৃত হয়েছে।[২৩] এসব কারণে অনুমান করা যায় যে, রাসূলের জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে।[২৪]

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, মূলত আরবীয় মুসলমানদের দ্বারাই এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামের আগমন ঘটে। ঐতিহাসিক সূত্র মতে-হিজরী প্রথম শতকে (খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দী) ভারত উপমহাদেশে আরবীয় মুসলমানগণের আগমন ঘটে।[২৫] আরবীয় এই মুসলমানগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। তাদের সাথে কতিপয় ওলী, দরবেশ, সূফী-সাধক শুধুমাত্র ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের জন্য আগমন করেন এবং এ মহান কাজে সারা জীবন অতিবাহিত করে এখানেই মৃত্যু বরণ করেন। আর এক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন-বিজয়ীর বেশে দেশ জয়ের অভিযানে।[২৬]

মহানবী (সঃ) এর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরবগণ জীবিকার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মরুময় দেশে জীবন ধারনের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবহমান কাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হত। স্থলপথ, জলপথ উভয় পথেই আরবগণ

---

man. cf.: Md Nurul Haque, Arab Relationship with Bangladesh. M. Phill Dessertation D.U. 1980, M. SS. p. 54; উদ্ধৃত: *অগ্রপথিক সংকলন*: আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৩৩।

২২. রুহমী রাজ্যের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন 'রুহমী' সম্পর্কীয় আরব ভূগোলবিদদের বিবরণ যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। হাতি, অত্যন্ত মিহি ও সূক্ষ্ম সুতী কাপড় (যা মসলিনের সঙ্গে অভিন্ন), গন্ডার (পরবর্তী ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের বর্ণিত ইউনিকরণ) এবং ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন, ইত্যাদি সকল সূত্রই বাংলাদেশকে নির্দেশ করে। পরবর্তী পর্যটক এবং ঐতিহাসিকদের যেমন ইবনে বতুতার সফরনামা, মিনহাজ-ই-সিরাজীর 'তবকাত-ই-নাসিরী' এবং টমাস বউরির বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দেশ সমূহ (Countries round the Bay of Bengal) বর্ণনায়ও বাংলাদেশের অনুরূপ চিত্র ফুটে ওঠে। দ্র: *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, পৃ. ৫৫।

২৩. কাজী আতহার মোবারকপুরী লিখেছেন- بنگال کي راجگان رسمي شابان ايران کي ياس قديم زامانے سے گران قدر هدايا و تحائف بهيجا کرتے تهے هو سکتا ہے که اس خاندان کی کسی راجدنے خدمت نبوي ميـــــے بهـــی هديه بهيجا -: ندوة المصنفين, دهلي: عرب وهند عهد رسالت مي, ص: ١٦٠؛ راجع: مولانـــا محمـــد سلطان صاحب ذوق ندوي, *تاريخ اركان كا ايك گمشده باب*, هـــ ١٤٠٦, ص: ١٠.

২৪. আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, *অগ্রপথিক সংকলন*, পৃ. ৩৩।

২৫. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৫; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৩৪।

২৬. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ১ম ও ২য় ভাগ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪), পৃ. ১৩।

তাদের ব্যবসা পরিচালনা করত।[২৭] ভারত উপমহাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বহু পূর্বথেকেই।[২৮] শুধু ভারতবর্ষেই নয় প্রাক ইসলামী যুগেই তারা একদিকে সমুদ্র পথে আবিসিনিয়া এবং অপরদিকে সুদূর চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছিল। 'আরব থেকে সুদূর চীনের মাঝ পথে তাদের কয়েকটি ঘাটিও ছিল। এ পথে তাদের প্রথম ঘাটি ছিল মালাবার।[২৯]

আরব বণিকগণ সব সময়ই মালাবারের উপর দিয়ে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে সিলেট ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। এভাবে বাংলার চট্টগ্রাম এবং তৎকালীন আসামের সিলেট ও

---

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

২৮. আরব, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি পশ্চিমী দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। দ্র: ডঃ তারাচাঁদ, ***ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব***, অনু: করুণাময় গোস্বামী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২৪; এ সম্পর্কে খালিক আহমদ নিযামী বর্ণনা করেছেন- "Indias relation with the Arab world go back to hoary past long before the rise of Islam .there was brisk commarcial contact between India and Arabia and the Arab traders carried Indian goods to the European markets by way of Egypt and Syria .Elphinstone has rightly observed that frome the days of Joseph to the days of Macro Polo and Vasco de Gama the Arabs were the captains of Indian commerce There were large number of Arab colonies on the western coast of India and many Indian settlements in the Arab countries. দ্র: কে. এ. নিযামী: ডঃ মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত "এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থের ভূমিকা; উদ্ধৃত: নাসির হেলাল, ***যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*** (ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৩৭।

২৯. মালাবার ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদ্র তীরবর্তী একটি জেলা। ভৌগলিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উপদ্বীপটিকে মালাবার নামে অভিহিত করা হয়। 'আরব ভৌগলিকগণের অনুলিখনে একে মালিবার (مليبار) বলা হয়েছে। এই নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে- মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন- আধুনিক গ্রীকদিগের মলি (MALI) শব্দে বর্তমান মালাবার নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ 'মালাবার' নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়- বিশ্বকোষ সম্পাদকের এই সিদ্ধান্তটি খুবই সংগত। আমাদের মতে মালাবার, আরবী ভাষার শব্দ মলয়+আবার= মালাবার। 'আরবী অনুলিখনে م ل ى মলয়+আবার। 'মলয়' মূলত একটি পর্বতের নাম, 'আবার' অর্থ কূপপুঞ্জ, জলাশয়। 'আরবরা এদেশকে মা'বার (معبر) বলে থাকেন। এর অর্থ ব্যতিক্রম করে যাওয়ার স্থল, পারঘাট। আজকালের ভূগোলে পূর্বঘাট ও পশ্চিম ঘাট। যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাট দুইটি পার হয়ে মাদ্রাজে ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করতেন এবং মিশর হতে চীন দেশে ও পার্শ্বপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগর-বন্দরে গমনাগমন করতেন; এজন্য তারা এদেশকে 'মা'বার' বলে উল্লেখ করতেন। এই নাম দুটি হতে এটা জানা যাচেছ, এই দেশের সাথে তাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। দ্র: মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের যাতায়াতের মঞ্জিল হিসেবে ব্যবহৃত হত। এর থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক ইসলামী যুগেই মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানে 'আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিল।[৩০]

মহানবীর (সঃ) এর নবুয়াত লাভের পর এই 'আরবীয় বণিকরাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের সুমহান বাণী ছড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যাপৃত হন। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এক একজন ব্যবসায়ী এক্ষেত্রে একেকজন ধর্ম প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩১] ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতবর্ষে 'আরবীয় মুসলিমদের দ্বারা যে, ইসলাম প্রচার হয়েছে এটা পূর্বে আলোচিত রাজা চেরুমল-পেরুমলের কাহিনী থেকে জানা যায়। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা যায়- তামিল ভাষার প্রাচীন পুঁথি পুস্তকে রাজা চেরুমলের ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটা এরূপ যে, আরব দেশের একদল লোক জাহাজযোগে মালাবারে আগমন করেছিলেন। তাঁদের প্রভাবেই রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩২] এ থেকে প্রতীয়মান হয়, 'আরবীয় ধর্ম প্রচারক ও বণিকগণ ভারত বর্ষে ইসলামের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল- মালাবারে বা চেরর রাজ্যে ইসলামের দা'ওয়াত কে নিয়ে এসেছিলেন। এ প্রশ্নের জবাবে রিজাল শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে হাবশায় হিজরতকারী [৩৩] দলের অন্যতম সাহাবী হযরত আবু

---

৩০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ৩০০; আরব বণিক ও নাবিকগণ সদা-সর্বদা এই পথ দিয়ে বঙ্গদেশ ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। মালাবারই ছিল তাদের মধ্য পথের প্রধান বন্দর। এখানকার মুহাজিরদের ভাষাও ছিল 'আরবী। দ্র: মওলানা মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্য সূত্র, *মাসিক মদীনা,* ২৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৪১।

৩১. বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৬৪; এ সম্পর্কে ড: আবদুর রহিমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- It is clear that the Arad mercents visited the coastal of Bengal from the mouth of Meghna to coxs Bazar and prized its commodities such as, the fine cloth (Muslin) and aloe wood. cf.: Dr. Abdur Rahim, Social and cultural History of Bengal. Vol-2, 1967; উদ্ধৃত: গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক,* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৯), পৃ. ৭।

৩২. শায়খ যুয়নুদ্দীন, তুহফাতুল মুজাহিদীন, উদ্ধৃত: বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার, পৃ. ৩৮; বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্য সূত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১; রাজা চেরুমলের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনায় একটু ভিন্নতা দেখা দিলেও (অর্থাৎ- কেউ বলেছেন মক্কায় রাসুলের কাছে তিনি বায়'আত গ্রহণ করেছেন আবার কারো মতে 'আরবীয় আগন্তুক মুসলিমদের প্রভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন) তিনি যে 'আরবীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এতে দ্বিমতের কোন সুযোগ নেই।

৩৩. মক্কায় বৈরী পরিবেশে ইসলামের অনুসারীদের অস্তিত্ব নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ায় এবং ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রধানত (১১৭ জন সম্ভবত) কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ সাহাবীকে নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে রাসূল-ই মকবুল (সঃ) হাবশায় পাঠিয়েছিলেন। দ্রঃ শায়খ শফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম (রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৩), পৃ. ৯২-৯৩; কারণ লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন একটা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। পশ্চিমে মিশর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র পথে চলাচলকারী নৌ-বহর হাবশায় এসে যাত্রা বিরতি করত। এখানকার বাজারে বিপুল হারে পণ্য বিনিময় হত। রাসূলে মকবুল (সঃ) এই

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্কাস (রাঃ)[৩৪] এর নেতৃত্বে একদল সাহাবা নাজ্জাসী [৩৫] কর্তৃক প্রদত্ত দুটি জাহাজযোগে চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মালাবার উপকূলে যাত্রা বিরতির মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন।[৩৬] এই দলে হযরত আবূ ওয়াক্কাসের সাথি হিসেবে ছিলেন সাহাবী হযরত কায়স ইবনে হুযায়ফা (রাঃ), হযরত 'উরওয়া ইবনে আছাছা (রাঃ), হযরত আবূ কায়াস ইবনুল হারেস (রাঃ)।[৩৭]

গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটি পূর্ণমাত্রায় খবর আদান-প্রদানের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্যসূত্র*, পৃ. ৩১-৩২।

[৩৪]. চীনা অভিযানকারী দলের নেতা ছিলেন হযরত আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মানাফ। তিনি রাসূল (সঃ) এর মাতা হযরত আমিনার আপন চাচাতো ভাই। সে হিসেবে তিনি রাসূল (সঃ) এর মামা। 'আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ:) তাঁর সম্পর্কে বলেন- سعد بڑے رتبہ کے صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامون تھے উদ্ধৃত: এ. কে. এম. মহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৬), পৃ. ২৪; তৃতীয় শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ আবদানের বর্ণনানুযায়ী হযরত আবূ ওয়াক্কাস নবুওয়াতের ৫ম সনে হাবশায় হিজরত করেন এবং ৭ম সনে ৩ জন সাহাবী ও কিছু মুসলমানসহ জাহাজযোগে চীনের পথে রওয়ানা হন। দ্রঃ ফারুক মাহমুদ, *ইতিহাসের অন্তরালে* (ঢাকাঃ ওয়েসিস বুকস, ১৯৮৯), পৃ. ৯৬; ইবনুল আসীর তার পরিচয় ও হাবশায় এবং চীনে হিজরতের ব্যাপারে বলেন- مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى ابو وقاص والد سعد بن ابي وقاص. اورده عبدان في الصحابة وقال هو ممن خرج إلى ارض الحبشة، لا تعلم له رواية، هو ممن تو في في زمان رسول اله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابو موسى وقال لا أعلم احدا وافق عبد ان على ذلك দ্রঃ ইবনুল আসীর, উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৭; উদ্ধৃত: *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ২৭; ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীনে পৌছান এবং সেখানে কোয়ান্টাম বন্দরে তাঁর কবর রয়েছে। দ্রঃ *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ২৯।

[৩৫]. নাজ্জাসী (النجاشي) সম্রাট নাজ্জাসী আসহামার ইবন আবহার ইসলামের ইতিহাসে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাক্ষাত লাভ করেননি। এ কারণে কোন কোন 'আলিম তাকে তাবিঈ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর একটি গৌরব এই যে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি রাসূল (সঃ) ও সাহাবা-ই-কিরাম যার গাইবানাহ সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন। দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৩শ খণ্ড (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯২), পৃ. ৬৭০।

[৩৬]. হিজরী তৃতীয় শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়াজীর হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়্যিদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী (রহ:) এর বর্ণনানুযায়ী আবাদান ইবন মুহাম্মদ ইবন ঈসা (মৃত্যু: ২৯৩ হি:) মু'য়াত্তা প্রভৃতির সংকলক হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওয়াহাব (রাঃ) নবুওয়াতের ৫ম সনে হাবশায় হিজরত করেন এবং নবুওয়াতের সপ্তম সনে ৩ জন সাহাবী ও কয়েকজন হাবশী মুসলমানসহ দুটি সমুদ্রগামী জাহাজযোগে চীনের পথে রওয়ানা হয়ে যান। ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (সঃ) এর মদীনা হিজরতের ছয় বছর আগে তাঁরা হাবশা থেকে রওয়ানা হন এবং ৬২৬ খ্রীঃ চীনে উপনীত হন। উল্লেখ্য, আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারক দলটি রাসূল (সঃ) এর মদীনায় হিজরতের আগেই তাঁর মক্কা অবস্থান কালেই প্রাচ্য সফরের প্রথম মানুষ হিসেবে মালাবার উপকূলে উপনীত হন। তাঁদের কাছে রাজা পেরুমল ইসলাম কবুল করেন এবং রাসূলের কাছে সাক্ষাত গ্রহণের জন্য মক্কা গমন করেন। এভাবে রাজা তাঁর পরিষদবর্গ ও কিছু কিছু জনসাধারণকে ইসলামে দীক্ষা দানের পর হযরত আবূ ওয়াক্কাস চীন দেশ অভিমুখে অগ্রসর হন। দ্রঃ চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ. ৩১-৩২; এ. কে. এম. নাজির আহমদ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯), পৃ. ২০।

[৩৭]. *আরব ও হিন্দ কি তায়াল্লুকাত*, পৃ. ৬৯; *বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র*, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, তাঁদের আগমনে মালাবারে পূর্ব হতেই বসবাসরত আরব মোহাজিরগণ ও সেখানকার রাজার ইসলাম গ্রহণের পর স্থানীয় মালাবারবাসীগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। ফলে মালাবার মুসলমানদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।[৩৮]

মালাবারের পর হযরত আবূ ওয়াক্কাসের জামা'য়াতের পরবর্তী মঞ্জিল কোথায় ছিল এ সম্পর্কে আরব ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের বর্ণনায় জানা যায় যে, এটি ছিল বাংলার দক্ষিণ পূর্ব-উপকূলের সমন্দর নামক একটি বন্দর। সমন্দর সম্পর্কে তাদের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। আল ইদ্রিসী,[৩৯] তাঁর নুযহাতুল মুশতাক গ্রন্থে বলেন- সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান। এখানে অনেক লাভবান (ব্যবসা-বণিজ্যে) হওয়া যায়। .... পনের দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরুত (কামরুপ) থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদী পথে আনা হয় যার পানি সুমিষ্ট।[৪০] অপর এক আরবীয় ভূগোলবিদ ইবন খুরদাদবীহের[৪১] বর্ণনায় জানা যায় যে, ইসলাম পূর্ব যুগেই 'আরব, ইয়েমেনী, আবিসিনীয় বণিকেরা সন্দীপের দক্ষিণ উপকূল থেকে একদিনের পথ উত্তরে এবং কামরুত (কামরুপ) থেকে ১৫/২০ দিনের পথ দক্ষিণে গংগা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার সংগমস্থলের পার্শ্বে 'সমান্দার'

---

৩৮. স্থানীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের পর সেখানে পর্যায়ক্রমে ১০টি মসজিদ নির্মিত হয়। প্রথম মসজিদ পেরুমলের রাজধানী কর্ণক্রোর (কোড়ঙ্গনুর) বা ক্রাঙ্গানুরে নির্মাণ করেন মালেক ইবনে দীনার। .... বিশ্বকোষ প্রণেতা এ সম্পর্কে বলেন- মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সকল মসজিদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হয়েছিল। ... ঐ সময়ে উপকূলবাসী মুসলমানগণের এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যায় পরিবৃদ্ধি হয়েছিল। ক্রমে তারা রাজ্যের মধ্যে প্রভাব সম্পন্ন হয়ে ওঠে। দ্রঃ *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ৫১; আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ১৮।

৩৯. আল-ইদ্রিসী এর পুরোনাম আবু আব্দুল্লাহ আল-ইদ্রিসী। তিনি "শরীফ" নমেও পরিচিত ছিলেন। 'সিবতা' নামক স্থানে তাঁর জন্ম। তিনি কর্ডোভায় শিক্ষা লাভ করেন। জ্যোতিস্ক বিদ্যা, ভূগোল, চিকিৎসা, যুক্তিবিদ্যা, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি রোম, গ্রীস, মিশর, মরক্কো, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করেন। বিভিন্ন শহর নগর ভ্রমণ করে যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আবাক'। তার যুগ ১১০০-১১৬৫ সাল পর্যন্ত। দ্রঃ *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩৫।

৪০. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৭; *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩৫।

৪১. 'আরব ভৌগলিকদের মধ্যে ইবন খুরদাদবা এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি খুরদাদবা নামেও পরিচিত। তাঁর আসল নাম 'উবায়দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন খুরদাদবা। তার জন্ম সম্ভবত ৮২০ সালে এবং মৃত্যু ৯১২/১৩ সালে। তিনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভুত এবং পার্বত্য এলাকায় ডাক ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগের উচচ পদে অধিষ্টিত। কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি আরব দেশ থেকে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত বাণিজ্য পথ বর্ণনা করেন এবং এতদসঙ্গে সামুদ্রিক বন্দর সমূহের বিবরণও দেন। দ্রঃ *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

(সামান+দার= পন্যাগার) বন্দরে আসা যাওয়া করতেন।[৪২] ড: মকবুল আহমেদ লিখেছেন- সমান্দার গংগা নদীর মোহনায় অবস্থিত।[৪৩] ড: তারাচাঁদ আরব বণিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে এ সম্পর্কে বলেন- "আমরা ভারত-চীন পথে কেন্টনের এবং জলযান ও অন্যান্য মাধ্যমে উত্তর দিকে যাত্রা করতাম; বঙ্গোপসাগর হয়ে গংগার মোহনার কুঞ্জা ও সমান্দার ইত্যাদির দিকে যাত্রা করতাম।[৪৪]

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়- সমান্দর একটি অতি প্রসিদ্ধ বন্দর এবং এটি সন্দীপের দক্ষিণ উপকূল হতে একদিনের পথ উত্তরে গংগা, ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনার সংগম স্থলে অবস্থিত। ঐতিহাসিকগণ এ বন্দরটিকে চট্টগ্রাম ও সন্দীপের মাঝামাঝি জায়গায় বলে অনুমান করেছেন। বর্তমান যুগের অনেক গবেষক সন্দীপেই সমান্দার অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ড: আব্দুল করিম তাঁর চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।[৪৫] সমন্দর সন্দীপেই হোক অথবা চট্টগ্রামে হোক না কেন বন্দরটি বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত এ দু'স্থানের কোন না কোন স্থানে অথবা উভয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থানে হবে বলে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, হযরত আবূ ওয়াক্কাসের জামা'য়াতটি এ বন্দর হয়ে চীনে উপনীত হয়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী লিখেছেন যে, মিশর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সুদীর্ঘ সমুদ্র পথে আরব নাবিকগণ নৌ-পরিচালনা করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে এসে প্রবেশ করতেন। এখানকার চট্টগ্রাম ও কামরূপে তাদের বাণিজ্য বহর নোঙর করত।[৪৬] দীর্ঘ পথে পালে টানা জাহাজের একটানা যাত্রা সম্ভবপর ছিলনা। পথে যেসব মঞ্জিল ছিল সেগুলোত আবশ্যিকভাবেই থেমে জাহাজ

---

৪২. *কিতাব আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক*, অনূ: ই. জিব্রিল, ১৮৮৯, পৃ. ৬৩-৬৪; মোহর আলী, *দি হিস্টোরী অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল*, পৃ. ৩০; উদ্ধৃত: *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩৯।

৪৩. "يقع سمندر فى مصب نهر جنجا" দ্র: "ثقافة الهند" (ভারতীয় সংস্কৃতি) *মাসিক আরবী পত্রিকা*, জানুয়ারী, ১৯৬৭; উদ্ধৃত: *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩৭।

৪৪. "و منها نقصد إلى كنتون بطريق الهند، الصيينة والقوارب الاخرى إلى الشمال عبر الخليج البنغال قاصدة إلى كنجه و سمندر و غير هما من موانى مصب جنجس" দ্র: "*الثقافة الهندية و وصول المسلمين إلى الهند*" মার্চ ১৯৭০, পৃ. ৩১; উদ্ধৃত: *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩৮।

৪৫. *বাংলাদেশ ইসলাম*, পৃ. ৬৭।

৪৬. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান* (ঢাকা: অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৫৭।

মেরামত এবং পরবর্তী মঞ্জিলের জন্য রসদপাতি সংগ্রহ করতে হত।[৪৭] এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মালাবার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবূ ওয়াক্কাসের জাহাজ বাংলার বন্দরে নোঙর করেছিল। আর যেহেতু সমন্দর ও শাতিল গাঙ বাংলার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বন্দর এবং আরবীয়রা পূর্ব হতেই এ বন্দরে আসা-যাওয়া করতেন সেহেতু আবূ ওয়াক্কাসের দল এ দুই বন্দরের যে কোনটিতে যাত্রা বিরত করেছিল তা সহজেই অনুমিত হয়।

চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান এর অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, বর্তমান চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে একটা বন্দর[৪৮]-নগরী ছিল, যেখানে খুব উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি হত। এসব তৈরি জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতেও ব্যবহৃত হত। এই বন্দরে জাহাজ মেরামতও করা হত। দূর পথে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজ এই বন্দরে যাত্রাবিরতি করত। এজন্য ঐতিহাসিকগণ মনে করেন রাসূল (সঃ) এর মাতুল হযরত আবূ ওয়াক্কাস চীন যাবার পথে সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রা বিরতি করেননি এমনটি ভাবা যায়না। আবূ ওয়াক্কাস ও তাঁর সাথিগণ অবশ্যই বাংলার বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিলেন এবং সেখানে বেশ একটা যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে তাঁরা কিছু লোককে ইসলামে বায়'আত করে গিয়েছিলেন আর এসব লোকই নীরবে এদেশে তাওহীদের বাণীর প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন।[৪৯]

হযরত আবূ ওয়াকাকাসের জামা'য়াত বাংলাদেশের উপকূল হয়ে মধ্যবর্তী অনেক স্থানে যাত্রা বিরতি ও ধর্ম প্রচারের পর চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হয়েছিলেন। চীনা ভাষায় লিপিবদ্ধ চীনে

---

৪৭. বাংলার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত তৎকালীন প্রাচ্যের অন্যতম প্রধান বন্দর সামান্দার ও শাতিলগাঙ, চট্টগ্রামে বিরতি দিয়ে তারা বায়ু প্রবাহ পরিবর্তনের প্রতীক্ষা করতেন। আর জাহাজের প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ সেরে নিতেন। অতঃপর উত্তর-পশ্চিম বায়ু প্রবাহে পাল উড়িয়ে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে হাজির হতেন এবং সেখান থেকে আবার দক্ষিণা বাতাসে পাল উড়িয়ে শাতিলগাঙ ও সামান্দারে এসে বিশ্রাম নিতেন ও জাহাজ মেরামতের কাজ সেরে শীতকালীন উত্তরে বাতাসে পাল খাটিয়ে সরন্দীপ (শ্রীলংকা) এর পাশ দিয়ে এগিয়ে মালাবার উপকূল ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে সময় ও সুযোগ মত আরব সাগর পাড়ি দিতেন। দ্রঃ *ইতিহাসের অন্তরালে*, পৃ. ৯৪-৯৫।

৪৮. এই বন্দর নগরটি সম্ভবত সমন্দর ছিল।

৪৯. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, পৃ. ৪১; *বাংলাদেশে ইসলাম-কয়েকটি তথ্যসূত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২; এ সম্পর্কে 'রিচার্ড সাইমন্ডস' এর উক্তি প্রনিধানযোগ্য- The culture that developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of the country especially chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century A.D. and many of the Arab voyegers and traders had left a permanent impress upon the area. Islam, therefore, took rot very early in this respective soil (cf.: Richard Saymonds, The making of Pakistan. *এ. অধ্যাপক আহমদ আলীর প্রবন্ধ*, পৃ. ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম আগমন সম্পর্কে যে সব তথ্যসূত্র রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবূ ওয়াক্কাসের জামা'য়াত ৬২৬ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক হিজরী ৩ সনের কোন এক সময়ের মধ্যে চীনের উপকূলে ৩জন সাথি সহ অবতরণ করেন। দলনেতা হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদ এখনও সমুদ্র তীরে সুউচচ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর পবিত্র কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয় যিয়ারতগাহরূপে পরিচিত হয়ে আসছে।[৫০] তার অপর তিনজন সাথি চীনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।[৫১] এ আলোচনা থেকে জানা যায় ইসলাম প্রচারক (আবূ ওয়াক্কাসের) জামা'য়াত হিজরী তৃতীয় সনে চীনে এসে পৌঁছেছিলেন। উল্লেখ্য, এই দলটিই নবুওয়াতের পঞ্চম সালে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এবং সপ্তম সনে চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, তাঁরা হাবশা থেকে বের হয়ে অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। ইসলাম প্রচারই ছিল তাঁদের লক্ষ্য এবং সে কারণে ৪/৫ মাসের পথে নয় বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় সামান্দার বা শাতিলগঙ্গে তাঁরা ৯ মাসও অবস্থান করেননি এবং ৯ জনকেও ইসলামে দীক্ষা দেননি এটি অসম্ভব। বস্তুত এই সময়ের মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারত এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছে।[৫২] সুতরাং বলা যায়- বাংলাদেশে ইসলাম রাসূল (সঃ) এর জীবদ্দশায় এমনকি হিজরতেরও পূর্বে (সম্ভবত) সমুদ্র পথে এসেছে এবং এদেশে কোন কোন সাহাবীর আগমন ঘটেছে এবং

---

[৫০]. একটি সূত্র থেকে জানা যায়, হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলাম প্রচারের জন্য চীনে আগমন করেন এবং সেখানেই আমৃত্যু ছিলেন। তার চীনা/চাইনিজ নাম (Yown Ghosu)। তিনি Gungzho (ক্যান্টন) শহরে Huai Sheng মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটি 'আরবের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে তৈরি। সেই সময় Perl river মসজিদটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এখন নদীটির গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) এর মাযার শরীফ লিউহুয়া লেকের পাশে Guangzhive Anccstrel form নামে পরিচিত। তার আকারটি প্রায় ৯/১০ ফুট দীর্ঘ এবং গাছপালায় পরিবেষ্টিত। দ্রঃ ফরিদা রহমান, চীনদেশে ইসলাম, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৮ই সেপ্টে: ১৯৮৭, পৃ. ৯।

[৫১]. হযরত আবূ ওয়াক্কাসের অপর তিন সঙ্গীর দুজন সমাহিত রয়েছেন উপকূলীয় ফুকীন প্রদেশের চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর। তৃতীয় জন সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে, তিনি দেশের অভ্যন্তর ভাগের দিকে চলে গিয়েছিলেন। দ্রঃ মুহাম্মদ আফতাব উদ্দীন, মহাচীনে ইসলামের বুনিয়াদ, মাসিক মদীনা, ঈদ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৩, পৃ. ৫৫; বাংলাদেশে ইস্লাম: কয়েকটি তথ্যসূত্র, পৃ. ৪০; মুহাম্মদ নিজামউদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস* (১৯৭১-১৯৯০), অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ৩৮।

[৫২]. *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩২; *ইতিহাসের অন্তরালে*, পৃ. ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী ও তাবে'য়ী রেখে গেছেন। যাঁরা পরর্তীতেকালে বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৫৩]

স্থলপথে তাবে'য়ীগণের আগমন ঃ

জলপথের ন্যায় স্থল পথেও দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারক দলের আগমন ঘটেছে বলে জানা যায়। স্থল পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খাইবর গিরিপথ দিয়ে তাঁরা এ উপমহাদেশে আগমন করেন।[৫৪] দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে (৬৩৪-৪৪ খ্রিঃ) হিজরী ১৪ সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। তাঁর খিলাফতকালেই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গে কয়েকজন তাবে'য়ী এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৫] হযরত 'উমর (রাঃ) এর আমলে (১৩-২৪হিজরী) দু'জন তাবে'য়ী মুহাম্মদ মা'মুন, ও মুহাম্মদ মুহাইমেন বাংলা মুলকে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তাঁদের পর খ্রিস্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে হযরত হামীদুদ্দীন, হযরত হোসেন উদ্দীন, মুহাম্মদ মুর্তজা, মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ আবূ তালিব নামক পাঁচজন মু'মিনের একটি জামা'য়াতও এদেশে আসেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন সময়ে এরকম পাঁচটি জামা'য়াত বাংলা মুলকে ইসলাম প্রচার করেন।[৫৬]

এ সকল ধর্ম প্রচারকের সঙ্গে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা কিতাব কিছুই থাকতনা। তাঁরা কোন রাজশক্তির সাহায্য গ্রহণেরও আশা করতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁরা বাংলাদেশের চলতি ভাষার মাধ্যমে ইসলামের বাণী, আখলাক, সালাত, সিয়াম ও যাকাত ইত্যাদির কথা বলতেন। আর নিজেরা 'আমলের মাধ্যমে বাস্তবে তা দেখিয়ে দিতেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রকৃত মুসলিম তৈরি, তা' সংখ্যায় যত অল্পই হোক। তাঁরা সাধারণত সফর করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে ধর্মের বাণী প্রচার করতেন। বেশিরভাগ স্থলেই তাঁদের কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রামকে বেছে নিতেন এবং তাকে কেন্দ্র করে মারকায বা আস্তানা গড়ে তুলতেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এঁদের পর

---

৫৩. *বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্যসূত্র*, পৃ. ৪০; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৪০।

৫৪. আজিজুল হক বান্না, *বরিশালে ইসলাম* (ঢাকা: ই. ফা. বা., ১৯৯৪), পৃ. ১৪।

৫৫. ড: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮৬ খ্রিঃ/১৩৯৩ বাং), পৃ. ৭।

৫৬. ডঃ হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০), পৃ. ২১২; *ইতিহাসের অন্তরালে*, পৃ. ৯৭; *বরিশালে ইসলাম*, পৃ. ৮৩; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৩৬ ও ৪০; *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পৃ. ৩০; ফজলুল হাসান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৯৫), পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

মিশর ও ইরান থেকে আরও পাঁচটি দল বাংলাদেশে এসেছিলেন, এঁদের বলা হত 'আবিদ। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্ বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে দ্বীনের প্রচার কাজ চালাতেন।[৫৭]

অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, হযরত 'উমর (রাঃ) এর খিলাফত আমলে মু'মিন ও 'আবিদ, নামক দুটি ইসলাম প্রচারক দল একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচার করার জন্য।[৫৮] পাকিস্তান কোয়াটারলি একটি নিবন্ধে হযরত 'উমর (রাঃ) এর সময় উক্ত দুই ইসলাম প্রচারক দলের নেতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 'মু'মিন' দলের নেতার নাম মুহাম্মদ মু'মিন এবং 'আবিদ দলের নাম যথাক্রমে হামীদুদ্দীন, হুসাইন, মুর্তজা, 'আব্দুল্লাহ ও আবূ তালিব।[৫৯]

রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের আগমন ঃ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে 'আরবীয় মুসলিমগণ এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে দু'ভাবে এসেছিলেন। প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বণিক হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত বিজয়ীর বেশে দেশ জয়ের অভিযানে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলিমগণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মূলত হযরত 'উমর (রাঃ) এর শাসনামলেই স্থলপথে এ উপমাহদেশে প্রবেশ করেন। খলিফা 'উমরের (রাঃ) এর আমলে হিজরী ১৫ সালের মধ্যভাগ থেকে প্রথমে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। মহানবীর (সঃ) ওফাতের ৩২ বছরের মধ্যে ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তান মুসলমানদের অধীনে আসে।[৬০] উল্লেখ্য, স্থলপথে অভিযানের পূর্বেও ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জলসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরির আগমন ঘটে বোম্বের থানা নামক স্থানে। তবে এ অভিযানে তেমন সাফল্য আসেনি। তিরানব্বই হিজরীতে (৭১২খ্রিঃ) মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে খলিফা 'উমর (রাঃ) এর শাসনামলে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকেই সিন্ধু অভিযান শুরু হয়।[৬১] সমসাময়িক ঐতিহাসিক বালাযুরী তাঁর 'ফতহুল বুলদান' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 'উসমান ইবনে আবুল 'আস-সাকাফী ১৫ হিজরীতেই বাহরাইন ও ওমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর আপন ভাই হাকামকে বাহরাইনে রেখে নিজে ওমান চলে যান। সেখান থেকে একটি সেনাবাহিনী

---

[৫৭]. *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৪০; *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, পৃ. ২১২; মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯।

[৫৮]. আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, *কোফরস্থানে ইসলাম*, উদ্ধৃতঃ দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম হোসেন তর্কবাগীশ, *উত্তর বঙ্গের আওলিয়া প্রসঙ্গ*, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭), পৃ. ২১।

[৫৯]. শ. ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ই. ফা. বা., ১৯৯২), পৃ. ৪০।

[৬০]. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৪১।

[৬১]. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ভারত সীমান্তে প্রেরণ করেন।[৬২] উল্লেখ্য, এই সেনাদলটি তিনি ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রপথে খলীফা 'উমরের শাসনামলে[৬৩] বোম্বের তান/ থানা নামক স্থানে প্রেরণ করেছিলেন; এবং এটিই ছিল ভারতীয় জলসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরির অভিযান।[৬৪] উক্ত অভিযানের পর পুনরায় তিনি তার ভ্রাতা মুগীরাকে সেনাবাহিনীসহ দেবল (বর্তমান করাচী) অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুগীরা সিন্ধুর জলদস্যু ও তাদের সহায়ক শক্তিকে পরাজিত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[৬৫] ড: তারাচাঁদ সকীফী ও তাঁর ভাইয়ের নৌপথে সিন্ধু অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-হযরত 'উমর (রাঃ) এ অভিযান বন্ধ করতে নির্দেশ দেন তখন স্থলপথে ভারতে প্রবেশের পথ খোঁজা হয়।[৬৬] হিজরী ৩৯ সালের প্রথমদিকে হযরত 'আলী (রাঃ) এর খিলাফতের সময় (৬৫৬-৬৬১ খ্রিঃ) তাঁর অনুমতিক্রমে হারিছ ইবনে মুররা আল-'আবদী সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে জয়ী হয়। তিনি বহু শত্রু সেনা বন্দি করেন এবং প্রচুর গণীমতের মালের অধিকারী হন।[৬৭] এরপর ৪৪ হিজরী সনে আমীর-মু'য়াবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে (৬৬১-৬৮০ খ্রিঃ) মুয়াল্লাব ইবন আবু সুফরা[৬৮] সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও

---

৬২. আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া বালাযুরী, *ফতহুল বুলদান*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৮), পৃ. ৪৪৩।

৬৩. ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন- The first recorded expedition was sent from omar to pillage the cost of India in the year-636-37 A.D. উদ্ধৃত: *মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৫।

৬৪. ডঃ তারাচাঁদ বলেন- ৬৩৬ খ্রিঃ প্রথম মুসলিম নৌবহর ভারতীয় জলসীমায় উপনীত হয়। তখন খলীফা 'উমরের শাসনামল। বাহরাইন ও ওমানের গভর্ণর 'উসমান সকীফি সমুদ্র পথে তান-এ সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। দ্র: Sturrock: South Kanara, ***Madras District Manuals***, p. 180; উদ্ধৃত: ডঃ তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, পৃ. ২৫-২৬।

৬৫. *ফতহুল বুলদান*, পৃ. ৪৪৩।

৬৬. ডঃ তারাচাঁদ বর্ণনা করেন- "ইবন সকীফী সমুদ্র পথে তান-এ সৈন্য প্রেরণ করলে খলীফা তাকে তিরস্কার করেন এবং সতর্ক করে দেন যে, এমন পরীক্ষামূলক কার্যের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার স্বজনদের পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে। প্রায় একই সময়ে ব্রোচ ও দুবলে অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু ওমরের নিষেধের ফলে সশস্ত্র অভিযান সাময়িক বন্ধ থাকে। তাঁর সময়ে স্থলপথে ভারতে পৌছার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয় এবং এ ব্যাপারে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অষ্টম শতকে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় ছিল সেই উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি।" দ্র: *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, পৃ. ২৬।

৬৭. *ফতহুল বুলদান*, পৃ. ৪৪৩; *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৩।

৬৮. মুয়াল্লাব ইবন আবূ সুফরার প্রকৃত নাম মহাল্লাব। পিতার নাম আবূ সুফরা, কুনিয়াত আবূ সা'ঈদ। তার বংশ পরিক্রমা হল- মুহাম্মদ ইবনে আবূ সুফরা জালিম ইবন সারিক ইবন সুবহ ইবন কিনদী ইবন 'আমর ইবন 'আদী ইবন ওয়ায়েল ইবনুল হারিছ ইবনুল 'আতিক ইবনুল আযদ আল-আতাকী আল-আযাদী আবূ সাঈদ আল বসরী। তিনি মক্কা বিজয়ের

Dhaka University Institutional Repository

আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।[৬৯] মুহাল্লাবের পর 'আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার, রাশিদ ইবন 'আমর জাদীদী, সিনান ইবন সালমাহ,[৭০] 'আব্বাস ইবন যিয়াদ ও মুনযীর ইবনে জারুদ 'আবদী বারবার হিন্দুস্তান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানে মুসলমানগণ কখনও সাফল্য আবার কখনও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। তবুও মুসলমানগণ ভারতজয়ের স্বপ্ন কখনও বিস্মৃত হতে পারেননি।[৭১] বলা বাহুল্য, ভারত অভিযান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দুটি হাদীস[৭২] প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণকে এ অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী করে।[৭৩] ফলে মুসলমানরা সাময়িক সাফল্য ও একাধিকবার ব্যর্থতার পরও ভারত অভিযান চালিয়ে এসেছেন। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে (৭১২ খ্রিঃ) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সকাফী[৭৪] ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর, তিনি মাত্র ১৭ বছরের যুবক স্বীয় ভাতিজা মুহাম্মদ ইবন কাসিম সাকাফীকে সেনাপতি করে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন।[৭৫] মুহাম্মদ ইবনে কাসিম

পূর্বে বা মক্কা বিজয়ের বছর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি ছিলেন এবং যোদ্ধা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার অবদান ছিল। তিনি ৮২ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ ইবন হাজার আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব,* ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৯৯৫ইং/১৪১৫হিঃ), পৃ. ৬০৬।

৬৯. *ফতহুল বুলদান,* পৃ. ৪৪৪।

৭০. সিনান ইবন সালামাহ এর প্রকৃত নাম সিনান, পিতার নাম সালামাহ, কুনিয়াত আবু বিশর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল সিনান ইবন সালামাহ ইবনুল মুহাব্বাক আবু আব্দুর রহমান। তবে কেউ কেউ তাকে আবু যুবাইর বলে ডাকতেন। ৫০ হিজরীতে সিন্ধু অভিযানে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউছুফের শাসনামলের শেষের দিকে ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ *তাহযীবুত তাহযীব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১ এবং ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭-২৮।

৭১. *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ৭১-৭২; আব্দুল গফুর, মহানবীর যুগে উপমহাদেশে ইসলাম, *অগ্রপথিক,* সীরাতুন্নবী (সঃ) সংখ্যা, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫২-৫৪।

৭২. হাদীস দুটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭৩. কাজী আতাহার মুবারকপুরী, *খুলাফায়ে রাশেদীন আওর হিন্দুস্তান* (দিল্লীঃ ১৯৭২), পৃ. ৩৬।

৭৪. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফীর প্রকৃত নাম হাজ্জাজ, পিতার নাম ইউসুফ, তার বংশ পরিক্রমা আস-সাকাফী আবূ মুহাম্মদ ইবন আবী ইয়াকুব আল-বাগদাদী। তিনি কবি আবূ নুয়াসের সাথি ছিলেন এবং নিজেও একজন কবি ছিলেন। এজন্য তিনি 'ইবনুশ শায়ির' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ শাসক ছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। ২০ বছর বয়সে তিনি ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পচিালনা করেন। তিনি ২৫৯ হিজরী সনের রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ *তাহযীবুত তাহযীব,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬ এবং ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ইবনে হাজার আসকালানী, *এসাবা ফী তামিজ আস সাহাবা,* ১ম খণ্ড (মিশরঃ দারু এহইয়াউত তারাসীল আরবী, ১৩২৪ হিঃ), পৃ. ৭০৭; ইবনুল আসির, *উসদুল গাবা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৭৫. মুহাম্মদ বিন কাশিমের অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণাবলি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিলাধুরী যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এই সব দেশে তখন মুসলমানরা বসবাস করছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শ্রীলংকার রাজা

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র সিন্ধু জয় করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং অবশেষে এ শহরটিও অধিকারে আনেন।[৭৬] এ অভিযানে তাঁর সঙ্গে চার হাজার ভারতীয় জাট সৈন্যও ছিল।

এভাবে দেখা যায় হিজরী প্রথম শতকেই ইসলাম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে ইসলামের আগমন সহজতর করে দেয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম যে নগর জয় করতেন সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। তিনি দেবল (করাচী) জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন, মুসলমানদেরকে জায়গির দান করেন এবং চার হাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। যদিও সিন্ধু বিজয়ের পূর্ব থেকেই স্থলপথে ভারতে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়, তথাপি মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের পর এ আগমন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসার দ্রুততর হয়। ফলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে নির্যাতিত বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৭৭] অষ্টম শতকের বাংলার বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করে রাজধানী কান্যকুঞ্জে এক বিরাট রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মালদহের নিকটবর্তী খালিসপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্র শাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর এ রাজ্যাভিষেক দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি গান্ধার ও কীর প্রভৃতি দেশের রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন।[৭৮] এ রাজ্যগুলোর মধ্যে যবন রাজ্যটি সম্ভবত সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোন মুসলমান অধিকৃত রাজ্য ছিল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[৭৯] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকে সিন্ধুর মুসলিম শাসকের সাথে বঙ্গরাজ তথা বাংলার যোগাযোগ ছিল। অনুমান করা হয় মুসলিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে দূত বিনিময় হত। বাগদাদে তখন ছিল খলীফা হারুনুর রশিদের রাজত্বকাল

উপহার স্বরূপ হাজ্জাজ এর কাছে কতিপয় বালিকা প্রেরণ করেন। এরা শ্রীলংকায় জন্মগ্রহণ করে। এই বালিকারা ছিল সেখানে মৃত্যুবরণকারী বণিকদের অনাথ সন্তান। বওয়ারিজ নামক কবছ অঞ্চলের উপজাতীয় জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করে মেয়েদের ছিনিয়ে নেয়। হাজ্জাজ দাহিরের কাছে মেয়েদের মুক্তি দাবি করেন। কিন্তু দাহির তাদের মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। পরিণামে হাজ্জাজ কাসিম এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। cf. Elliot, ***History of India***, Vol-1, p. 118; উদ্ধৃত: *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, পৃ. ২৬।

৭৬. *ফতহুল বুলদান*, পৃ. ৪৪৭; *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৩; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭২।

৭৭. ফজলুল হাসান ইউছুপ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯২), পৃ. ৬১; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৩৭; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭২-৭৩।

৭৮. রমা প্রসাদ চন্দ্র, *গৌড় রজমালা* (কলিকাতা: নব ভারত পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৫), পৃ. ২৬; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭৩; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

(৭৮৬-৮০৯ খ্রিঃ), তাঁর রাজ্যসীমা মাকরান থেকে সিন্ধু দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাজেই সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের যে নৃপতি ধর্মপালের দরবারে এসেছিলেন তিনি সম্ভবত হারুনুর রশিদের নিযুক্ত কোন গভর্ণর ছিলেন। এ হিসেবে হারুনুর-রশিদের সাথে ধর্মপালের যোগাযোগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়। সুতরাং এসময় বাগদাদ ও বাংলার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে অনুমিত হয়। এমনকি বাগদাদ ও বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যার ফলে উভয় দেশের মণীষী ও পণ্ডিতবর্গ বন্ধু দেশে গমন করে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।[৮০] বিশপ জন এম. এ সোবহান তাঁর "Suffism its saints and shrines" শীর্ষক গ্রন্থে বাগদাদ ও বাংলা উভয় দেশের মণীষীদের পরস্পর পরস্পরের দেশে যাতায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, খলীফা হারুনুর রশিদের সময় বঙ্গ দেশ তথা উত্তরাঞ্চলে যে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল তা রাজশাহীর পাহাড়পুর ও ত্রিপুরা জেলার ময়নামতিতে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে সহজেই প্রমাণিত হয়।[৮১]

বঙ্গে সূফী, 'আলিম-মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার ঃ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই বঙ্গদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসে।[৮২] তবে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে ইসলামের

---

[৭৯]. শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ, পৃ. ৪৩-৪৪; উদ্ধৃতঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭৩; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৩৮।

[৮০]. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭৩-৭৪।

[৮১]. প্রত্নতাত্ত্বিকদের খনন কার্যের ফলে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে (বর্তমান নওগাঁ জেলার অন্তর্গত) এবং ত্রিপুরা জেলার ময়নামতিতে 'আব্বাসীয় খলিফাদের একটি করে রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন-উর-রশিদ কর্তৃক মুহাম্মাদিয়া টাকশাল হতে উৎকীর্ণহয়। ..... পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির উপর নির্ভর করে ডঃ এনামুল হক বলেন- "হিন্দু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব-পারস্যের মুসলিম সাধক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস এরূপ কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলিফার এই মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবত যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে তথায় প্রচার করতে গমন করেন তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল। যে রূপেই হোক পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত খলিফার এই মুদ্রাটি অন্তত খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের সাথে ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করেছে। দ্রঃ ডঃ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, পৃ. ১২; উদ্ধৃতঃ *বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল*, পৃ. ৫১।

[৮২]. খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই যে ইসলামের অমিয় বাণী বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এ ধরনের এক প্রাচীন ইতিহাসের জলন্ত স্বাক্ষর লালমনিরহাট জেলায় ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়া থেকে পাওয়া যায়। রংপুর শহর থেকে প্রায় বিশমাইল দূরে লালমনিরহাটে সদর উপজেলায় পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজায় মজদের আড়া (মঙ্গলময় স্থান) নামক গ্রামে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। কারবালায় নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের মাত্র ৮ বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর পূর্বে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র 'আব্দুল মালিকের শাসনামলের এই মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। এ মসজিদটি খ্রিস্টীয় সপ্তম

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার-প্রসার সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে কখন কারা কিভাবে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন তাদের সকলের বিবরণ নিশ্চিত জানা যায় না। অবশ্য একাদশ শতাব্দী থেকে এদেশে ইসলাম প্রসারের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে একথাও সত্য যে, একাদশ শতকের আগে থেকেও দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের প্রচার হয়েছিল। বস্তুত একাদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই সাতশো বছর এদেশে ইসলাম প্রচারের একটি সমৃদ্ধ যুগ। এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশের চারদিকে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে ও মুসলিমের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অচিরেই এ উর্বর এলাকায় শ্রেষ্ঠ ধর্মের রূপলাভ করে।

এ সময় 'আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া, ও উত্তর ভারত থেকে আগত যেসব 'আলিম, মুজাহিদ ও সুফীয়ায়ে কিরামের অক্লান্ত সাধনা (ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর (১২০৪ খ্রিঃ) বঙ্গ বিজয়ে পূর্ব পর্যন্ত) এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করেছে তাঁদের সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলঃ

এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন- হযরত শাহ সুলতান বলখী[৮৩] মাহীসওয়ার[৮৪]। তিনি সন্দীপে কিছুকাল অবস্থানের পর প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরামনগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থান[৮৫] বা মস্তানগড়ে [৮৬] ইসলাম প্রচার করেন।[৮৭] এখানকার রাজা পরশুরাম ও তার ভগ্নী শিলাদেবীর

শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের অস্তিত্বের ইতহাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। দ্রঃ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বাংলা ও বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, পৃ. ১০৮; উদ্ধৃতঃ যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, পৃ. ৪২-৪৩।

৮৩. হযরত শাহ সুলতান বলখী সমুদ্র পথে বাংলায় আগমন করেন। অনুমান করা হয় তিনি ছিলেন বলখের যুবরাজ, প্রাসাদের বিলাস-ব্যাসন ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে তিনি ইসলামের খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন। পার্থিবতা পরিহার করার পর তিনি দামেস্কের শেখ তৌফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর শেখ তৌফিক তাঁকে ধর্মের সেবার জন্যে বাংলার অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে প্রেরণ করেন। দ্রঃ ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড (১২০৩-১৫৭৬), অনু: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম পুনমূদ্রণ, এপ্রিল-১৯৯৫), পৃ. ৭৪।

৮৪. কথিত আছে- সুলতান বলখী মৎসাকৃতি নৌকায় চড়ে এদেশে আগমন করেন বলে তাঁকে মাহী সাওয়ার বা মৎস্যারোহী বলা হয়। দ্রঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৭৮; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪; ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ" শিরোনামে লিখেন- প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মৎস্যাকৃতির বাণিজ্য জাহাজে চড়ে সমুদ্র পথ অতিক্রম করেন। আরব বণিকরা তাকে তার অনুরোধে সন্দীপে নামিয়ে দেন। সেখানকার অধিবাসীরা তাকে মৎস্যাকৃতির জাহাজে আসা দেখে পীর মাহীসাওয়ার বলে সম্বোধন করেন। দ্রঃ *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,* পৃ. ৪৩।

৮৫. 'মহাস্থান' অর্থ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ জায়গা। হাজার হাজার বছর থেকে এ স্থানটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বলে এর নাম 'মহাস্থান' বলে অনেকে মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন স্থানটির আসল নাম 'মহাস্নান' অর্থাৎ বিখ্যাত স্নানের জায়গা। দ্রঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৮০; বৌদ্ধ আমল থেকে এ স্থানটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শাসন কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা নিহত এবং শিলাদেবী করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[৮৮] বগুড়ার মহাস্থান গড়ে শাহ সুলতান মাহী সওয়ারের মাজার বিদ্যমান।[৮৯]

বঙ্গে ইসলাম প্রচারের আরো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী। তিনি ৪০৫ হিজরী মুতাবিক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন ময়মনসিংহের নেত্রকোনার মদনপুরে কতিপয় শিষ্যসহ আগমন করেন। [৯০] এখানেই (মদনপুরে) তার মাযার অবস্থিত।[৯১] কথিত আছে তার আধ্যাত্মিক শক্তিতে

হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল। পরে শক্তি ও শৈব রাজাদের চেষ্টায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংস হয়। দ্রঃ *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৪৪।

[৮৬]. কারো মতে এ স্থানটির নাম মহাস্থান গড় নয়, মস্তানগড়। স্থানীয় মুসলিমগণ স্থানটিকে এ নামেই আখ্যায়িত করে থাকেন। কেননা তারা ব্রিটিশ আমলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফকিব আন্দোলনের নেতা মজনুশাহ মস্তানের নামানুসারে স্থানটি "মস্তান গড়" নামে প্রসিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন। এ ফকির সরদার ১৭৬৩ সাল থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ে মহাস্থান/ মস্তানগড়কে তার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রভূমি ও দূর্গ হিসেবে ব্যবহার করেন। যে কারণে অনেকে এ স্থানকে মস্তানগড় নামে খ্যাত বলে মনে করেন। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৮১।

[৮৭]. শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার ৪৩৯ হিজরী মুতাবিক ১০৪৭ খ্রিঃ মহাস্থানে এসেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই তবে তিনি যে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই এখানে আসেন এবং ইসলাম প্রচার করেন এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

[৮৮]. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) অনু: মোকাদ্দেসুর রহমনা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন- ১৯৯৩), পৃ. ১৩২; রাজা পরশুরাম ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত ও অত্যাচারী শাসক। জনশ্রুতি আছে, তিনি অত্যাচারী ছিলেন এবং মুসলিম প্রজাদের প্রতি ছিলেন খুবই কঠোর। ফলে জনসাধারণ অসন্তোষে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এ থেকে H. Beverige অনুমান করেছেন যে, রাজার এহেন অত্যাচার ও গোড়ামির বিরুদ্ধেই শাহ সুলতান মাহী সাওয়ার জনগণের একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এ গণ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। দ্রঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৪৪; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৮২।

[৮৯]. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক* (ঢাকা: জাতীয় পুণর্গঠন সংস্থা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৬৫), পৃ. ২০; ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, Vol-1, No-1; *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১৩২।

[৯০]. এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, পৃ. ১৩৫; ***District Gazetteer***, Mymensingh, 1917, p. 152; হিজরী ১০৮২ সাল মুতাবিক ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র বাংলার সুবাদার শাহ সুজা এক সনদপত্রের বলে সুলতান রুমীর মাযার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক জমি জমাসহ সমগ্র মদনপুর গ্রামের অধিকার মাযারের মুতা ওয়াল্লীর বরাবরে দানের স্বীকৃতি দেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত উক্ত শাহী সনদে উল্লেখ আছে যে, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ৪০৫ হিজরী মোতাবেক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মুর্শিদ সায়্যিদ শাহ সুরখল আনতিয়াহ এর সঙ্গে নেত্রকোণার মদনপুরে আসেন। দ্রঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৮৩; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৪৬-৪৭; চৌধুরী শামসুর রহমান, *সূফী-তত্ত্বের মর্মকথা* (ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিস, ১ম সং, ১৯৭০), পৃ. ১৬৯।

[৯১]. *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১৩১; *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (১ম খণ্ড), পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন জনৈক কোচরাজ ইসলাম গ্রহণ করেন ফলে সভাসদসহ জনসাধারণের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদনপুর গ্রামখানি সুফী-দরবেশকে দান করেন।[৯২]

হযরত শাহ সুলতান বলখী (রঃ) এর মহাস্থান বিজয়ের পর যে সকল দরবেশ ইসলাম প্রচারের মানসে পূর্ব বাংলায় আসেন তাঁদের মধ্যে হযরত বাবা আদম শাহ শহীদ (রঃ)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে বাবা আদম শাহ কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে আছেন।[৯৩] অন্যান্য সুফী-দরবেশদের ন্যায় কিছু সঙ্গী সাথিসহ তিনি আসেননি বরং একটি ছোট-খাটো সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলার মাটিতে আস্তানা গেড়েছিলেন। ইতিহাসের বিচারে এটা কতদূর সত্য সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।[৯৪] কথিত আছে রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খ্রিঃ) গো কুরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জ যাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কাহিনী শুনে বাবা আদম শহীদ একটি ছোটখাটো বাহিনী নিয়ে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত 'আব্দুল্লাহপুর গ্রামে আস্তানা স্থাপন করেন। অত:পর আহার্যের আয়োজন করত সৈন্যরা একটি গরু জবেহ করে।[৯৫] ঘটনাক্রমে একটি চিল কর্তৃক এক টুকরো গোস্ত রাজদরবারে গিয়ে পড়লে রাজা বল্লাল সেনের সাথে বাবা আদম শহীদের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে বাবা আদম শহীদ হন[৯৬] এবং বল্লাল সেনও যুদ্ধ শেষে ঘটনাক্রমে আগুনে পুড়ে প্রাণ

---

৯২. ***District Gazetteer***, Mymensingh, 1917, p. 152; *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পৃ. ২০; *সূফী তত্ত্বের মর্মকথা*, পৃ. ১৭০; *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৮৩-৮৪।

৯৩. *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৪৮।

৯৪. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর আগে সৈন্য সামন্ত নিয়ে এদেশে কোন মুসলিমের আগমন কতখানি বাস্তবধর্মী তা নিশ্চিত বলা যায়না। আমাদের দেশের কোন ইতিহাসে বা ইরানের কোন ঐতিহাসিক ঘটনায় এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায়না। হতে পারে বাবা আদম শহীদ (রহঃ) এ দেশে আসার পর তাঁর কতিপয় মুরীদ বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন বশত তার নেতৃত্বে ছোটখাটো যুদ্ধ করেছেন। আর তাতেই তার নাম হয়েছে সেনাপতি এবং প্রচারিত হয়েছে তিনি সৈন্যসহ এদেশে এসেছিলেন। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

৯৫. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

৯৬. বাবা আদমের শহীদ হওয়ার ঘটনাটি এরূপ যে, রাজা বল্লাল সেনের বাহিনীর সাথে মুসলমানদের ১৫দিন ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে মুসলমানরা সাহস ও বীরত্বের সাথে হিন্দুদের পরাভূত করতে থাকে। কিন্তু রাজা এ সময় নিজেই মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুসলিম সেনারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনা বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে বাবা আদম তার অসাধারণ শৌর্য ও বিক্রমের পরিচয় দিয়ে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর শাহাদত নিকটবর্তী। কাজেই তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর শেষ নামাজে রত হলেন। এই সুযোগে রাজা তাঁর ঘাড়ে তরবারির আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাজার আঘাত বাবা আদমের ঘাড়ে একটু আচড় কাটলোনা, বরং, বাবা আদম তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

বিসর্জন দেন।[৯৭] 'আব্দুল্লাহপুরে বাবা আদমের মাজার ও একটি মসজিদ রয়েছে।[৯৮]

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে উত্তরবঙ্গে যে সকল ওলী-দরবেশের আগমন ঘটে তাঁদের মধ্যে শাহ মাখদুম রূপোশ[৯৯] (রঃ) এর নাম চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি সম্ভবত ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তুর্কীদের বাংলা অভিযানের পূর্বে যেসব ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করে সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে এদেশে ইসলামের ভিত গড়ে তুলেছিলেন শাহ মাখদুম রূপোশ (রঃ) তাঁদের অন্যতম। এ কারণে শাহ মাখদুম রূপোশ (রঃ) কে উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারকদের অগ্রপথিক বলা হয়ে থাকে।[১০০]

বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঃ

বঙ্গে ইসলাম প্রচারে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় যার অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। তিনি হলেন ইখতিয়ার

নামাজ পড়ে যেতে লাগলেন অবশেষে নামাজ শেষ করার পর বাবা আদম রাজাকে বললেন- নিজের তরবারি ত্যাগ করে আমার তরবারি নিয়ে ঘাড়ে আঘাত করুন তখন রাজা নির্দেশমত ঘাড়ে আঘাত করলে বাবা আদম শাহাদত বরণ করেন। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৮৫-৮৬।

৯৭. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol- No. 57, p. 12; কথিত আছে রাজা বল্লাল সেন যুদ্ধে বিজয় লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেননা। পরাজয় ঘটলে যাতে মুসলমান বাহিনীর হাতে রাজ পরিবারের মহিলাদের কোনরূপ অমর্যাদা না হতে পারে এজন্য তিনি যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রাজ অন্তঃপুরে একটি অগ্নিকুন্ড (চিতা) প্রজ্জ্বলিত করে যান এবং পরিবারস্থিত মহিলাদেরকে পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দেয়ার নির্দেশ দিয়ে যান। যুদ্ধে পরাজয়ের বার্তাবহন করার জন্য তিনি এক জোড়া সংকেতবাহী কবুতরকে পোষাকের নিচে সংগোপনে রেখে দেন। যুদ্ধে বল্লাল সেন জয় লাভ করলেও তাঁর শরীর থেকে রক্ত ধৌত করার সময় অজান্তেই কবুতর দুটি ছাড়া পেয়ে রাজপ্রাসাদে উড়ে আসে। প্রাসাদবাসী রমণীরা সংকেতবাহী কবুতর দেখে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে যখন প্রাসাদে পৌছান তখন সবশেষ। এ অনুশোচনায় তিনি উক্ত অগ্নিকান্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। দ্রঃ প্রাগুক্ত; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৯৯৩), পৃ. ৪৬-৪৭; *সূফী তত্ত্বের মর্মকথা*, পৃ. ১৭১-৭২; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৫০-৫১।

৯৮. এই আব্দুল্লাহপুর গ্রামে হযরত বাবা আদম শাহ (রহঃ) এর মাযার রয়েছে। মাযারের অদূরে আদম শহীদের মসজিদ নামে একটি জীর্ণশীর্ণ মসজিদও এ দরবেশের প্রচার কার্যের সাক্ষ্য দিচেছ। মসজিদে একটি শিলালিপি রয়েছে। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে (১৪৮২-১৪৮৭ খ্রিঃ) উৎকীর্ণ এ প্রস্তর লিপিটি 'আরবী ভাষায় লিখিত। এ লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি নির্মিত হয়েছে কোন সেনাপতি বা রাজপুরুষ 'কাফুর' কর্তৃক ৮৮৮ হিজরী মুতাবিক ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এ শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে, বাবা আদম শাহ (রহঃ) ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দের আগে বিদ্যমান ছিলেন। দরবেশের মৃত্যুর পরই তাঁর মাযার ও তাঁর নামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে বলে সকলেই অনুমান করেন। দ্রঃ *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৫১-৫২; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৮৭।

৯৯. রূপোশ শব্দটি ফার্সী। যার অর্থ অবগুণ্ঠিত মুখ। অর্থাৎ যিনি কোন নেকাব বা কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখেন। শাহ রূপোশ (রহঃ) একটি বড় রুমালে মাথা ও মুখ আবৃত করে রাখতেন বলে তাকে ঘুমটাওয়ালা বা রূপোশ নামে ডাকা হত। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১০৯।

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১০; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী। তিনি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে[১০১] তৎকালীন দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবেকের অনুপ্রেরণায় নদীয়া ও লক্ষণাবতী (লাখনৌতি) অভিযানে সফল হয়ে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এ বিজয়ের ফলে এদেশে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।[১০২]

এ সময় থেকে অব্যাহত গতিতে ভারতরে পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব ও তুরস্ক থেকে অসংখ্য পীর, দরবেশ, ওলী-আউলিয়া, সুফী-সাধক মুসলমান বাংলায় আগমন করতে থাকেন। অধিকাংশ এসেছিলেন সৈনিক হিসেবে অবশিষ্টাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলাম প্রচার ও আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে। এভাবে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[১০৩] বখতিয়ার বিজিত লাখনৌতি রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত পূর্ণিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা (পদ্মা) এবং পশ্চিমে কুশি নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত।[১০৪]

বখতিয়ার খলজী নদীয়া বিজয় করার পর স্বাভাবিকভাবেই নদীয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ তাঁর শাসনাধীনে আসে নদীয়া তথা কুষ্টিয়া, যশোর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল নদীয়া বিজয়ের ফলে তাঁর শাসনাধীনে এসে যায়। বখতিয়ার এসব এলাকায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন কিনা এবং কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা জানা যায়না। তবে নদীয়া বিজয়ের পর এ সকল অঞ্চলে

---

১০১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন ৩য় অধ্যায় ৫৪ পৃষ্ঠায় টিকা-৪৯।

১০২. ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন- For Bankhtyars occupation of a portion of the sena kingdom following his raid on Nadia is undisputed fact. cf.: Dr. A. B. M. Habibullah, ***The foundation fo Muslim Rule in India***, 2nd rivised ed. (Allahabad, India: 1961), p. 70; উদ্ধৃতঃ *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৫২।

১০৩. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ২১। এ সম্পর্কে S. M. Tailor বলেন- Another equally important factor about the increase of Muslim population was the missionary and proselytising zeal of the great sufis who preached the principles of Islam. In fact the missionary activities were first started by Arabs navigators and merchants long before the conquest of Bengal by Bakhtiyar Khalji. The sufis came from the west hazarding perilious journey and sacrificing everything dear and precious in life only to raise the degraded Hindus of Bangal to the high standard of Islamic civilization. The masses of Bengal were than groaning under the heels of the heaven born Brahmin oligarchy who used them helots and outcasts and denied them even the elementary rights of human beings. cf.: S. M. Tailor, ***Glimpses of old Dacca*** (Karachi, Vol-11, 1967), উদ্ধৃতঃ *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, পৃ. ৬-৭।

১০৪. যদুনাথ সরকার, *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের কর্তৃত্ব সংহত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মুগীস উদ্দীন যুজবাকের নদীয়া বিজয়ের পর থেকে যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুরের পশ্চিমাংশ, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল পুরোপুরি মুসলিম শাসনে আসে।[১০৫]

বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়ের পর থেকে বৃহত্তর যশোর জেলায় আউলিয়া দরবেশগণের আগমন হতে থাকে। তিনি নদীয়া দখল করে নদীয়ায় রাজধানী স্থাপন করলে হয়ত এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকার্য আরো বেশি তরান্বিত হত। কিন্তু তিনি নদীয়া দখলের পর গৌড়ে চলে যান। গৌড়ের অধিকাংশ স্বাধীন সুলতানগণ নিজেরা ইসলাম প্রচার করেননি তবে তারা ইসলাম প্রচারে যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। একথা সত্য যে, রাজশক্তি পশ্চাতে না থাকলে বাংলায় সূফ-আউলিয়া, দরবেশগণ এত ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন না এবং ইসলাম প্রচারে এমন সফলতাও আসত না।[১০৬] মূলত সূফী প্রচারকদের দ্বারাই বঙ্গদেশের আনাচে কানাচে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।[১০৭]

গৌড়ের সুলতানী আমলে যে সমস্ত বিখ্যাত দরবেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য তাদের মধ্যে মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ, হযরত মখদুম শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিজী জ্ঞান তাপস হযরত শেখ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা, হযরত শাহজালাল ইয়েমেনীসহ আরও অনেকে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

মাখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ ঃ

হযরত মাখদুম শাহদৌলা শহীদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের পাবনা জেলার শাহজাদপুরে আস্তানা স্থাপন করেন। কথিত আছে মাখদুম শাহ দৌলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর সাহাবী

---

১০৫. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৫২।

১০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

১০৭. প্রখ্যাত গবেষক মনে করেন- The Sufi saints and preachers and a large share in the spread of Islam in Bengal. By the refigious fervour, missionary zeal exemplary character and humanitarian activities, they greatly influenced the mind of the masses and attracted them to the faith of Islam. The khanqahs of the sufis which were established in every nook and corner of Bengal were great centre of spritual, humanitarian and intellectual activities and these had a significant role in the development of the Muslim Society in This Country. cf.: Edited by Board of Research, ***Islam in Bangladesh Through Ages*** (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995), p. 17.

Dhaka University Institutional Repository

ইয়ামানের শাসনকর্তা মু'য়াজ বিন জাবালের পুত্র ছিলেন।[১০৮] তিনি বাংলায় আসার পূর্বে বুখারায় গিয়ে জালাল উদ্দীন বুখারীর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবি জালাল উদ্দীন রুমীর শিক্ষক শামসুদ্দিন তাবরিজীর মুরীদ ছিলেন। তিনি মুর্শিদ ও পিতার অনুমতিক্রমে নিজের এক ভগ্নি, তিন ভাগিনেয় ও বহু অনুচরসহ ইয়েমেন থেকে বুখারা হয়ে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে[১০৯] শেষের দিকে বাংলায় আগমন করেন।[১১০] বাংলাদেশে পৌঁছে তিনি পাবনার শাহজাদপুরে আস্তানা স্থাপন করেন। এখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। প্রতিদিন তাঁর হাতে দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে তাঁর সাথে স্থানীয় হিন্দু রাজার যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করলেও শাহ মখদুম ও তার ২১জন অনুচর শহীদ হন।[১১১] তথাপি তাঁর অবশিষ্ট মুরীদগণের দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই পাবনা, বগুড়া আশে পাশের অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। শাহজাদপুরে[১১২] শাহ মখদুমের মাযারে আজও শত শত ভক্ত দর্শক সমবেত হয় এবং ইসলামের শান্তি প্রচারে তার আত্মত্যাগ ও শহীদী খুনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। দরগাহ সংলগ্ন মসজিদের জন্য মুসলমান শাসকরা ৭২২ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।[১১৩]

---

১০৮. কেউ কেউ মনে করেন, হযরত শাহ মখদুম শাহ দৌলা শহীদ হযরত আজাল্লা (রঃ) এর পুত্র ছিলেন। দ্রঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪; *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস,* পৃ. ১৩৩; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,* পৃ. ৫৪।

১০৯. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* পৃ. ১৫; জালালুদ্দীন বুখারী ১১৯৬ থেকে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে আইন-ই-আকবরী ও তাজকিরায় উল্লেখিত হয়েছে। আর শামছুদ্দীন তাবরিযী ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন বলে জানা যায়। তাহলে বলা যেতে পারে যে মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে বাংলায় আগমন করেন। কারণ জালালুদ্দীন বুখারী কমপক্ষে ৪০ বছর বয়:ক্রমের পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করতে পারেননি। যদি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ৪০ বছর বয়সের সময় মখদুম শাহ দৌলা শহীদ তাঁর সাথে সাক্ষাত করে থাকেন তাহলে শামছুদ্দীন তাবরিযী এরপরও সাত বছর বেঁচে ছিলেন। এক্ষেত্রে ১২০৪ এর পরেও তাঁর পক্ষে শামছ তাবরিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা সম্ভব। কাজেই সম্ভবত ১২৪০ খ্রিস্টাব্দের পরেই তিনি বাংলায় আগমন করেছিলেন। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ৯৩; ***Antiquity and Tradition of Sahjadpur, Journal of the Asiatic Society of Bengal***, part-1, no-3, 1904; উদ্ধৃত: *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,* পৃ. ৫৫।

১১০. *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ৯২।

১১১. *বাংলার ইতিহাস,* সুলতানী আমল, পৃ. ৬৪।

১১২. শাহ মখদুম ইয়েমেনের শাহজাদা ছিলেন তাই স্থানটির নাম শাহজাদপুর হয়েছে বলে অনুমিত হয়। দ্রঃ *পাকিস্তানের সূফী সাধক,* পৃ. ২১; *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

১১৩. ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, Vol-1, No-3, 1904, p. 267; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,* পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ জালালুদ্দীন তাবরিযী (রহ:) ঃ

বখতিয়ার খলজীর নদীয়া অভিযানের পর সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইয়ুজ খলজীর শাসনামলে (১২১৬-১২২০খ্রিঃ) শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (রঃ)[১১৪] তৎকালীন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায়[১১৫] এসে আস্তানা স্থাপন করেন। তিনি পারস্যের তাবরিয নগরে জন্মগ্রহণ করেন।[১১৬] মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) তার 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী, শায়খ আবূ সা'ঈদ তাবরিযীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শায়খ আবূ সা'ঈদ তাবরিযীর মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ গমন করেন। আর সেখানে শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন।[১১৭] বাগদাদে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। তিনি ব্যাপকভাবে আরব, ইরাক ও ইরান ভ্রমণ করেন। নিশাপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তারের (১১১৮-১২২৯ খ্রিঃ) সঙ্গে তার দেখা হয়।[১১৮] শায়খ জালালুদ্দীন পাণ্ডুয়া থেকে পনের মাইল ভিতরে দেওতলাতেই তার খানকাহ্ স্থাপন

---

[১১৪] বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরপরই ও সমসময়ে যে সকল সূফী দরবেশ এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন; হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন তাদের পথিকৃত। শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিজী একজন বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি উচচতম আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করেন। দ্রঃ *সিয়ারুল আরেফিন,* পৃ. ১৬৪; উদ্ধৃত: *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭; W. W. Hunter এ দরবেশকে মখদুম শাহজালাল নামে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ দিক থেকে পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের দিকে অগ্রসর হলে প্রথম যে দুটি জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল মখদুম শাহ জালাল (রহঃ) এর স্মৃতিস্তম্ভ এবং তার পৌত্র কুতুব শাহের স্মৃতিস্তম্ভ। এরা দু'জনই বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্বকালের স্বনামধন্য ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। cf.: W. W. Hunter, ***A Statistical Accounts of Bengal***, Vol-11, (1st Reprint in India, 1974), pp. 60-71.

[১১৫]. পাণ্ডুয়া লক্ষ্মণাবতী (লাখনৌতি) থেকে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পাণ্ডুয়ারই অপর নাম গৌড়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনের অনেক আগে থেকেই গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ৯৩।

[১১৬]. তিনি পারস্যের তাবরিয নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না। তাযকিরা-ই-আউলিয়া-ই হিন্দ ও আইন-ই আকবরী এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব। তবে লক্ষণ সেনের সভাপন্ডিত হলায়ুধ মিশ্র রচিত "শেখ শুভোদয়া" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে দাবি করা হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী ভারতের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশের "হটাওয়া" জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শেখ শুভোদয়ার বর্ণনার ভিত্তিতে ডঃ এনামুল হক শায়খ জালালুদ্দীন তারবিযীকে উত্তর ভারতের সূফী সাধকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার তাবরিযী উপাধিকে নিছক ঐতিহ্যগত ও বংশানুক্রমিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। cf.: Dr. Enamul Huq, ***A History of Sufism in Bengal***, p. 160-61; উদ্ধৃত: *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ৯৪-৯৫।

[১১৭]. *ফুওয়াইদ আল ফাওয়াদ* (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ১৪৬; *আখবারুল আখইয়ার,* পৃ. ৪৪; উদ্ধৃত: *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০; *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ৯৬।

[১১৮]. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০-৮১; *পাকিস্তানের সূফী সাধক,* পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। ৮৬৮ হিজরী মুতাবিক ১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি মসজিদের শিলালিপিতে এ অঞ্চলকে কসবা তাবরিযাবাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলা ও উড়িষ্যার স্বাধীন সুলতান সুলায়মান কররাণীর আমলে (১৫৬৫-১৫৭২খ্রিঃ) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ অঞ্চলকে সুস্পষ্টভাবে তাবরিযাবাদ ওরফে দেওতলা বলে উল্লেখ করেছেন।[১১৯] শুভোদয়া গ্রন্থে উল্লেখিত তাঁর সম্পর্কিত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা থেকে জানা যায় যে, শায়খ জালালুদ্দীন বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে এতবড় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন যে, বাংলার সর্বত্র এমনকি বাংলার বাইরেও মুসলিম বিশ্বে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। মোটকথা তিনি বাংলায় রাজধানীতে বসে একদিকে বাংলার শিক্ষিত ও প্রভিপত্তিশালী গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং অন্যদিকে সাধারণ সমাজের বৌদ্ধ, হিন্দু নির্বিশেষে সকল মানুষকে ইসলামের সত্যবাণীর প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকেন। বাংলায় সাধারণ মানুষ ও দরিদ্র শ্রেণীর জন্য তিনি সেবামূলক কর্মসূচীও গ্রহণ করেন। ব্লকম্যান তার Contribution to the Geography and History of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী ভিক্ষুক ও মুসাফিরদের জন্য একটি "লঙ্গরখানা" স্থাপন করেন। এভাবে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে তিনি প্রায় ২৩ বছরকাল একাধারে ইসলাম প্রচার করেন এবং বাংলার হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁর ব্যাপক ইসলাম প্রচারের ফলে লখনৌতি তথা বাংলার সমগ্র উত্তরাঞ্চলে মুসলিম সমাজের আকৃতি স্থীত হতে থাকে এবং সমসাময়িককালে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। শায়খ জালালউদ্দীনের মৃত্যুসন[১২০] ও মাযার[১২১] সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

---

[১১৯]. দেওতলা একটি গ্রাম। এটি গুরান মালদহ থেকে ২২ মাইল এবং পান্ডুয়া থেকে ১৫ মাইল উত্তরে মালদা-পান্ডুয়া দেবকোট-দিনাজপুর সড়কের উপর অবস্থিত। এটি দেবকোটের পুরাতন দূর্গ (একডালা বা বর্তমান গঙ্গারামপুর দামদুমা) থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে। দ্রঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২; এ সম্পর্কে মুন্সি আবিদ আলী খান বলেন- Fifteen miles north of pandua on the padshahi Road to Deukot and one and half miles south of the northern boundary of the Maldah District, is found an artificially raised area of land which in evidently from the name of the place Deotala, cf.: M. Abid Ali Khan, ***Memoirs of Gour and pandua*** (Calcutta: 1924), p. 67; উদ্ধৃত: *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,* পৃ. ৬৩।

[১২০]. খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ৭৩৮ হিজরী মুতাবিক ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ব্লকম্যান কোন প্রকার সূত্র উল্লেখ না করেই ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। খান সাহেব আবেদ আলী রচিত, Memoirs of Gour Pandua গ্রন্থের টীকাকার এইচ. ই. স্টেপেলটন ১৩৪৬/১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দকে তার মৃত্যু সন বলে অনুমান করেন। তবে শায়খ আব্দুল হক দেহলবী, আবুল ফজল, ফেরেশতা তার মৃত্যু সন সম্পর্কে নীরব। তাযকিরায় উল্লেখ করা হয়েছে- শায়খ জালালুদ্দীন ৬২২ হিজরীতে ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন; এবং এ

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা পরিবার পরিজন নিয়ে সোনারগাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম প্রচার ও সাধারণ শিক্ষা সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিষ্যদের জন্য তিনি একটি খানকাহ ও ছাত্রদের জন্য একটি বৃহৎ মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। বিখ্যাত এই সূফী পুরুষ ও পন্ডিতদের কাছে জ্ঞান লাভের নিমিত্তে বিপুল সংখ্যক শিষ্য ও শিক্ষার্থী সোনারগাঁয়ে সমবেত হতে শুরু করে। এভাবে সোনারগাঁ ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।[১২৪] শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা ৭০০ হিজরীতে (১৩০০ খ্রিঃ) ইন্তিকাল করেন। সোনারগাঁয়ে তাঁর সমাধি রচিত হয়।[১২৫]

হযরত শাহ্‌জালাল (রহঃ) ঃ

পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিমাংশে তথা সিলেটে ইসলাম প্রচারে শাহজালাল মুজাররদের দান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, তাঁর হাতে এদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।[১২৬] শায়খ শাহজালাল মুজাররদ (চিরকুমার) এশিয়া মাইনরের (বর্তমান এশিয়া-তুরস্ক) কুনিয়া শহরে (রূম) জন্মগ্রহণ করেন।[১২৭] অন্যদিকে "সুহাইল-ই ইয়ামান" নামক শাহজালাল সম্পর্কিত ফার্সী গ্রন্থে তাকে ইয়ামনের অধিবাসী বলা হয়েছে।[১২৮] তার পিতার নাম মুহাম্মদ এবং মাতা একজন

---

১২৪. *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ১২০-২১; *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪; *পাকিস্তানের সূফী সাধক,* পৃ. ২৫-২৬।

১২৫. *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,* পৃ. ৯৮; *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ১২৩; *পাকিস্তানের সূফী সাধক,* পৃ. ২৮।

১২৬. ইবনে বতুতা, *আযায়েবুল আসফার,* উর্দু অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩; প্রখ্যাত গবেষক নুরুল হক তাঁর সম্পর্কে বলেন-

Shaik Shah Jalal was a great saint, and remarkable was His contribution to the History of the Muslim of Bengal. He Shares the credit for the establisment of Muslim rule in northeast Bengal. It was because of His Missionary zeal and selfless service that Islam spread in the remote parts including a part of Assam and this area of Bengal could into a Muslim majority land. cf. ***Islam in Bangladesh Through Ages***, p. 27.

১২৭. হযরত শাহজালালের (রহঃ) জন্মস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) উৎকীর্ণ দু'খানা শিলালিপি থেকে আমরা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারি। সেখানে শায়খ জালাল মুজাররদ ইবনে মুহাম্মদ নামে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে তাঁর পিতার নাম পাওয়া যায় তবে জন্মস্থানের নাম পাওয়া যায়না। ৯১১ হিজরী (১৫০৫ খ্রিঃ) সনে উৎকীর্ণ হোসেন শাহী আমলের তৃতীয় একটি শিলালিপি জেমস ওয়াইজ আবিষ্কার করেন এবং হেনরি ব্লকম্যান কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়েছে- অর্থাৎ- উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম 'আবিদ... শায়খ শাহজালাল মুজাররাদ কুনয়ায়ী। এ থেকে জানা যায় তিনি কুনয়ায়ী/ কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম,* পৃ. ১৩২; *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩; ডঃ এম. এ. রহিম. "সুহাইল-ই-ইয়ামান' গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে নাসিরুদ্দীন নামক জনৈক মুন্সেফ কর্তৃক রচিত, "সুহায়েল-ই-ইয়ামন" গ্রন্থে সিলেটের দরবেশের জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এর বেশির ভাগই স্থানীয় প্রচলিত আখ্যানের উপর ভিত্তি করে লিখিত। এর লেখক খাদিম মুহিউদ্দীনের 'রিসালা' ও জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের রওজাত-আল-সালাতীন' নামক দুটি পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করেন এবং এদের থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি তিনি তার গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়্যিদা।[১২৯] বাল্যাবস্থায় তিনি পিতা মাতাকে হারান। ফলে তাঁর মাতুল বিখ্যাত সূফী সাইয়্যেদ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী তাঁর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি মামার সঙ্গে কাটান।[১৩০] গউসীর গুলজার-ই-আবরারের[১৩১] বিবরণ মতে- শাহজালাল তুর্কীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সৈয়দ আহমদ ইয়সভীর খলিফা ছিলেন। শাহজালাল প্রাচ্যদেশে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ধর্ম প্রচারের মনস্থ করলে তার পীর তাঁকে সাতশত শিষ্যসহ যাত্রা করার আদেশ দেন।[১৩২] তিনি যখন বাংলায় প্রবেশ করেন তখন এখানে ছিল সুলতান শামছুদ্দীন ফিরোজশাহের আমল (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ)। হযরত শাহজালাল তাঁর ৩৬০ জন শিষ্যসহ তৎকালে সাতগাঁও অঞ্চলে মুশরিক ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে রত ছিলেন। সিলেটে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শুনে তিনি তার ৩৬০ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিবেনী নামক স্থানে সিকান্দার খানের[১৩৩] সাথে যোগদেন।[১৩৪] এ যুদ্ধে সিলেটের তৎকালীন অত্যাচারী রাজা গৌর গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন।[১৩৫]

যদিও এর বর্ণনা অনেকটা কল্পনা প্রসূত, তথাপি, 'সুহাইল-ই-ইয়ামন-এর কিছু কিছু ঘটনার সমর্থন অন্যান্য সমসাময়িক বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং নিছক কল্পনা বলে একে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়া যায়না। দ্রঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১২৯. *পাকিস্তানের সূফী সাধক*, পৃ. ২৩।

১৩০. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৩৩।

১৩১. সূফী গউসী কর্তৃক লিখিত গুলজার-ই-আবরারেও শাহজালাল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়; গউসী শেখ আলী শেরের 'শরহ্-ই-নুজ-হাতুল-আরওয়াহ' নামক গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বনে শাহজালাল সম্বন্ধে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্রঃ *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ২০৩-৪।

১৩২. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০৪; গুলজার-ই-আবরার ও সুহাইল-ই-ইয়ামন-এর বর্ণনামতে শাহজালাল সারা তুর্কীস্তান, ইয়ামন, বাগদাদ ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ভ্রমণ শেষে দিল্লীতে এসে পৌছেন। সেখানে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬-১৩২৫ খ্রিঃ) কাছে কিছুদিন অবস্থান করার পর বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। কথিত আছে শায়খ নিজামুদ্দীন তাকে এক জোড়া কবুতর উপহার দেন। দ্রঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

১৩৩. সিকান্দার খান নাসির উদ্দীন বুগরা খানের (সুলতান বলবনের পুত্র) ও বাংলার সুলতান শামছুদ্দীন ফিরোজশাহের ভাগ্নে ছিলেন। দ্রঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

১৩৪. শাহজালালের সিলেটে আগমন সম্পর্কে সুহাইল-ই-ইয়ামনে বর্ণনা করা হয়েছে শেখ বুরহান উদ্দীন নামক একজন মুসলমানকে গরু যবেহের অপরাধে রাজা গৌর গোবিন্দ নির্মমভাবে অত্যাচার করলে শেখ বুরহানউদ্দীন গৌড়ের সুলতান শামছুদ্দীন ফিরোজ শাহের কাছে এর প্রতিকার চেয়ে পাঠান। সুলতান তার ভাগ্নে সেকেন্দার খানকে সিলেট আক্রমণ করার আদেশ দেন। কিন্তু তিনি (সেকেন্দার খান) গৌরগোবিন্দের কাছে তিন বার পরাজিত হওয়ার পর শামছুদ্দীন ফিরোজশাহ সাতগাঁওয়ের গভর্ণর নাসিরউদ্দীনকে সিকান্দার খানের সাহায্যার্থে গমনের নির্দেশ দেন। সাতগাঁওয়ের নিকটবর্তী ত্রিবেনী নামক স্থানে শাহজালার তার ৩৬৩ জন শিষ্যসহ নাসিরউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করেন। দ্রঃ *মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২০৪।

১৩৫. শাহজালালের সিলেট বিজয় সম্পর্কে 'গুলজার-ই-আবরার ও সুহাইল-ই ইয়ামন' গ্রন্থদ্বয় সম্পূর্ণ একমত। এ উভয় গ্রন্থে এবং হিন্দু আখ্যানে সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দের সাথে তার যুদ্ধের কথা উল্লেখ হয়েছে। ৯১৮ হিজরী সনে (১৫১২ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ বিজয়বার্তা সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- "শায়খুল মাশায়েখ মখদুম শায়খ জালাল মুজাররদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট (সিলেট) শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বিজয়ের পর শাহজালাল সেখানে অবস্থান করেন এবং ধর্মপ্রচার ও মানব সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে আমরা শাহজালালের কৃচ্ছসাধন, ধর্মনিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার পরিচয় জানতে পারি। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর রোযা রাখেন। তাঁর একটি গাভী ছিল, সেই গাভীর দুধই ছিল তাঁর খাদ্য। তিনি সাধারণত উপাসনায় মশগুল থাকতেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আরো বলেন- শাহজালালের শ্রমের ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয় আর সেকারণে তিনি তাদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ খানকাহ ছিল সাধু-দরবেশ, পরিব্রাজক ও গরীব-দু:খীদের নির্ভয় আশ্রয়স্থল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। বাংলার ঐতিহ্যের ইতিহাস ও অসংখ্য লোকগীতিতে এই অপূর্ব দীপ্তিমান সূফী-সাধকের স্মৃতি অমর হয়ে আছে। হযরত শাহ জালাল ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেড়'শ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সিলেটে তাঁর পবিত্র সমাধিভূমি সকল সম্প্রদায়ের ভক্তজনের তীর্থস্থান হয়ে আছে।[১৩৬]

যশোরে ইসলাম

যশোরে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ইতিহাসের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাবে যশোর জেলার প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক কে ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। অবশ্য সপ্তম শতাব্দীতে না হলেও অল্পকিছুকাল পরেই যে সমগ্র ভাটি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার হয় তা পূর্বের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে ৭১০/৭২০ হিজরীতে (১৩২১-২২খ্রিঃ) অংকিত একখানি রৌপ্যমুদ্রা থেকে খুলনা-যশোরে ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন সম্পর্কে জানা যায়। ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: ফ্রেঙ্ক খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা (বর্তমান জেলা) থেকে এই প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান দিয়েছেন। এ সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ)।[১৩৭] স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, মুঘিস উদ্দীন তুঘ্রিলের সময়ে (১২৬৮-১২৮১ খ্রিঃ) যশোর জেলা মুসলিম সালতানাতের অধীনে আসে। মুঘিস উদ্দীন তুঘ্রিল দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের অধীনে প্রথমে সুবাদার হিসেবে

ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দার খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজশাহ দেহলবীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩ খ্রিঃ)। cf.: *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1922, p. 413; *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

১৩৬. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় আসেন। আর এ বলবন শাহী সুলতানদের সমসময়ে প্রায় সারা বঙ্গে ইসলাম প্রচারক ও ওলী-দরবেশদের দ্বারা ছেয়ে যায়।[১৩৮] এই জোয়ারে যশোর অঞ্চলেও পীর গোরাচাঁদ, সৈয়দা রওশনারা মাক্কী, সাইয়্যেদ মুবারক গাযী ও বরাখান গাযীর ন্যায় প্রমুখ ওলী-দরবেশদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ঘটে। তবে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) (১৪৫৯ খ্রিঃ মৃত্যু) এ অঞ্চলে আগমনের মাধ্যমে যশোর জেলায় ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এ সকল মুবাল্লিগগণের জীবনালেখ্য সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল:

সাইয়্যেদ 'আব্বাস আলী মাক্কী ওরফে পীর গোরাচাঁদ (রহঃ) ঃ

বাংলার দক্ষিণাংশে বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সাথে প্রথমেই যে সাধক মুজাহিদের নাম বিশেষভাবে জড়িত তিনি হলেন সাইয়্যেদ আব্বাস আলী মাক্কী।[১৩৯] সাধারণ্যে তিনি পীর গোরাচাঁদ নামে পরিচিত।[১৪০] ৬৬৪ হিজরী সনে (১২৬৫ খ্রিঃ) মক্কা নগরে তাঁর জন্ম হয় বলে জানা যায়। তিনি ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লীতে পদার্পণ করেন এবং ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। তিনি চব্বিশ পরগণার হাড়োয়া এলাকায় স্থায়ী বসতি ও খানকাহ্ স্থাপন করে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত হন। চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমায় মুসলমানদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই পীরের চেষ্টা ও সাধনার ফল।[১৪১]

জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, পীর গোরাচাঁদ যখন চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন তখন স্থানীয় শক্তিশালী হিন্দু সামন্ত রাজা চন্দ্রকেতুর সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে তিনি তৎকালীন মুসলিম শাসনকর্তার (সম্ভবত সাতগাঁওয়ের তৎকালীন গভর্ণর মালিক ইজ্জুদ্দীন ইয়াহইয়া) সহায়তায় রাজা চন্দ্রকেতুকে পরাজিত ও নিহত করতে সমর্থ হন। অবশ্য এ যুদ্ধে তিনি আহত হয়ে

---

১৩৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিব, *যশোর জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ডিসে: ১৯৯১), পৃ. ৭।

১৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৯।

১৩৯. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১২৭।

১৪০. ডক্টর সুকুমার সেন হযরত পীর গোরাচাঁদকে নাম সাদৃশ্য শ্রী গৌরাঙ্গদেব মনে করেছেন। তার আসল নাম সৈয়দ 'আব্বাস আলী মক্কী। প্রকাশ্য নাম গোরাচাঁদ (রহঃ) মুনশী মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ কর্তৃক লিখিত "পীর গোরাচাঁদ" শীর্ষক পুঁথির ভাষ্যানুযায়ী তাঁর আসল নাম সায়্যিদ 'আব্বাস আলী, গোরাচাঁদ তার গৌরবর্ণের জন্য হিন্দু প্রদত্ত নাম। দ্রঃ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮-৭৫; কেউ কেউ মনে করেন তিনি দেখতে খুব সুন্দর গোরা ছিলেন বলে তাকে লোকেরা এ নামে অভিহিত করেছেন। দ্রঃ *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ১১০।

১৪১. *প্রাগুক্ত, বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

হাড়োয়ায় প্রত্যাবর্তন করার পর ইন্তিকাল করেন।[১৪২] চব্বিশ পরগণার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়ায় তাঁর মাযার রয়েছে।[১৪৩]

সায়্যিদা রওশন আরা মক্কী (রহঃ) ঃ

সায়্যিদা রওশন আরা মক্কী (রহঃ) হযরত আব্বাস আলী মক্কী ওরফে পীর গোরাচাঁদের কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। মক্কা নগরে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়।[১৪৪] তিনি ভ্রাতা 'আব্বাস আলীর সাথে প্রথমে দিল্লী ও পরে বাংলায় আগমন করেন। তিনি একজন শিক্ষিতা বিদুষী মহিলা ছিলেন। চব্বিশ পরগণা জেলায় তারাগুনিয়া গ্রামে অবস্থান করে তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন বলে জানা যায়। [১৪৫] ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৪৬]

পীর সায়্যিদ মুবারক আলী গাযী (রহঃ) ঃ

সুন্দরবন অঞ্চলের বিশাল কিংবদন্তীর নায়ক মুবারক গাযীর প্রভাব সর্বত্র পরিচিত। সমকালে অত্র এলাকায় অসংখ্য গাযী-দরবেশগণের আগমন ঘটায় তাঁদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।[১৪৭] তবে এই সব গাযী সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই যশোর-খুলনা তথা দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।[১৪৮]

---

১৪২. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১২৭।

১৪৩. গৌড়ের সুলতান আলউদ্দীন আলী শাহ পীর গোরাচাঁদের মাযারের উপর এক সমাধি সৌধ নির্মাণ করে দেন। প্রতি বছর ১২ই ফাল্গুন তার মাযারে ওরস উদযাপিত হয়। হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম নর-নারী এ ওরসে যোগ দেন। দ্রঃ *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ১১০।

১৪৪. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।

১৪৫. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১২৮।

১৪৬. *প্রাগুক্ত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯; Dr. Enamul Huq, ***A History of Sufism in Bengal***, Dhaka, 1975, pp. 236-37; উদ্ধৃতঃ *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ১১৬-১৭।

১৪৭. ডঃ গিরীন্দ্র নাথ দাস, তাঁর বাংলা পীর সাহিত্যের কথা-এ উল্লেখ করেছেন, পশ্চিম বাংলার পীর মুবারক আলী গাযী, মুবারক শাহ গাযী মবরা গাযী। গাযী সাহেব, গাযী বাবা, বড়খাঁ গাযী, পীর শাহ গাযী বিভিন্ন নামে পরিচিত। দ্রঃ ডঃ গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, কলকাতাঃ পৃ. ২২৪; ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "ইসলামী বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বড়খাঁ গাযী, ইসমাইল গাযী, ও সূফী খাঁ এ তিনজন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি আরো বলেন যে, চৌদ্দশতকের পীর সূফী খান ষোল শতকের দিকে বড় খাঁ গাযী হিসেবে পরিগণিত হন। দ্রঃ ডঃ সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৩৫৯ বাং, পৃ. ১০৬; এ প্রসঙ্গে ব্লকম্যান সাহেবের মত স্মরণযোগ্য; গাযী পীর হলেন পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ পীর জাফর খাঁ গাযীর পুত্র বড়খান গাযী। তিনি চৌদ্দশতকে জীবিত ছিলেন। cf. ***Journal***

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মুবারক গাযী একজন অভিজ্ঞ আলিম ও ধর্মবেত্তা ছিলেন এবং বহুদিন ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে তাকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এসব যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করে 'গাযী' উপাধিতে ভূষিত হন। জানা যায় যে, বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ নর-নারী তাঁর সান্নিধ্যে এলে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের মহাত্ম্যবার্তা শুনে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতেন।[১৪৯] হান্টার সাহেব তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন- 'মুবারক বা মোবরা গাযী সুন্দরবনের একাংশের ব্যাঘ্রনীতি নিবারণ করে সে প্রদেশের সকলের পুজনীয় হয়েছেন। মোবরা গাযীর দরগাহ নেই এমন গ্রাম পাওয়া দুস্কর।[১৫০]

হযরত বড়খান গাযী (রহঃ) ঃ

বড় খান গাযী সম্ভবত ত্রিবেনী বিজেতা উলুঘ-ই-আযম জাফর খাঁ গাযীর পুত্র।[১৫১] যশোর চব্বিশ পরগণা ও খুলনা অঞ্চলে এ মুসলিম মুজাহিদ সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। এমনকি

---

of the Asiatic Society of Bengal, 1870, pp. 280-82; তবে ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ সত্যপীর কাব্যে লিখেছেন-

"আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে
এসমাইল গাযী বন্দো গড় মান্দারনে।
বন্দির জেন্দাপীর কামা এর কুনি
বড়খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পান্ডুয়ার সাফিখায়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্য পীরের চরণ।"

ইসমাইল গাযী, সূফীখান ও জাফর খান গাযীকে এখানে ভিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে। এঁদের ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে প্রমাণ আছে। এঁদের সঙ্গে বড় খাঁ গাযীর উল্লেখ এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এঁদের সমসাময়িক অথবা অল্প আগে-পরের প্রভাবশালী একজন স্বতন্ত্র পীর ছিলেন। দ্রঃ ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক সংস্কৃতি*, পৃ. ২৩৯; উদ্ধৃত: *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৪৯।

১৪৮. His Kindness to Hidu Zamindars shows the generosity of his nature. He was always unimposing and he lived a very simple life. His forgiveness. to the arogant enemies proved his to lerant spirit and his refusal of any memorial is the humanity of his character. He was a true saint and fully deserves the honour shown to his memory. cf.: M. Abdul Qader, Mobra Gazi, *The observer*, Sunday magazin, Dhaka, May-14, 1967, p.vi; উদ্ধৃত: *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ১২৬।

১৪৯. ঐতিহাসিক সতীশ বাবু যথার্থই বলেছেন, এই গাযী সম্প্রদায় সকলেই হাতিয়া গড় অঞ্চল হতে আরম্ভ করে ক্রমে যশোর-খুলনার ভিতর প্রবেশ করে ধর্ম প্রচার করেছেন। ইসলাম ধর্ম স্রোতের গতি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে ক্রমে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, পৃ. ৪৪৩।

১৫০. W. W. Hunter, *A Statistical Accounts of Bengal*, Vol-1, p. 120.

১৫১. বড়খান গাযী (রহঃ) কে অনেকে ঘুটিয়ারীর মুবারক শাহ গাযী কিংবা শরীফ শাহ গাযী (রহঃ) এর সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন। ফলে বড়খান গাযীর পিতার নাম সেকান্দর শাহ উল্লেখ করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ ১৪৭ নং

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এ মুজাহিদের সাথে হিন্দু রাজাদের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাসের রায় মঙ্গলকাব্য ও পাচালীকার আব্দুর রহিম বিরচিত গাযী কালু চম্পাবতী কাব্যে বলা হয়েছে যে, যশোরের রাজা মুকুট রায় ও দক্ষিণ দেশের রাজা দক্ষিণা রায়ের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বড় খান গাযী জয়লাভ করেন। এ মুকুট রায় গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৮-১৩৯১ খ্রিঃ) আমলের সামন্ত রাজা মুকুট রায় হতে পারেন বলে অনুমান করা হয়।[১৫২] কথিত আছে "এই মুকুট রায়কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করার পর[১৫৩] তার সুন্দরী কন্যা চম্পাবতীর সাথে গাযীর বিবাহ হয়। আর গাযী কালু (গাযীর ভ্রাতা) ও চম্পাবতীকে নিয়ে বিভিন্ন পুঁথি, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক কিচ্ছা কাহিনীর প্রচলন এখনো গ্রাম বাংলার জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে। এই গাযী পীরের সময় ও স্থান সম্পর্কে নাসির হেলাল বর্ণনা করেছেন যে, গাযী সুন্দরবন ছেড়ে ছাপাই নগরে (বর্তমান বারবাজার) এসে পৌছান তখন এ অঞ্চলের রাজা ছিলেন শ্রীরাম। সম্ভবত এ অঞ্চলে খানজাহান আলী (রহ:) এর আগমনের পূর্বেই গাযী এ অঞ্চলে ইসলামের চাষ করেছিলেন।[১৫৪] এই মহান পুরুষ (প্রাক্তন সিলেটের) হবিগঞ্জ জেলার বিশগাঁও গ্রামে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। বিশগাঁওয়ের নাম গাজীর নামানুসারে গাজীপুর হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মাযার বিদ্যমান।[১৫৫] অপরদিকে বারবাজার তথা এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণ মনে করে গাজী-কালু ও

টিকায় উল্লেখিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্লকম্যান সাহেবের মত প্রনিধানযোগ্য। গাযী পীর হলেন পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ পীর জাফর খাঁ গাযীর পুত্র বড়খান গাযী। cf.: *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, part-1, No-iv, Calcutta: 1870, pp. 280-82.

১৫২. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৪২; রাজা মুকুট রায়ের রাজ্য উত্তর মহেশপুর হতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম দিকে ছিল গঙ্গা পর্যন্ত। তিনি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তার রাজ্যে কোন মুসলমান আসতে পারতনা। দ্রঃ নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৫৬।

১৫৩. পুঁথি বা অন্যান্য সূত্রে গাযীর সাথে চম্পাবতীর প্রেমঘটিত কারণে মুকুট রায়ের সাথে গাযীর যুদ্ধ হয় বলে উল্লেখ করা হলেও এই অভিমত সত্য নয়। বরং রাজা মুকুট রায় ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। মুসলমানদেরকে তিনি নানারকম অত্যাচার করতেন। গাযী রাজার এই বিদ্বেষের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে রাজা মুকুট রায় পরাজিত ও নিহত হয়। দ্রঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, *খুলনা জেলা* (খুলনাঃ জেলা প্রশাসন কার্যালয়, ১৯৮২), পৃ. ২৫২; উল্লেখ্য, যশোরের প্রাণকেন্দ্র দঁড়াটানার পাশে খুনিয়ার মাঠ নামক জায়গায় এই যুদ্ধ হয়। বলা হয়েছে-

বড় খা গাজীর সাথে,
মহাযুদ্ধ খনিয়াতে,
দোস্তালী হইল তারপর।

দ্রঃ মুহম্মদ আবূ তালিব, কিংবদন্তীর যশোর (ঢাকাঃ নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৩৯৫ বাং), পৃ. ১৩।

১৫৪. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৫২।

১৫৫. হোসেন উদ্দীন হোসেন, যশোরদ্য দেশ, পৃ. ১১৫; এ সম্বন্ধে জনাব আবদুর রহিম প্রণীত পুঁথিতে আছে-

বিশগাঁও আছে'সেই শ্রীহট্ট জিলায়
বাঘলয়ে শাহা গাজী রহিল তথায়।

চম্পাবতীর মাযার এই বারবাজারেই অবস্থিত। তাদের মতে যশোর-ঢাকা মহাসড়কের পূর্বদিকে বাদরগাছা মৌজায় বেড়দীঘি নামে (১২০০ ফুট× ১২০০ ফুট) যে বিশাল দীঘি আছে তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কবর তিনটিই তাঁদের।[১৫৬]

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) ঃ

যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামের ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামী সমাজ বিধি প্রবর্তনে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন উলুঘ খান-ই-জাহান বা খান জাহান আলী।[১৫৭] (এই দুই জেলায়) ব্যাপক প্রচলিত জনশ্রুতি এবং বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি সুলতান মাহমুদ শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই এ এলাকায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সাথে সাথে তার বিভিন্ন শিষ্য শাগরিদগণকেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে এতদঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।[১৫৮] তাঁর সমাধি বাগেরহাটের উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, তিনি নিতান্ত ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহ এবং তাঁর

কেহ কেহ বলে নাম গাজীপুর আর
হইয়াছে সেইখানে গাজীর মাজার
সর্বদা হাজী যায় সেইত মাজারে
হিন্দু মুসলমান যত মান্য সবে করে।

দ্রঃ আবদুর রহিম, *গাজীকালু চম্পাবতী*, পুঁথি, উদ্ধৃতঃ যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, পৃ. ৫৭-৫৮।

১৫৬. নাসির হেলাল, *কিংবন্তীর বারবাজার*, সাম্প্রতিক, অক্টোবর ১৯৮৯, পৃ. ১৫।

১৫৭. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৮৬; ডঃ শেখ গাউস মিয়া তাঁর নাম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)এর প্রকৃত নাম কি ছিল তা আজো জানা যায়নি। পীর খান জাহান আলী (রহঃ) বলে তিনি পরিচিত হলেও এটি তাঁর প্রকৃত নাম নয়। তাঁর মাজার গাত্রে খোদিত শিলালিপিতে তাঁর যে নাম পাওয়া যায় তা হল- উলুঘ খানেল আজম খান জাহান। "উলঘ" তুর্কী শব্দ। এটি সম্ভবত তাঁর উপাধি ছিল। আর খান জাহানও কোন নাম নয় বরং এটি তৎকালীন সুলতানী আমলে সম্রাট কর্তৃক সেনাপতিদেরকে দেয় উপাধি মাত্র। যদ্দূর জানা যায়, তিনি হয়ত ছিলেন খান জাহান বা মন্ত্রী। অর্থাৎ তিনি খান আল-আজম খান জাহান এবং উলুঘ খান জাহান উভয় উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দ্রঃ ডঃ শেখ গাউস মিয়া, *বাগেরহাটের ইতিহাস* (বাগেরাহাটঃ বেলায়েত হোসেন ফাউণ্ডেশন, ২০০১), পৃ. ৬৪-৬৫; বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- খান-ই-জাহান এটি একটি উপাধি এবং এর অর্থ হচেছ পৃথিবীর মহান খান। কিন্তু তিনি সর্বত্রই খান জাহান আলী খান ওরফে খাঞ্জালী খান সংক্ষেপে খাঞ্জালী নামে পরিচিত। শিলালিপিতে "উলুঘ খান-ই জাহানের পরে আলাইহে অর্থাৎ উপর শব্দটি আছে। খুব সম্ভব এ শব্দ থেকেই তাঁর আলী নাম এসেছে ভুলক্রমে। দ্রঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৩৪৩, টিকা নং-১।

১৫৮. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫; *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৮৬; ***Journal of the Asiatic Society of Pakistan***, 1867, Vol-36, p. 118.

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের প্রতি ভক্তিমান এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।[১৫৯] কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি? এ অঞ্চলে তাঁর আগমনের কারণ কি? উক্ত শিলালিপিতে তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়না। ফলে ঐতিহাসিকগণ তাঁর ব্যক্তি পরিচয় উদঘাটনের জন্য কলা-কৌশল, অনুমান-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।[১৬০] তবে সমাধিগাত্রে শিলালিপিতে বলা হয়েছে-আল্লাহর এক নগণ্য দাস, বিশ্ব প্রভূর অনুগ্রহ প্রত্যাশী, রাসূলে কারীম (সঃ) এর বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী "আলিমগণের বন্ধু, বিধর্মী মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী (তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক) হিজরী ৮৬৩ সালের ২৬শে

---

[১৫৯]. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

[১৬০]. ডক্টর এম. এ করিম-এর মতে খান জাহান মাহমুদ শাহের অধীনস্থ কর্মচারী এবং গৌড় সুলতানের নিকট হতে তিনি উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী "খান জাহান" সম্পর্কে ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৩ সালে মর্নিং নিউজ পত্রিকায় এবং ২৫শে মে ১৯৬২ সালে লাহোরের পাকিস্তান টাইমস-এ দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে খান জাহান দিল্লীর সুলতানের কর্মচারী ছিলেন, এবং দিল্লীর অরাজকতার সুযোগে তিনি বঙ্গে এসে ইসলাম প্রচার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্রঃ এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খণ্ড (প্রকাশক মেহদী বিল্লাহ, খুলনা, মার্চ ১৯৬৭), পৃ. ২৭৭; ডঃ গাউস মিয়া উল্লেখ করেছেন- সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, শর্কী রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খানজাহান আলী এবং বাগেরহাটের খানজাহান একই ব্যক্তি। তবে এ বক্তব্য ঠিক নয়। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ভিন্ন লোক। এ. এফ. এম. জলিলের মতে- বাগেরহাটের খানজাহান ফিরোজশাহ তুঘলকের মন্ত্রী খান-ই জাহান মকবুলের পৌত্র। তবে এ বিষয়ে তিনিও কোন জোরালো তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। ডঃ গাউস মিয়া বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করতঃ তাকে (খানজাহানকে) একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে চিহিত করেছেন। আর তাঁর পুরনো কর্মস্থল দিল্লী বা গৌড়ের রাজদরবার ছিল বলে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। দ্রঃ *বাগেরহাটের ইতিহাস*, পৃ. ৬৫; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া উল্লেখ করেছেন- "খান জাহান ছিলেন খুব সম্ভবত প্রথমে জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহের প্রতিনিধি (১৪১৭-৩২ খ্রিঃ)। এই জালাল উদ্দীনের সময় থেকে শুরু করে নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে একদম শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি যশোর খুলনা অঞ্চলে ছিলেন। দ্রঃ *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩৪৭; "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে জনৈক নীলকান্তের বরাত দিয়ে খানজাহানকে পাতশা নফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে-

খান জাহান মহামান পাতশা নফর
যশোর সনন্দলয়ে করিল সফর
তাঁর মুখ্য মহাপাত্র মাসুদ তাহির
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।

গ্রন্থকারের মতে- বাদশাহ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত হয়ে খানজাহান যশোর জেলায় আসেন। তাঁর হাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত মামুদ তাহির তাঁর প্রধানমন্ত্রী হন। দ্রঃ যশোর জেলায় ইসলাম, পৃ. ১৩; মুহাম্মদ আবূ তালিব সাহেব তার 'খুলনা জেলায় ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন- তিনি স্বাধীন সুলতান হোন অথবা নাই হোন তিনি যে গৌড়ের সুলতানের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন অতি উচ্চ স্তরের সূফী সাধক ছিলেন এতে কারো দ্বিমত নেই। খানজাহান উপাধি থেকে মনে হয় তিনি প্রথম জীবনে কোন সুলতান বা রাজার মন্ত্রী বা সেনাপতি ছিলেন। পরে নিম্নবঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য সুন্দরবন এলাকায় প্রেরিত হন। দ্রঃ অধ্যাপক আবূ তালিব, *খুলনা জেলায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৮), পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

যিলহজ্জ্ব বুধবার রাত্রে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে জান্নাতগামী হন।"[১৬১] শিলালিপিতে উল্লেখিত তারিখ থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন ছিল গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদশাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রিঃ) আমল। এ আমলেই হযরত খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন এবং সমগ্র এলাকার শাসনভার লাভ করেন। পয়গ্রাম কসবাতে তাঁর রাজধানী ছিল। কাজেই তিনি যে তদানীন্তন বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর ধর্মপ্রাণতা, সততা, জনসেবা ও চরিত্র মাধুর্য এ অঞ্চলের জনগণের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তাঁরা তাঁকে আল্লাহর একজন যথার্থ অনুগত বান্দা এবং সূফী ও দরবেশ মনে করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণের সামনে তিনি নিজেকে একজন যথার্থ মুসলমান হিসেবে তুলে ধরেন এবং জনগণের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে জনগণের সেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬২]

হযরত খান জাহান আলী বিখ্যাত দরবেশ নূর-কুতুব-উল আলমের শিষ্য ও ছাত্র ছিলেন। কথিত আছে- নূর-কুতুব-উল আলমের নির্দেশে খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন।[১৬৩] এছাড়া রাজ্য জয় বা শাসন করা তার উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়না।[১৬৪] খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর যাত্রা পথে তিনি প্রথমে যেখানে আস্তানা

---

১৬১. বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ১৮৬; খান জাহান আলী (রহঃ) এর মাজার গাত্রে উৎকীর্ণ দুটি শিলালিপিদ্বয়ের 'আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ: (১) هذه روضةٌ مباركةٌ من رياضِ الجنةِ لِخانِلِ عَظَمْ خَانْ اِىْ جَهَانْ عليهِ الرحمةُ وارضوان التحريرى
فى ستةِ عشرينَ من ذيلحجِ و َثلثُ ستينَ و ثمانينا مائتى ازمان–
(২) ইন্তিকালাল আবদুদ্দায়ীফ আল মুহতাজো ইলা রাহ্মাতি রাব্বিল আলামীন, আল মহিবুবলি আওলাদি সাঈদুল মুরসালিন, আল মুখলিসু লি-উলামাইর রাশিদীন, আল মুবগিদু লিল কুফফারে ওয়াল মুশরিকীন, আল মুইনু লিল ইসলামি ওয়াল মুসলিমীন, উলুঘ খান-ই জাহান আলইহির রাহমাতু আল গুফরান মিন দারিদ্দুনইয়া ইলা দারিল বাকা; লায়লাতুল আরবায়া ফী সিত্তাতি ওয়া ইশরীনা মিন যিলহজ্জ, ওয়া দুফিনা ইয়াওমাল খামসে ফী সাব'আতি ওয়া ইশরীনা মিনহু ফী সানাতি ছালাছা সিত্তাতি ওয়া সামানিয়াতা। দ্রঃ *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৫৮।

১৬২. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৮৬-৮৭।

১৬৩. এ সম্পর্কে জনাব সেলিম আহমদ বলেন- গৌড় অধিকারের পর হযরত নূর-ই কুতুব উল আলম কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত খান জাহান দক্ষিণ বঙ্গের দিকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য রওয়ানা দেন। দ্রঃ সেলিম আহমদ, *হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)*, পৃ. ৩; উদ্ধৃত: *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৬৭।

১৬৪. খান জাহান আলী (রহঃ) এর উদ্দেশ্য রাজ্য বিজয় বা শাসন করা ছিলনা, কেননা তিনি সুলতানী কায়দায় বিজয় স্তম্ভ বা মুদ্রার প্রচলন করে যাননি এবং দুনিয়ায় কারো অধীনতার কথা ঘোষণা করেননি। তিনি যা করেছেন তাতে তাঁকে একজন অতি উচচ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, অসাধারণ ঐশ্বর্যশালী মহান রাজ-দরবেশ হিসেবেই পরিচিত করে। এমনকি দেশবাসীর কাছে তিনি এ নামেই পরিচিত হয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, ইসলাম প্রচারই তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দ্রঃ *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৬১; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করেন সে স্থানটির নাম বারবাজার।[১৬৫] তিনি সম্ভবত গঙ্গা পার হয়ে নদীয়ার মধ্য দিয়ে ভৈরবের কূল ধরে এই ঐতিহাসিক[১৬৬] বারবাজারে উপনীত হয়েছিলেন।[১৬৭] তিনি উপমহাদেশের এই প্রাচীন স্থানকেই তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রথম মঞ্জিল হিসেবে বেছে নেন। উল্লেখ্য, খান জাহানের আগমনের পূর্বে এখানে হযরত বড় খান গাযী (গাযী-কালু চম্পাবতী) ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে এ স্থানকে বেছে নিয়েছিলেন।[১৬৮] এজন্য বারবাজারকে এ অঞ্চলের ইসলাম প্রচারের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বারবাজার প্রসিদ্ধ নগরী হলেও খান জাহান যখন এখানে আসেন তখন সম্ভবত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। খান জাহান

---

১৬৫. *বাগেরহাটের ইতিহাস*, পৃ. ৬৭; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৫৭; বর্তমান যশোরের ১১ মাইল উত্তরে যশোর-ঢাকা সড়কের নিকটবর্তী মৃত প্রায় ভৈরব নদের পাশে এ বারবাজার অবস্থিত। বারবাজারের নামকরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করেছেন- প্রবল জনশ্রুতি আছে হযরত বড় খান গাযীর সাথে বারজন আওলিয়া/সঙ্গী ছিলেন। সেখান থেকেই বারবাজার নামের উৎপত্তি। অথবা হযরত খানজাহান (রহঃ) এর সাথে এগারজন সহচর আওলিয়া সহ এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন বলে এ স্থানের নাম হয় বারবাজার। আবার এমনও হতে পারে এখানে ছোট ছোট বারটা বাজার ছিল; সেখান থেকে এ নামের উৎপত্তি অথবা এখানে একটি বড় বাজার ছিল। এই বড় বাজার থেকেই খুব সম্ভবত বারবাজার নাম হয়ে থাকবে। দ্রঃ নাসির হেলাল, *বারবাজারের ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৯; ঐতিহাসকি সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর "যশোহর খুলনার ইতিহাস" গ্রন্থে বারবাজারের নামকরণ সম্বন্ধে লিখেছেন- এদেশে যখন মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয় তখন তাদের প্রধান আস্তানা ছিল বারবাজার। যে বার আউলিয়া বা ফকীরগণ সুন্দরবন অঞ্চলে ধর্ম ও শস্যের আবাদ করতে এসেছিলেন তাদের প্রধান আড্ডা হয়েছিল এই বারবাজার। এই বারজন ফকীরের আস্তানার জন্য স্থানটির নাম রাখা হয়েছিল বারবাজার। দ্রঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খন্ড (কলিকাতাঃ শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় সং, ১৯৬৩), পৃ. ৩১৯; এ প্রাচীন নগরের একাংশের নাম ছাপাইনগর বা চাম্পাইনগর ছিল। *প্রাগুক্ত*।

১৬৬. ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বারবাজারের ঐতিহ্য অতি পুরাতন। এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন- বারবাজার ছিল সমতটের রাজধানী। তিনি এবং আব্দুল জলিল স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- অনেকের মতে হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে এখানে একটি বর্ধিষ্ণু শহর ছিল এবং এটি তাদের শাসনকেন্দ্র ছিল বলে অনুমান করা হয়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত গ্রীক ইতিহাসে পেরিপ্লাসে (Periplus of the Erythrean sea) বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী এ বারবাজারেই অবস্থিত ছিল। দ্রঃ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১; *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৭৭; *বারবাজারের ঐতিহ্য*, পৃ. ১৩; সেলিম আহমদ উল্লেখ করেন- হযরত খান জাহান যখন বারবাজার অবস্থান করছিলেন তখনও বারবাজার ছিল নামকরা বন্দর। হিন্দু ও'বৌদ্ধ শানামলেই এর বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বিশেষ করে এর পরিচিতি ছিল বৌদ্ধদের একটি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে। কথিত আছে বিখ্যাত বণিক চাঁদ সওদাগরের একটি বাণিজ্য কেন্দ্রও ছিল এই বারবাজারে। দ্রঃ *হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)*, পৃ. ৪; বারবাজার যে মৃত প্রাচীন নগরী তার আরো প্রমাণ হল "শ্রীরাম রাজার গড়বেষ্টিত রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট দীঘি তাঁর কীর্তি অদ্যাপী রক্ষা করছে। এই প্রাচীন শহরের যেখানে সেখানে প্রস্তর পড়ে আছে। দ্রঃ *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৭৮; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৬৯।

১৬৭. *বাগেরহাটের ইতিহাস*, পৃ. ৬৭।

১৬৮. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছাবার পরই এখানে ব্যাপক জনবসতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অবস্থানকালে তিনি ব্যাপক ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচুর সংখ্যক মানুষ তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[১৬৯] খানজাহান এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন অর্থাৎ- বেশ কয়েকটি দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। বারবাজারে যে একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি রয়েছে তা তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।[১৭০] এছাড়াও যে সকল মসজিদ উদ্ধার করা গেছে তা'হল- গোড়া মসজিদ, জোড় বাঙলার মসজিদ, চেরাগদানী মসজিদ, সাতগাছিয়ার মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৭১]

বারবাজারে কিছুকাল অবস্থানের পর খান জাহান সদলবলে ভৈরব তীর বেয়ে যশোরের মুরলী/ মুড়লী[১৭২] উপস্থিত হন। এখানে তিনি বেশি দিন অবস্থান করেননি তবুও তিনি এ স্থানে গড়ে তোলেন বেশ কিছু মসজিদ, খনন করেন কয়েকটি দীঘি ও পুকুর। মুড়লী থেকে হযরত খান জাহান আলীর অনুচরবর্গ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১৭৩] তাঁর নিজের নেতৃত্বে একটা দল ভৈরবের তীর ধরে পয়গ্রাম কসবা হয়ে বাগেরহাট পৌঁছান।[১৭৪] দ্বিতীয় দল কপোতাক্ষের গতিপথ ধরে সোজা দক্ষিণে সুন্দরবনের

---

১৬৯. *বাগেরহাটের ইতিহাস*, পৃ. ৬৭।

১৭০. বারবাজারের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি যে খানজাহানের দ্বারা নির্মিত তার প্রমাণ এফ. এম. আব্দুল জলিল উল্লেখ করেন- "বারবাজারের মসজিদটি একগম্বুজ বিশিষ্ট এবং এটি বাগেরহাটের পশ্চিমে রণবিজয়পুরে ফকীর বাড়ীতে অবস্থিত খানজাহানের অন্যতম মসজিদটির আকৃতি বিশিষ্ট। কেউ কেউ মসজিদটিকে মন্দির বলে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু বাগেরহাটে খানজাহানের স্থাপত্য শিল্প যারা লক্ষ্য করেছেন, তারা সহজেই বুঝতে পারবেন এটি কোন মন্দির নয় বরং খানজাহানের কীর্তি। সতীশ বাবুও এটিকেও মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৭৯-৮০।

১৭১. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৭০।

১৭২. মুড়লী/ মুরলী একটি ঐতিহাসিক স্থান। এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল সাহেব এ সম্পর্কে বলেন-মুরলী অতীব প্রাচীন স্থান। মুরলী এবং বারবাজারে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। খান জাহান এই স্থানের নামকরণ করেন মুরলী কসবা। "কসবা" ফার্সী শব্দ। এর অর্থ শহর। মুরলী বর্তমান শহর সংলগ্ন উপশহর। দ্রঃ *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৮০; মুড়লী সম্বন্ধে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখেছেন- মুড়লী বেশ প্রাচীন স্থান। প্রাচীনকালে এ স্থান চার-পাঁচ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। স্যার কানিংহাম অনুমান করেন যে, প্রাচীন সমতটরাজ্যের রাজধানী ছিল এই মুড়লীতে। দ্রঃ *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩২১; বর্তমানে মুড়লী যশোর শহরের উপকণ্ঠে খুলনা-সাতক্ষীরা এবং ঢাকা-খুলনা সড়কের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত।

১৭৩. *খুলনা জেলা*, পৃ. ২২২; *বাগেরহাটের ইতিহাস*, পৃ. ৬৭।

১৭৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিব বলেন- বারবাজার থেকে হযরত খান জাহান (রহঃ) ভৈরব নদের পাড় দিয়ে বাগেরহাটের দিকে যাত্রা করেছিলন সঙ্গে ছিল ষাটহাজার কোদালি বা কোদালধারী সৈনিক। তারা মুড়লী কসবা হয়ে পয়গ্রাম কসবায় যান। তার যাত্রা পথের স্থানে স্থানে মসজিদ, দীঘি, ইত্যাদি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন

Dhaka University Institutional Repository

দিকে বেদকাশী পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করে। এ দলের নেতৃত্ব দেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ।[১৭৫] আর তৃতীয় দল মুড়লীতে থেকে যায়। মুড়লীতে থেকে যাওয়া বাহিনীর নেতৃত্বে থাকেন বাহরাম শাহ ও গরীব শাহ।[১৭৬] মূলত যশোর-খুলনার সমগ্র এলাকা ছিল খানজাহান আলীর কর্মস্থল। এ অঞ্চলে তিনি ব্যাপক ইসলাম প্রচার করেন। বাগেরহাট শহরটি তারই নির্মিত এবং তিনি তার নামকরণ করেন খলিফাতাবাদ[১৭৭] খান জাহানের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ষাট গম্বুজ নামধারী বিশালাকায় মসজিদ[১৭৮] ও দরবার গৃহ এবং পার্শ্ববর্তী বিশাল বিস্তার ঘোড়াদীঘি।[১৭৯] তাই এ. এফ.এম. আব্দুল জলিল সাহেব যথার্থই

কথিত আছে খান জাহান বাগেরহাট যাত্রা পথে নিজেই নেতৃত্ব দিয়ে রাস্তা তৈরি; মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও দীঘি খনন করেন। কয়েকটি কসবা ও আবাসিক এলাকাও গড়ে তোলেন। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৮; হযরত খান জাহান তাঁর মুল বাহিনী নিয়ে পয়গ্রাম কসবায় আস্তানা স্থাপন করেন। পয়গ্রাম কসবায় প্রায় দশ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি পয়গ্রামের শাসনভার আবূ তাহির নামক এক নব দীক্ষিত মুসলিম যুবকের উপর অর্পণ করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত রাজধানী হাবেলী কসবায় (বর্তমান বাগের হাটের) দিকে রওয়ানা হন; উল্লেখ্য এই আবূ তাহির পরবর্তীকালে তার মুখ্য মহাপাত্র বা প্রধানমন্ত্রী রূপে পরিচিত হন। আর বাংলাদেশে পীরালী নামক এক অভিনব ইসলামী সংস্কৃতি ধারার উদ্ভব ঘটায়। দ্রঃ খুলনা জেলায় ইসলাম, পৃ. ৯০; *বাগেরহাটের ইতিহাস*, পৃ. ৬৮; পীরালী এর সম্পর্কে Islam in Bangladesh গ্রন্থে বলা হয়েছে- One of khan Jahans famous converts was a Brahim who took the name of Pir Ali Mohammad Taher. The relatives of Pir Ali were ostracised by the Hindu community becaus of Pir Alis conversion to Islam. From that time onwards the relatives of Hindus converted to Islam were called Pir Ali Hindus. cf.: U.A.B. Razia Akter Banu, ***Islam in Bangladesh*** (New York: E. J. Brill. 1992), p. 14.

১৭৫. এ সম্বন্ধে এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল তাঁর 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন- খানজাহানের যে বাহিনী যশোর হতে সুন্দরবনের দিকে প্রেরিত হয়েছিল তাঁর নেতা ছিলেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খা। তাঁর সুযোগ্য পুত্রের নাম ফতেহ খাঁ। পিতা-পুত্র উভয়ে ধর্মপ্রাণ ও কর্মনিপুন সৈনিক ছিলেন। তাঁরা পথিমধ্যে মসজিদ নির্মাণ জলাশয় খনন, জঙ্গল কর্তন ও ইসলাম প্রচার করতে করতে সুন্দরবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। পথিমধ্যে খানপুর ও বিদ্যানন্দকাঠি (বর্তমান কেশবপুর উপজেলার অন্তর্গত) যাত্রা বিরতি করে তথাকার বহু অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। আমাদি (বর্তমান তালা উপজেলায়) গ্রামে তারা একটি নয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। যার অস্তিত্ব আজও বিদ্যামন। দ্রঃ *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৮২।

১৭৬. বাহরাম শাহ ও গরীব শাহ এ অঞ্চলের লোকদিগকে ইসলামের আদর্শ দীক্ষা দিতেন। লোকে তাঁদেরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করত। এই দুই মহাত্মার মাযার এখনো যশোর শহরে বিদ্যমান আছে। গরীব শাহের মাযারের উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। দ্রঃ *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৮০-৮১।

১৭৭. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৮৮; খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। খলিফাতাবাদ শব্দের অর্থ প্রতিনিধির শহর। খানজাহান আলী গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন বলে জানা যায়। সম্ভবত এ কারণেই এ স্থানের নামকরণ করা হয় খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। দ্রঃ *বাগেরহাটের ইতিহাস*, পৃ. ১৭।

১৭৮. বিভাগপূর্ব বাংলাদশের মধ্যে ষাটগম্বুজ বৃহত্তম মসজিদ, এর দৈর্ঘ ১৬০ ফুট ও প্রস্থ ১০৮ ফুট। অভ্যন্তরভাগে গম্বুজের উচচতা ২২ ফুট। দ্রঃ *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১০৬; *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩৫৪।

১৭৯. ঘোড়াদীটিটি দৈর্ঘ ১০০০ হাত এবং প্রস্থ ৬০০ হাত। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন-"বিশালাকায় জলাশয় পাশে বিশালাকায় মসজিদ ও দরবার গৃহ উহার নির্মাণকর্তার অন্তরের বিশালতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়"।[১৮০]

খান জাহানের শিষ্যগণের অনেকেই সমসময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। এঁদের অধিকাংশ খুলনাভিমুখে ভৈরব নদ এবং সাতক্ষীরাভিমুখে কপোতাক্ষ নদের তীর বেয়ে তাঁদের প্রচার কার্য চালিয়েছেন।[১৮১] এঁদের মধ্যে সাতক্ষীরাভিমুখের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হল: পীর মেহের উদ্দীন, যাঁর ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ছিল কেশবপুর থানার মেহেরপুর গ্রামে।[১৮২] মেহেরপুরের দক্ষিণে তালা থানা এলাকাধীন মাগুরা গ্রামে পীর যয়েন উদ্দীন ওরফে পীর জয়ন্তী ইসলাম প্রচার করেন। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে।[১৮৩] মাগুরা থেকে কপোতাক্ষ তীর বেয়ে কিছুদূর অগ্রে সুজনশাহ নামক গ্রামে পীর সুজনশাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইসলাম প্রচার করেন। এখানে তাঁর দরগাহ ও মাযার রয়েছে।[১৮৪] খানজাহানের অন্যতম অনুসারী পীর খালাস খাঁ কপোতাক্ষ নদের পূর্বতীরে সুন্দরবনের বেদকাশী নামক স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। বেদকাশীতে খালাস খাঁর দীঘি নামে একটি বিশাল দীঘি আছে। এই দীঘিরই পাড়ে খালাস খাঁর মাজার রয়েছে।[১৮৫]

হযরত 'আরব শাহ (রহ:) ঃ

হযরত 'আরব শাহ (রহ:) শাহ মুহাম্মদ 'আরীফ-ই রব্বানী ওরফে 'আরব শাহ নামে পরিচিত। সম্ভবত 'আরব দেশাগত এবং অজ্ঞাতনামা বলে সাধারণ্যে তিনি 'আরব শাহ নামে পরিচিত হন। নামটি

---

১৮০. *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ৩০৪।

১৮১. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২১।

১৮২. ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোপালপুরে খান জাহানের জনৈক শিষ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। গোপালপুরের দক্ষিণে কপোতাক্ষকূলে পীর মেহের উদ্দীন নামে জনৈক দরবেশের মাযার অবস্থিত। মাযারটি পাকা ইমারতের। দ্রঃ *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৮৩।

১৮৩. তিনি হযরত খানজাহানের শিষ্য কিনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়না। তবে কেউ কেউ তাঁকে খানজাহানের অনুসারী বলে মন্তব্য করেছেন। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৯০।

১৮৪. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯২।

১৮৫. এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল তাঁর 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন- বুড়ো খাঁর জনৈক প্রধান সহকর্মীর নাম ছিল খালাস খাঁ। তিনি এদেশে খালাস খাঁ নামে সুপরিচিত। তিনি বেদকাশীতে একটি প্রকান্ড দীঘি খনন করে লোকের জলকষ্ট নিবারণ করেছিলেন। .....খননকারীর নামানুসারে এই দীঘির নাম হয়েছিল খালাস খাঁর দীঘি। দ্রঃ *সুন্দরবনের ইতিহাস*, পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আরীফ শাহের অপভ্রংশও হতে পারে।[১৮৬] বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ 'আব্দুল ওয়ালী সাহেবের মতে "হোসেন শাহী আমলে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) সুলতান নসরৎ শাহ শৈলকুপাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি আজও কালের সাক্ষী হিসেবে টিকে আছে।[১৮৭] এই মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচারের জন্য শাহ 'আরবকে নুসরৎ শাহ এখানে নিয়োগ করেন। শাহ 'আরব এখানেই বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এ মসজিদ চত্ত্বরেই এ মহান মুবাল্লিগের সমাধি আজও বিদ্যমান।[১৮৮]

একদিল শাহ (রহ:) ঃ

বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল তথা যশোর-খুলনা-চব্বিশ পরগণার ভাটি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ মুসলিম জনবসতির পিছনে যে সব ইসলাম প্রচারকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা কাজ করেছে একদিল শাহ তাঁদের অন্যতম। বাংলার হাবশী সুলতানদের শাসনামলের শেষদিকে (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিঃ) অথবা সুলতান হোসেন শাহের আমলের (১৪৯৩ খ্রিঃ) প্রথমদিকে এই জেলার বারাসাত অঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে আরও কয়েকজন সাধক এ এলাকায় ইসলামের বীজ

---

[১৮৬]. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৩।

[১৮৭]. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ গ্রন্থে বলেছেন- সাবেক ঝিনাইদহ মহ কুমা শহর থেকে প্রায় ১০/১২ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে কুমার নদীর তীরে অবস্থিত শৈলকুপা মসজিদ দক্ষিণবঙ্গে সুলতানী আমলের স্থাপত্য কীর্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সে স্থানের নাম দরগা পাড়া। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এই মসজিদের আয়তন ভেতরের দিকে ৩১.৫ ২১ ফুট। দেয়ালগুলো প্রায় ৫.৫ ফুট প্রশস্ত। এর চারকোণে আছে চারটি মিনার বা টারেট। দ্রঃ *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩২৫।

[১৮৮]. মসজিদের পূর্বদিকে অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত চত্বরে আনুমানিক ৪৫ ৩০ ফুট আয়তনের একটি প্রাচীন মাযার আছে। প্রবল জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, এটি আরব দেশাগত হযরত শাহ আরব মতান্তরে শাহ আরীফ নামে জনৈক দরবেশের মাযার। এখানে মসজিদ বা মাযারে কোন শিলালিপি নেই। এ সম্পর্কে খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী লিখেছেন- As to the origin of the masjid (called in Imperial Farmans Masjid-i-Jamia or Cathedral mosque), it is started that king Nasir Shah, Son of Hussain Shah of Bengal, While travelling from gaur on his way to Dacca came to Mauza Shailakupa. with Nasir Shah were Hazrat Maulana Muhammad Arab, A renowned Darvish and Murshid (spritual guide of the king, Hakim Khan, a pathan, Saiyid Shah Abdul Qadir-i-Bagdadi and a Fakir. The Maulana on seeing the village was very much delighted and said. I like this place, I will inhabit here, The above mentioned three persons who were the disciples of the Maulana wished also to remain with there Murshid at Shailakupa. Nasir Shah consented to this and left his Wazir Shah Ali in the service of the pir. The king granted a few beghas of lakhiray lands and was pleased to call the Mauza Nasirpur after his own name. cf.: Khan Saheb Abdul Wali, ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, 1901, pp. 15-28.

Dhaka University Institutional Repository

বপন করেছিলেন। তিনি ইসলামের কাফেলাকে আরও শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট করেছিলেন। বারাসাতে তাঁর মাযার আজও কালের সাক্ষী হিসেবে অবস্থান করছে।[১৮৯]

হযরত শাহ সূফী সুলতান আহমদ (রহঃ) ঃ

মুঘল বাদশাহ আকবরের আমলে (১৫৮৯-৯৫ খ্রিঃ) যশোর এলাকায় ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন শাহ সূফী সুলতান আহমদ (রহঃ)। তিনি রাজা মানসিংহের সাথে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে যশোরে আগমন করেন। তিনি যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য থেকে যান।[১৯০] জানা যায়, "চাঁচড়ার রাজা শুকদেব সিংহ রায় তাঁর বসবাসের জন্য রাজবাড়ির খিড়কীর দিকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। খিড়কী এলাকা পরে খড়কী এলাকায় পরিণত হয়।[১৯১]

হযরত শাহ আব্দুল্লাহ ওরফে ভালাই শাহ আল-বোগদাদী ও শাহ হাতেম আলী (রহ:) ঃ

হযরত শাহ আব্দুল্লাহ ও শাহ হাতেম আলী নামে দুইজন বুজুর্গ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মহেশপুর থানার বর্তমানের ভালাইপুরে এসে আস্তানা গড়েন। এঁরা সহদর ভাই। জনশ্রুতি রয়েছে তাঁরা ৩৬০ জন আউলিয়ার সদস্য ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার করাই ছিল পীরদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, বর্ণশ্রেণী দ্বারা লাঞ্ছিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে তাঁদের কাছে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[১৯২] দিনে দিনে পীরদ্বয় পরিচিত হয়ে পড়েন। কুষ্ঠসহ বিভিন্ন রোগীকে ভালাইশাহ খুব সহজে সুস্থ করে দিতেন। নাম শাহ আব্দুল্লাহ হলেও মানুষ যেহেতু তাঁর কাছে আসলে ভাল হত, তাই সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালাই বাবা বলে ডাকত। কালক্রমে তিনি ভালাই বাবা নামে খ্যাতি লাভ করেন। আজও মহেশপুর থানার ভালাইপুর তাঁর নাম বহন করে যাচেছ। এখানেই তাঁদের সমাধি রয়েছে।[১৯৩]

---

[১৮৯]. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৯৭।

[১৯০]. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা), *যশোর জেলার ইতিহাস* (ঢাকাঃ দিগন্ত প্রচারণী লিমিটেড, ১৯৯০), পৃ. ১৮১।

[১৯১]. *প্রাগুক্ত, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৯৯-১০০; খড়কী যশোর শহরেই অবস্থিত। এই পরিবারের বুজুর্গগণ এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এই পরিবারের শ্রেষ্ঠ সন্তান মাওলানা শাহ আব্দুল করিম। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। দ্রঃ *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৮১।

[১৯২]. মীর্জা মোহাম্মদ আল-ফারুক সম্পাদিত, *ঝিনাইদহের ইতিহাস* (ঝিনাইদহঃ জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ, ১৯৯১), পৃ. ৮৯; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১০৪।

[১৯৩]. মহেশপুর-খালিশপুর রোডে ভালাইপুর ব্রীজটি ছাড়িয়ে মসজিদের পাশে শাহ হাতেম আলীর মাযার এখানকার বটগাছটির নিচে বিদ্যমান। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রহ:) ঃ

সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রহ:) সুদূর 'আরব থেকে আগত একজন প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক। তিনি ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশে আসেন। কালক্রমে যশোর জেলার কেশবপুরের শেখপুরায় এসে আস্তানা স্থাপন করেন। এখানে তিনি একটি সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করেন।[১৯৪] আর অত্র এলাকায় তাঁর শিষ্যগণের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটান।[১৯৫]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সপ্তম শতকে মহানবী (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই সাহাবী হযরত আবূ ওয়াক্কাসের (রা:) মাধ্যমে বঙ্গে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী ও 'আরব থেকে আসা বণিক, পীর, ওলী, দরবেশ-সূফী-সাধক, ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমে সারা বঙ্গে ইসলামের প্রচার হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দীন মু'হাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গে ইসলাম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময়ে রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন ওলী-দরবেশগণও বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার করতে থাকেন। সমকালে (চতুর্দশ শাতব্দীতে) যশোরে বড়খান গাযী কর্তৃক ইসলামের (সম্ভবত) প্রথম প্রচার ঘটে, তথাপি পঞ্চদশ শতাব্দীতে হযরত খান জাহান আলী কর্তৃক দক্ষিণবঙ্গ তথা যশোর-খুলনা বিজয়ের মাধ্যমে যশোরে ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করে। এজন্য খান জাহান (রহ:) কে এ অঞ্চলের ইসলাম প্রচার-প্রসারের পথিকৃত বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে এ মহাপুরুষের অনুসারী ও অন্যান্য সূফী আউলিয়া-দরবেশদের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ত্বরান্বিত হয়। যার ফলে যশোর ইসলাম তথা মুসলমানদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে।

তারা চাঁদ ফকীর

তারা চাঁদ ফকির মনিরামপুর থানার মনোহরপুর গ্রামে পাথরঘাটায় আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রভূত সম্পদশালী হলেও আজীবন ইসলাম প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করেন। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বেশি গুণান্বিত ছিলেন। নওয়াপাড়া-পাঁজিয়া রোডের দশ/বার মাইল

---

[১৯৪]. মসজিদটি ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। মসজিদটি সম্পর্কে সাংবাদিক হাবুনুর রশীদ ১২ পৌষ ১৩৯৬ সংখ্যা, "দৈনিক সংগ্রাম" এ লিখেছেন- মসজিদটির স্থাপত্য কৌশল অত্যন্ত কারুকার্যের সাক্ষর বহন করে, ইসলামী রীতি অনুসৃত কারুকার্য পুরাকীর্তির এক অপূর্ব নিদর্শন। গম্বুজ দিয়ে ঢাকা এই মসজিদটির আলাদা কোন ছাদ নেই। ক্ষুদ্রাকৃতির ইট দিয়ে গাঁথা দেয়ালগুলো অত্যন্ত শোভামন্ডিত। কিন্তু ইসলামী স্থাপত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটি অযত্ন, অবহেলায় আজ ধ্বংসের পথে। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩৯।

[১৯৫]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১শ খন্ড (ঢাকাঃ ই. ফা. বা., আগষ্ট-১৯৯৬), পৃ. ৪৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ভিতরে কুমারঘাটার হাটখোলার ধারে ফকিরের ভিটায় তাঁর কবর রয়েছে। কবরটি কাঁচা হলেও আশ্চর্যজনকভাবে সে অবধি প্রায় দু'শ বছর যাবত অক্ষত রয়েছে।[১৯৬]

মান্দার ফকীর

আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে কেশবপুর থানার পাঁজিয়া ইউনিয়নের মান্দারডাঙ্গা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত মান্দার ফকিরের নামে মান্দারডাঙ্গা গ্রামটির নামকরণ হয়েছে। তিনি একজন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সাধক ছিলেন। মান্দারডাঙ্গা গ্রামেই তাঁর মাযার রয়েছে। এখনও প্রতি সপ্তাহে ফকিরের অগণিত ভক্তকুল তাঁর মাযারে ভিড় জমায়।[১৯৭]

---

[১৯৬]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড, ৩য় ভাগ ১৯৯৬, পৃ. ১৫২।

[১৯৭]. ফকীরের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য যা গবেষক সরজমিনে গিয়ে সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে মুজাদ্দিদ-মুজাহিদ, সূফী, ওলী-দরবেশ, পীর, 'আলিম সমাজ ও সাহিত্যিকবৃন্দের ভূমিকা

- কোম্পানি শাসন ও মুসলিম সমাজ
- মুজাহিদ-মুজাদ্দিদ ও তাঁদের সংস্কার আন্দোলন
- সূফী, ওলী-দরবেশ, পীর ও 'আলিম সমাজের ভূমিকা
- মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে মুজাদ্দিদ-মুজাহিদ, সূফী-ওলী, পীর, 'আলিম সমাজ ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা

কোম্পানি শাসন ও মুসলিম সমাজ ঃ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর আমবাগিচায় বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে ইংরেজ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মুলমানদের জীবনে নেমে আসে ঘোর দুর্দিন। ইংরেজের তল্পি বাহক প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ মুসলমানদের উপর অত্যাচার, অনাচার তথা দমননীতি চালানোর কাজে তাদের সহযোগিতা করে।[১] ব্রিটিশ শাসনের স্টিম রুলার আর হিন্দুদের ষড়যন্ত্র রাজ্যহারা মুসলমানগণ ভাগ্য বিপর্যয়ে একবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। হিন্দুগণ ইংরেজ প্রভূর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য উঠে পড়ে লাগে, কাজেই ব্রিটিশ শাসকগণ মুসলমানদেরই একমাত্র শত্রুজ্ঞান করে তাঁদের প্রতি অবহেলা ও চরমভাবে শত্রুতা শুরু করে। তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার নানা কৌশল অনুসরণ করে।[২] ব্রিটিশ পূর্ব যুগে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা[৩] ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত।[৪] একটি

---

১. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, হাদিয়ে কওম মুন্সী মেহেরুল্লাহ, *প্রেক্ষণ,* মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ১০৪।

২. শ. ম শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯২), পৃ. ১৮০-৮১।

৩. ইসলামের প্রথম বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল জ্ঞানান্বেষণের নির্দেশ নিয়ে। "اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ" অর্থাৎ পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। দ্র: আল কুর'আন, সূরাঃ 'আলাক, আ: ১; এছাড়া মহানবী (সঃ) বলেছেন- "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ" অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি অবশ্য কর্তব্য। দ্রঃ ইবনু মাজাহ, সুনান (করাচীঃ নূর মোহাম্মদ লাইব্রেরী, তা.বি), পৃ. ২০; এ গুরুত্বের কারণে ভারতীয় মুসলিম শাসকগণ বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা বিদ্যায়তনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমিদান (লাখেরাজ) ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন মসজিদে 'আরবী কুর'আন শিক্ষার জন্য সরকারি তত্ত্বাবধানে অধ্যাপক নিয়োগ করা হত। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র প্রধানের বিশেষ মঞ্জুরীর ব্যবস্থাও ছিল। ফলে গরীব-দুঃখী সর্বস্তরের মানুষ বিদ্যার্জনের সুযোগ পেত। দ্রঃ Azizur Rahman Mallick, ***British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856*** (Dacca: Bangla Academy, 1977), pp. 171-72.

৪. ইংরেজ তথা কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার মুসলমানদের আর্থিক সমৃদ্ধির বিষয় সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন- কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত লোকের সন্ধান পাওয়া দুরুহ ছিল। বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। দ্রঃ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* (অনুঃ এম. আনিসুজ্জামান, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৯৪), পৃ. ১৩৭।

 Dhaka University Institutional Repository

উন্নত মর্যদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে মুসলমানগণ পরিচিত ছিল।[৫] কিন্তু ব্রিটিশ ও হিন্দুদের কুট কৌশলের ফলে তাঁদের সেই পূর্বাবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৬] বিশেষ করে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক ভিত একবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। বলা আবশ্যক, মুসলিম শাসনামলে এদেশের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন মুসলমান। তাছাড়া সরকারি আমলা, পীর, আউলিয়া বহিরাগত অভিজাত মুসলিম পরিবার, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রভৃতির নামে মোট জমির এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ ছিল। মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের আর্থিক সচছলতা ও আভিজাত্যের প্রধান উৎস ছিল লাখেরাজ ভূমি (মুলমানদেরকে এককালীন সরকার কর্তৃক প্রদেয় নিষ্কর জমি)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট থেকে বে-আইনীভাবে ঐসব জমি কেড়ে নিয়ে[৭] সরকারের বিশ্বস্ত হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে সরকার রাজস্ব বৃদ্ধি করেন।[৮] ব্রিটিশ সরকার "সুর্যাস্ত আইন"[৯] (sun set law) বলে নির্দিষ্ট দিনে সমুদয় খাজনা পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে মুসলমান জমিদারগণের অধিকাংশই হিন্দু নায়েব গোমস্তার নানা ষড়যন্ত্রের কারণে নিজেদের জমিদারি হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের

---

৫. এ সম্পর্কে W. W. Hunter এর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন- বাস্তব সত্য হল এই যে, এ দেশের শাসনকর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি; এবং শুধুমাত্র মনোবল ও বাহুবলের বেলাতেই নয়, এমনকি রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞানের দিক থেকেও তাঁরা ছিল উন্নততর জাতি। দ্র: W. W. Hunter, ***The Indian Musolmans***, op. cit., p. 149.

৬. ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫), পৃ. ৫৫।

৭. লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের দরুণ বাংলার মুসল্মানদের যে, কি ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল তা উল্লেখ করে হান্টার বলেছেন- "শত শত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং যে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিস্কর জমির আয়ের উপর চলত সেগুলো ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সরকারের আঠার বৎসর ব্যাপী স্বেচছাচারিতামূলক কার্যকলাপের দরুণ মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। cf.: W. W. Hunter, ***Annals of Rural Bengal***, p. 177; কোম্পানির আমলে মুসলমানদের ঐশ্বর্যের উপর একের পর এক আঘাত আসে। তারা সরকারি চাকুরি হারায় এবং জমিদারি হতে বিচ্যুত হয়। এক্ষেত্রে নিস্কর জমি বাযেয়াপ্ত করা হয়। এতে ঐশ্বর্যশালী মুসলমান সমাজ দরিদ্র দশায় পরিণত হয়। দ্রঃ *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, (১৭৫৭-১৯৭৪), পৃ. ৫৪।

৮. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৮২।

৯. ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি ধারায় বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারি বিক্রির ব্যবস্থা রাখা হয়। "সূর্যাস্ত আইন" নামে অভিহিত এই আইন মোতাবেক কোন জমিদার যদি নির্দিষ্ট দিন সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব প্রদানে ব্যথ হলে তার জমিদারী বা এর একাংশ বিক্রি করে বকেয়া খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। cf.: Sirajul

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় যশোর অঞ্চলেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১০] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুসলমানদের যে সর্বনাশ হয় সে সম্পর্কে "জেমস কিনীলে" নামক একজন পদস্থ ইংরেজি কর্মচারীর রিপোর্ট প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: এ পর্যন্ত যেসব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোট কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে গেল, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করল এবং তাদের ঘরে যেসব ধন-দৌলত জমা হতে লাগল সেগুলো মুসলমানদের আমলদারীতে তাদেরই ঘরে জমায়েত হত।[১১] জেমস ওয়াইজের (James Wise) মতে, এদেশের মুসলমান জনসাধারণ রাখালহীন মেষ পালকের মত হয়ে পড়ে।[১২] উইলিয়াম হান্টার এ সম্পর্কে আরো একধাপ এগিয়ে বলেন-গত পঁচাত্তরের মধ্যে (১৮৪০) বাংলার মুসলমান পরিবারগুলো হয় উৎখাত হয়ে গেছে না হয় আমাদের শাসনামলের নয়া সমাজের নিম্নস্তরেই চাপা পড়ে গেছে।[১৩] বলা বাহুল্য, বাংলার মুসলমানগণ হান্টারের বর্ণিত শেষোক্ত নিম্নস্তরেই চাপা পড়ে যায়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে হাজার হাজার মুসলিম রাজ কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হয়।[১৪] পূর্ব হতেই বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে এখানকার কৃষকদের

Islam, ***Permanent Settlement of Bengal : A study of its operation, 1790-1819*** (Dhaka: Bangla Academy 1979), p. 79.

১০. সূর্যাস্ত আইন কার্যকরী হওয়ায় বাংলার জমিদারি হস্তান্তরিত হতে থাকে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলার দুই তৃতীয়াংশ জমিদারি হস্তান্তরিত হয়। cf. *Ibid*; যশোর জেলার ক্ষেত্রে একই অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। এ জেলার চারটি বৃহৎ জমিদারিই (যার অধিকাংশই ছিল মুসলমান) ক্রমান্বয়ে রাজস্বের দায়ে সরকারের নিকট দায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। শেষাবধি, পুরাতন জমিদাররা তাদের জমিদারি থেকে বঞ্চিত হয়। cf. J. Westland, ***A Report on the District of Jessore: Its Antiqities, Its History and Its Commerce*** (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1874), p. 103.

১১. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪২।

১২. James Wise, ***Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal***, (London 1884), p. 2.

১৩. ***Ibid***, p. 160.

১৪. কোম্পানির শাসনামলে মুসলমানদেরকে সরকারি চাকুরি হতে বহিস্কার করা হয়। এ সম্পর্কে হান্টার বলেন- ব্রিটিশ সম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদিগকে সৈন্য বাহিনী ও উচ্চ রাজপদগুলো হতে অপসারিত করা প্রয়োজন ছিল। তিনি স্বীকার করেন যে, এই নীতির ফলে মুসলমানগণ দূর্দশাগ্রস্ত হয়। cf.: ***Ibid***, p. 157; সৈন্যবাহিনী রাজস্ব, বিচার ও অন্যান্য শাসন বিভাগ মুসলমানদের ঐশ্বর্যের উৎস ছিল। কোম্পানির শাসনকালে তাদের এই সব উৎস পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। cf.: ***Ibid***, p. 150; উদ্ধৃত: *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশই ছিল মুসলমান।[১৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে জমিদার ও উচচ শ্রেণীর মুসলমানগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এছাড়াও এ সময় ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে শিল্প ও চাকুরি ক্ষেত্রে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ সকল মানুষ কৃষি কাজে যোগদান করে জীবিকা নির্বাহের প্রয়াস পায়। ফলে কৃষিজীবী মানুষ ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[১৬] কিন্তু ইংরেজ সরকার মুসলমানদের এই কৃষি ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করার জন্য নীল চাষ প্রবর্তন করে চাষিদের আর্থিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে গুড়ো করে দেয়। এমনি ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ছিয়াত্তরের মনান্তর) ফলে মুলমানরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে।[১৭] এদিকে ইংরেজরা মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার সামান্য সুযোগটুকু (মক্তবের শিক্ষা) কেড়ে নেয়। ফলে অধিকাংশ মুসলিম পরিবার ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা থেকেও দূরে সরে পড়ে। বলা বাহুল্য, ইংরেজরা এদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুছে ফেলে তদস্থলে আধুনিক শিক্ষার নামে ভিন্ন সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারের লালন ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জনগণের উপরে চাপিয়ে দেয়। যে কারণে মুসলমানরা ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা অভিমান বশে বর্জন করে এবং সাধারণ চাষি মুসলমানরাও কিছুটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।[১৮] এ কারণে দরিদ্রতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার মুসলিম

---

[১৫]. বাংলাদেশের জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের দুই তৃতীয়াংশই মুসলমান। আর জমিদার গোষ্ঠী হল হিন্দু, তাই মুসলমান চাষীরা তাদের অবাধ শোষন উৎপীড়নের শিকার হয়। দ্রঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ২৮৩; উদ্ধৃতঃ মেসবাহুল হক, *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ* (ঢাকা: ই. ফা. বা. ২য় সং, ১৯৮৪), পৃ. ৪৩।

[১৬]. ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক ডব্লিউ. বি. জ্যাকসন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। এতে তিনি বাংলার সম্ভাবনায় সমস্ত স্থানেই চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো, উল্লেখ করেন যে, এক্ষেত্রে জমিদাররা কোন অর্থ বিনিয়োগ করেনি। কৃষকরা জঙ্গল কেটে আবাদি জমি বৃদ্ধি করেছে, আর জমিদাররা এক্ষেত্রে তার লাভের অংশ দখল করেছে। cf.: W. B. Jackson, ***General of a Tour of Inspection*** (Calcutta: 1854), pp. 12-14. ; উদ্ধৃতঃ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস, উনবিংশ শতাব্দী* (কলিকাতা; ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭৫), পৃ. ৫৫-৫৬।

[১৭]. এ সম্পর্কে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বলেন- একশত সত্তর বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল; এখন তাদের পক্ষে ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব। cf.: W. W. Hunter, ***Annals of Rural Bengal***, p. 150; Azizur Rahman Mallik, ***op. cit.***, p. 46.

[১৮]. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম,* পৃ. ১৯২-৯৩; মোঃ আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.), পৃ. ১৩৮; বিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষকদের দ্বারা পাঠগ্রহণে অনিচ্ছা, মুসলমান ছাত্রদের সম্মানজনক স্থান অধিকার ও ধর্ম পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা (আরবী) শিক্ষার সুযোগের অভাব, ধর্মীয় শিক্ষা লাভের সুযোগের অভাব ছাড়াও পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের অনীহার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। আর তাহল তাদের আর্থিক সঙ্গতির অভাব। ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল ব্যয় সাপেক্ষ। বাংলার মুসলমানদের পক্ষে তখন এরূপ ব্যয় বহুল শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব ছিলনা। দ্র: ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে তাদের আচার-আচরণে হিন্দুয়ানী প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৯] মুসলিম পরিবারেও হিন্দুদের ঠাকুরের মত মুসলিম 'আলিমগণকে জ্ঞান করতে থাকে। হিন্দুদের তুলসী পুজার মত মুসলমানরা কবর পুজা আরম্ভ করে। উল্লেখ্য, কবর পুজা, মূর্তি পুজা সহ যেকোন পুজা শিরকের পর্যায়ভুক্ত এগুলো ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।[২০] মোটকথা, মুসলমানগণ প্রকৃত ইসলামের পথ থেকে সরে গিয়ে হিন্দু প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে।[২১] অন্যদিকে ইংরেজ রাজশক্তির সহযোগিতায় খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করে। মুসলমানদের দরিদ্রতা ও অশিক্ষার সুযোগে মিশনারিরা বিভিন্ন লোভ-লালসার মাধ্যমে তাদেরকে

---

১৯. শত শত বছর যাবত হিন্দু ধর্মের সহচর্যের ফলে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে তারা যখন এদেশ হতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায় তখন থেকেই তাঁদের কৃষ্টি ও সভ্যতা দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানরা জ্যোতিষীদের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। শনিবার ও মঙ্গলবারকে অশুভ বলে ধারণ করতে থাকে। পটকা ও আতশবাজি ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে দাঁড়ায়- কবর পুজা, পীর পুজা, ভন্ড সূফীদের সেবা, নারীর বন্ধ্যাত্ব ও সন্তান পাওয়ার আশায় মাজার স্পর্শ করে কান্নাকাটি করা ইত্যাদি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এগুলো ছাড়াও 'কদম-রসূল' নামে আরও একপ্রকার কুসংস্কার বহু পূর্ব হতেই বাংলায় প্রচলিত ছিল। সর্বোপরি তাসাউফের নামে ভন্ডপীর ফকীর সূফীদের দ্বারা হিন্দুদের যোগীতত্ত্ব ও আন্ত্রিক তত্ত্বের কুপ্রভাব মুসলমান সমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। বলা আবশ্যক, বাংলায় প্রথমদিকের সূফীগণ শরীয়তের সঠিক অনুসারী ছিলেন ঠিকই কিন্ত পরবর্তীকালে যারা সূফী নামে পরিচিত হয় তাদের অনেকেই ছিল অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। যার ফলে তারা সহজেই যোগীতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও বৈষ্ণববাদ-এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। cf.: Muhammad Mohar Ali, ***History of the Muslims of Bengal*** (Riyadh: The University Press, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1985), p. 803. ।

২০. কবর পুজা, মূর্তি পুজা ইত্যাদি ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কেননা এগুলো শিরকের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরে মৃত্যু ব্যক্তির নিকট বা কোন মূর্তিকে সামনে নিয়ে তাঁর কাছে দু'আ চাওয়া, ক্ষমা চাওয়ার অর্থ হল আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখা এবং তাঁর সাথে অংশীদার করা। এ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে আল্লাহ পাক মানুষকে সাবধান করে বলেছেন- " لاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ " অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ করোনা, যারা না পারে তোমাদের উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি এরূপ কর তবে নিশ্চয়ই তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্র: আল কুর'আন, সূরাঃ ইউনুস, আ: ১০৬; বলা আবশ্যক, কবরবাসীকে কোন কিছু শুনানো সম্ভবপর নয়। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন "وَ مَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবরে পড়ে আছে তাকে আপনি শোনাতে পারেননা। দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ ফাতির, আ: ২২; সুতরাং বলা যায়, কবরবাসী কারো জন্য কিছু করতে পারেনা এবং ক্ষমা করার একমাত্র মালিক আল্লাহই। যে কেউ এরূপ কাজ করে সে চরম গুমরাহীতে পড়বে। কেননা আল্লাহ বলেন- "وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ আল মা'য়িদা, আ: ১০৯।

২১ মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৩), পৃ. ১৩৮।

ধর্মান্তরিত করণের (খ্রিস্টধর্মে) চেষ্টা চালায়।[২২] বাংলাদেশের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে যশোর অঞ্চলও এ সকল সমস্যার বাইরে ছিলনা। পূর্বোল্লেখিত কারণে দেশের অন্যান্য এলাকার মানুষের ন্যায় যশোরের মুসলমানগণ যখন হতাশাগ্রস্ত, লক্ষ্যহীন, বিদেশী শাসক ও স্বদেশী কিছু স্বার্থান্বেষীদের অত্যাচার-নিপীড়নে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ঠিক তখনই এ অঞ্চলের (যশোর) মুসলমানদেরকে ব্রিটিশদের কবল থেকে বাঁচিয়ে ও সঠিক ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনা ও অত্র অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য কিছু সংখ্যক মুজাহিদ-মুজতাহিদ সূফী,[২৩] পীর,[২৪] ওলী[২৫]- দরবেশ[২৬], 'আলিম সমাজ ও মুসলমি সাহিত্যিকবৃন্দ কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

---

২২. দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্যোগ নেয় পর্তুগীজরা। ১৭৯৩ সালে প্রটেস্ট্যান্ট উইলিয়াম কেরী খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। অবশ্য কোম্পানি প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয়নি। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর নীতি পরিবর্তন করে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয় এবং কোম্পানি এলাকায় বসতি স্থাপন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। cf.: J. N. Farquhar, ***Modern Religious Movement in India*** (London: 1924), pp. 8-9; এর ফলে বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার কার্য ব্যাপক গতি লাভ করে। খ্রিস্টান মিশনারিরা, চার্লস গ্রান্টের (কোম্পানির অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা) ফরমুলা অনুযায়ী খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, এসব স্কুল থেকে বাংলার হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। দ্রঃ আলো আরজুমান বানু, ***মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ঃ তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা*** (অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), পৃ. ৩৬।

২৩. সূফী বা তাসাউফ শব্দটি আরবী সূফ (صوف) শব্দ হতে উদ্ভুত। সূফ শব্দের অর্থ উল বা পশম অর্থাৎ যারা পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। প্রাথমিক যুগের ধর্ম তাত্ত্বিকরা পশমী বস্ত্র পরিধান করে সাধনা করতেন বলে তাদেরকে সূফী বলা হত। দ্রঃ আবদুল করিম, ***মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯৪), পৃ. ১৮২; সূফী শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে Hans Wehr উল্লেখ করেন- صوفي: of wool, woolen, Islamic Mystic, Sufi. cf.: ***A Dictionary of Modern Written Arabic*** (London: Macdonald and evens ltd., 1980), p. 531; অবশ্য বিজ্ঞজনেরা সূফী শব্দের মূল বের করতে গিয়ে আরো কয়েকটি শব্দের অবতারণা করেছেন, যেমন কেউ কেউ বলেছেন যে, আহল-উস-সুফফা অর্থাৎ যারা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সময়ে মসজিদের মেঝেতে বসে সাধনা করতেন, তাদের থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি। আবার কারো কারো মতে- সূফ-ই আউয়াল অর্থাৎ যারা সামনের সারিতে নামাজ আদায় করতেন তাঁদের থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি। তবে আধুনিক পণ্ডিতদের গ্রহণযোগ্য মত হল "সূফ" শব্দই সূফী বা তাসাউফের মূল। দ্রঃ মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ১৮২; মূলত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কাল হতেই সূফীবাদের উৎপত্তি। তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবীদের মধ্যে কঠোর তপস্যা ও আধ্যাত্মিকতার এক নবদিগন্ত সৃষ্টি হয়। 'আব্বাসীয় খলীফা আল মামুনের (৮৩৩ খ্রিঃ মৃত্যু) সময় মূলত সূফীবাদের উৎকর্ষ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় উপমাহদেশে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আরব বণিকগণের দ্বারা ইসলাম প্রচার-প্রসার হয়। এসময় বহু 'আরবীয় ও মধ্য এশিয়ার পীর, দরবেশ, সূফী, সাধক ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ত্যাগ করে এ বঙ্গের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। মূলত তাদের মাধ্যমেই এ উপমহাদেশে তথা আমাদের দেশে ইসলামের সূফীবাদী তত্ত্বের পর্যায়ক্রমিক ক্রমবিকাশ লাভ করে। দ্রঃ মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, ***খাজা আবদুল মজিদ শাহ : জীবন ও কর্ম*** (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০১), পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

[২৪]. পীর শব্দটি মূলত ফার্সী (پیر) শব্দ। এর আভিধানিক অর্থঃ বৃদ্ধ। শব্দটি আরবী শেখ (شیخ) শব্দের অনুরূপ। ব্যবহারিক অর্থে আধ্যাত্মিক জগতের পথ প্রদর্শক। সূফী বলতে পীরকেও বুঝায়। দ্রঃ Muhammad Mohar Ali, *op. cit.*, p. 803; প্রকৃত পক্ষে পীর অন্যান্য শিক্ষকের মতই আধ্যাত্মিক পথের শিক্ষক বা পথ প্রদর্শক ভিন্ন অন্য কিছু নন। একজন পীর তাঁর শিষ্যের জন্য পরশমণি সদৃশ। তাঁর সংস্পর্শে এলে আত্মার মধ্যে একপ্রকার ভাবোদয় হয় যার মাধ্যমে ভক্তের হৃদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে শুরু করে দ্রঃ মোহাম্মদ জাকারিয়া, ***মাওলানা মোয়েজউদ্দিন হামিদী : তাঁর জীবন ও কর্ম*** (কুষ্টিয়াঃ অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ২২; হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) খাঁটি (কামেল) পীরের পরিচয় স্বরূপ নিম্নের দশটি চিহ্নকে উল্লেখ করেছেন-

(১ পীর সাহেবের তাফসীর শাস্ত্র, হাদীস শাস্ত্র ফিকাহ শাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে মিশকাত শরীফ ও তাফসীর এ জালালাইন শরীফের উপর পুরোপুরি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(২) পীরের আকীদা, বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলি ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী হতে হবে।

(৩) পীরের মধ্যে টাকা, পয়সা, সম্মান প্রতিপত্তি প্রভৃতি পার্থিব লিপ্সা থাকবেনা। এমনকি নিজেকে একজন কামিল (খাঁটি) পীর বলে দাবি করতে পারবেনা। কেননা ইহাও পার্থিব লোভ-লালসার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) পীর অন্য কোন কামিল পীরের সংসর্গে থেকে বাতেনি জ্ঞানের সংশোধন তথা তরিকতের জ্ঞানার্জন করেছেন এমন প্রমাণ থাকতে হবে।

(৫ সম-সাময়িক পরহেজগার আলিমগণ এবং সুন্নাতের অনুসারী পীরগণ তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করে থাকেন।

(৬) দুনিয়াদার অপেক্ষা দ্বীনদার লোকেরাই তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেন।

(৭) তাঁর অধিকাংশ মুরীদগণকে দুনিয়ার লোভ-লালসা স্পর্শ করতে পারেনা এবং তারা শরী'আতের হুকুম আহকামকে প্রাণপণে মেনে চলার চেষ্টা করে।

(৮) পীর মনোযোগের সাথে মুরীদগণকে তা'লীম-তালকীন করে থাকেন। যেন তারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর অনুসারী হয়ে যায়। তিনি মুরীদগণকে তাদের স্বাধীন মতামতের উপর ছেড়ে দেননা বরং কোন দোষ-ত্রুটি দেখতে পেলে তা যথাযথভাবে সংশোধন করে দেন।

(৯) খাঁটি পীরের সংসর্গে থাকলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে পরকালের চিন্তা বেশি হবে।

(১) পীর নিজে যিকর-আযকার করবেন। কেননা নিজে আমল না করলে মুরীদগণের মধ্যে তা'লীম-তালকীনে বরকত হয়না। দ্রঃ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, ***পীরের পরিচয়, মুরিদের কর্তব্য*** (যশোর: আকবর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৭০), পৃ. ৭-৮।

[২৫]. ولي শব্দটি আরবী শব্দমূল ওয়ালা হতে উদ্ভূত। যার অর্থ কাছাকাছি থাকা এবং ওয়ালিয়া শব্দের অর্থ শাসন করা, আধিপত্য করা এবং কাউকে রক্ষা করা। সাধারণ প্রচলিত ব্যবহারে এই শব্দটির অর্থ রক্ষাকর্তন, উপকারক, সহচর, বন্ধু, নিকটাত্মীয় অর্থেও প্রযোজ্য। ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যবহৃত হলে ওয়ালী (সিদ্ধ পুরুষ) ও ইংরেজি Saint প্রায় সমার্থক। এর পশ্চাতে যে ভাবধারা বিদ্যমান তা একটি রীতিবদ্ধ মতবাদ সৃষ্টি করেছে। তবে কুর'আনে এ মতবাদের অস্তিত্ব নেই। দ্রঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ***সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ***, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪), পৃ. ২৫০। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ সাধারণভাবে ঈমানদারদেরকে স্বীয় বন্ধু বা তিনি তাদের অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করেছেন- "اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ" অর্থাৎ- যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ বাকারা, আঃ ২৫৭। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- "اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ" অর্থাৎ- মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিত হবেনা। দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ ইউনুস, আঃ ৬২।

[২৬]. দরবেশঃ درویش শব্দটি ফারসী ভাষা হতে উদ্ভূত। যার আভিধানিক অর্থ দরজা অনুসন্ধান করা, অর্থাৎ- সংসার বিরাগী, ধর্মানুসন্ধানী। দ্রঃ Vullers, Lexicon, i., p. 839 a, 845. b. ইসলামী পরিভাষায় দরবেশ শব্দটি ব্যাপকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

মুজাদ্দিদ-মুজাহিদ ও তাঁদের সংস্কার আন্দোলন

ইংরেজদের হাতে শাসন ক্ষমতা হারানোর পর বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের দ্রুত অবনতি হয়। কোম্পানির শাসন চক্রান্তের আবর্তে পড়ে মুসলমানরা তাঁদের অর্থনৈতিক ঐশ্বর্য হারিয়ে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে তাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর্থিক দৈন্যদশা ও ইংরেজ বিদ্বেষের কারণে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা সংকট দেখা দেয় এবং তাঁরা নানা রকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পীর পুজা, কবর পুজা, দরগাহ, মাযার জিয়ারত। সত্যপীরপুজা ইত্যাদি প্রথা সমাজে প্রবেশ করে।[২৭] মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য একেবারে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।[২৮] উপমহাদেশের মুসলমানদের এই চরম অধ:পতনকালে কতিপয় মুসলিম মুজাদ্দিদ[২৯] (مجـــدّد) ও

ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের সভ্য হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। প্রচলিত অর্থে- যেসব লোক ব্যক্তিগত জীবনে জাগতিক ব্যাপারে বীতস্পৃহ থেকে অথবা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করেন, এরাই দরবেশ নামে পরিচিত। দ্রঃ ***সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ***, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭।

২৭ . ইসলামী শিক্ষার অভাব ও হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাসের কারণে মুসলমানগণ বেশ কিছু হিন্দুয়ানি প্রথায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম আল্লাহকে বাদ দিয়ে, শরী'আতের অনুসরণ না করে পীর-ফকীরদেরকে মুক্তিদাতা, কল্যাণদাতা হিসেবে গ্রহণ। অথচ ক্ষমা, মুক্তি বা কল্যাণ-অকল্যাণের একমাত্র মালিক আল্লাহ। ভন্ড পীর-ফকীররা কুরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থে মনগড়া কথা বলে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে । আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন- " وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ- قَالُوْا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ-" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ সাবা, আ: ৪০-৪১; পবিত্র কুর'আনে এসকল কাজ হতে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ পাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন- "وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْنَ" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ বাকারা, আ: ১৮৬।

২৮. Muhammad Abdur Rahim, ***Muslim Society and Politics in Bengal*** (Dacca: The University of Dacca, 1974), p. 75.

২৯. মুজাদ্দিদ (مجـدد) আরবী কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য; ক্রিয়ামূল (مصدر) تجديد অর্থ নবায়নকারী; সংস্কারক (Reformer)। পরিভাষায় মুজাদ্দিদ বলা হয় সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যিনি সময়ের বিবর্তনে ও স্বার্থান্বেষীদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন অথবা অজ্ঞ দীনি পুরোধাদের ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ প্রক্রিয়ায় দীনের মূলধারায় অনুপ্রবিষ্ট গর্হিত ও নব উদ্ভাবিত দীন বিরোধী (বিদ'আত) বিষয়গুলোকে পরিশোধন ও সংস্কার করে দীনকে তার মূল ও আদীরূপে 'আলা মিন হাজি'ন-নবুওয়াহ অর্থাৎ নবী কারীম (সঃ) ও সাহাবীগণের যুগের পরিচ্ছন্নরূপে পুনর্বিন্যস্ত করেন- এক কথায় যিনি দীনকে তার সঠিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ' সম্পর্কে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন- "عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنّ الله يبعث لهذه الأمة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" অর্থাৎ- আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি শত বছরের মাথায় এমন ব্যক্তির উত্থান ঘটাবেন যিনি উম্মতের জন্য তার দীন নবায়ন করবেন। দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

মুজাহিদ[৩০] (مجاهد) মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্য কয়েকটি সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন।[৩১] এ পুনর্জাগরণের ঢেউ প্রথম ওঠে ভারতের উত্তর প্রান্ত হতে। ইতিহাসে সেই আন্দোলন 'ওহাবী আন্দোলন' নামে খ্যাত।[৩২]

এ আন্দোলনের পাশাপাশি উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্ত হতে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকেও একই মতাদর্শ ভিত্তিক কয়েকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনগুলোর মধ্যে যশোর অঞ্চলে ফরিদপুরের হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত 'ফরায়েযী আন্দোলন' ও চব্বিশ পরগণার সৈয়দ নিছার আলী ওরফে তিতুমীরের 'জিহাদ আন্দোলন' ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। যশোর জেলার ইসলাম প্রচার-প্রসারের ইতিহাসে এ সকল সংস্কার আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ সংক্রান্ত আলোচনা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে দুটি সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে।[৩৩] এর মধ্যে খোদ বাংলাদেশ থেকে যে আন্দোলনটি শুরু হয়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে সেটি 'ফরায়েযী-আন্দোলন' যার নেতৃত্ব দেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ও তদ্বীয় পুত্র দুদুমিয়া। আর অপরটি উত্তর ভারতের 'তরিকা-ই-মুহাম্মাদীয়া আন্দোলন', যার নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী।[৩৪]

ইমামুল হাফিজ আবূ দাউদ সুলায়মান বিন আশ'আস, *সুনানে আবূ দাঊদ,* কিতাবুল মালাহিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮০; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৯।

৩০. মুজাহিদ (مجاهد): جاهد (জাহাদা) ক্রিয়াপদের কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য, ক্রিয়ামূলের অর্থ- চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়- যে ব্যক্তি ধর্মে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে মুজাহিদ বলে। ভারতীয় মুসলিমদের ব্যবহার বিধি; খ্রিস্টীয় অস্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হতে পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশে দিল্লীর মুঘলদের ক্ষীয়মান শক্তির প্রতি হুমকির জবাবে এবং অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের প্রতি মারাঠা, শিখ ও ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমান চাপ হতে উদ্ভূত, সেখানকার ইসলামী পুনরভ্যুদয় আন্দোলনের সমর্থক, বিশেষত নিষ্ঠাবান সংগ্রামীদের সাথে মুজাহিদ (مجاهد) পদ বাচ্যটি সংশ্লিষ্ট। দ্রঃ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১৯শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯৯।

৩১. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম,* পৃ. ২২৬।

৩২. *ফরিদপুরে ইসলাম,* পৃ. ১৩৮; Dr. Abdur Rahim বলেন- In the days of the social and cultural decline of the Muslims several puritanical reform movement were born, among them, Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1703-92) of Najd inaugurated a reform movement in Arabia to re-establish the Muslim Society on the pristine purity of the earlier days of Islam. cf.: ***Muslim Society and Politics in Bengal***, p. 75.

৩৩. ***Muslim Society and Politics in Bengal***, p. 75.

৩৪. Tariqah-i-Muhammadiyah was founded in Delhi by sayyid Ahmad (1786-1831) of Rai Barelvi in United provinces in the first quarter of the nineteenth century. The movement urged the Muslims to refrain from observing religious innovations and accretion, To liberate the country from the European colonizers, it prescribed jihad against the Brithish. The Movement with its emphasis on religious and political essues, was deeply involved

Dhaka University Institutional Repository

ফরায়েযী আন্দোলন ও হাজী শরীয়ত উল্লাহ-দুদুমিয়া

"ফারায়েয" (فرائض) শব্দটি "ফরিযাহ" (فريضة) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ অপরিহার্য কর্তব্য। ব্যবহারিক পরিভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর নির্দেশিত অবশ্য কর্তব্য সমূহ। যারা এ কর্তব্য সমূহ পালনের অংগীকারভুক্ত তাদেরকেই ফরায়েযী বলে অভিহিত করা হয়।[৩৫] উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার মুলমানগণ যখন নানা রকম কুসংস্কার, পীর পুজা, কবর পুজা ইত্যাদি হিন্দুয়ানি মতবাদের অনুসারী হয়ে ইসলামের ফরয কাজসমূহ যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাকার কাজ পর্যন্ত বর্জন করতে শুরু করে তখন মুসলমানদের পূর্বোক্ত শিরক,[৩৬] বিদ'আত[৩৭] কুসংস্কার থেকে ফিরিয়ে এনে

---

with the economic betterment of the people. It optimistically declared that once the Brithish were overthrown there would be no rent to pay and the Muslim would own jote (land). cf.: M. A. Khan. (ed.), Selection from Bengal Government Record on Wahhabi Trails (1863-1870) (Dhaka: 1961). pp. 383-385 and 389; Nurul H. Choudhury, ***peasant Redicalism in Nineteenth century Bengal: The Faraizi, Indigo and pabna Movements*** (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2001), p. 40.

৩৫. *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪২।

৩৬. শিরক (شرك) মূলত আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অংশীবাদ, একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস, একাধিক ঈশ্বরের উপাসনা ইত্যাদি। আর পরিভাষায়- আল্লাহর সাথে কোন কিছুর অংশীদার করাকে শিরক বলে। শিরক শব্দের অর্থ সম্পর্কে Hens wehr উল্লেখ করেছেন- شرك : politheism, idolalry (أهل الشرك) the politheistic, the idolators, এছাড়া এর অর্থ Sirk- to Share, Participate, be or become partner, participent, associate, "اشركه بالله" to make the associate or partner of God (in his creation and rule) cf.: ***A Dictionary of Modern Written Arabic***, p. 468; শিরক সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- "لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ লুকমান, আ: ১৩; শিরকের ভয়াবহতা অর্থাৎ এর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- "إنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أن يُشْرِكَ بِه وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَن يَّشَآء، وَ مَن يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْمًا عَظِيْمًا" অর্থাৎ নি:সন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননা, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে, তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ নিসা, আ: ৪৮।

৩৭. বিদ'আত: বিদ'আত (بدعة) আরবী শব্দ। এটি بدْع থেকে উদগত। এর শাব্দিক অর্থ নতুনত্ব উদ্ভাবন। শাব্দিক অর্থ বর্ণনায় Hens Wehr বলেন- بدعة: Innovation, Novelty; heritical doctrine, heresy, creations etc. cf.: ***A Dictionary of Modern Written Arabic***, op. cit., p. 46; আল্লামা মুল্লা আলী আল-ক্বারী লিখেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়- "احداثُ ما لم يكن في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم" দ্রঃ *মিরকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; প্রখ্যাত হাদীসবিদ 'ইমাম খাত্তাবী' বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেছেন- "كُلُّ شيْءٍ

ইসলামের মৌলিক ‘ইবাদত তথা ফরজ কাজ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য হাজী শরীয়তউল্লাহ ফরায়েযী[৩৮] আন্দোলনের সূচনা করেন।

হাজী শরীয়ত উল্লাহ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৯] ১২ বছর বয়সে তিনি লেখা-পড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যান এবং মাওলানা বাশারত আলীর নিকট কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন। এরপর ফুরফুরাতে আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা লাভ করার পর ১৭৯৯ সালে উস্তাদ বাশারত আলীর সাথে হজ্জ করতে মক্কায় গমন করেন।[৪০] আরবে অবস্থানকালে তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং এর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।[৪১] ১৮১৮ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতি-নীতি ও নানারূপ কুসংস্কার লক্ষ্য করে ফরায়েযী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষার আদর্শে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা,

---

"احدث على غيرِ أصل من أصول الديــن و علــى غـيرِ عيـاده و قياســه" অর্থাৎ যে মত বা নীতি দীনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, নয় কোন দৃষ্টান্ত এবং কিয়াস সমর্থিত এমন যা-ই-নবোদ্ভাবিত করা হবে তা-ই-বিদ'আত। দ্রঃ معالم السنن، ص:٣٠١ ; উদ্ধৃত: *সুন্নাত ও বিদ'আত*, পৃ. ৭-৯; বিদ'আতের কুফল সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেছেন-

..... و إيّاكم و محدثات الأمور فإنّ كلّ محدثة بدعة و كلّ بدْعةٍ ضلالةٌ (أحمد)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দীনে নিত্য নব-উদ্ভাবিত জিনিসই বিদ'আত এবং সব বিদ'আত চরম গোমরাহীর মূল। দ্রঃ *সুন্নাত ও বিদ'আত*, পৃ. ২৯; অন্যত্র একই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে এভাবে-

فإنّ خير الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمد و شر الأمور محدثاتها و كل بدعة ضلالة– (مسلم)

উদ্ধৃত: *সুন্নত ও বিদ'আত*, পৃ. ২৯-৩০।

৩৮. The Movement came to be known as Fafaizi as it insisted upon the Faraid, the religious duties of the Muslims, cf: Annmaric Schimmel, Islam in the Indian Subcontinent (Lciden: 1980), p. 181; ফরায়েজীদের মতে, ফরজ কাজ বাদ দিয়ে উপকারহীন ইসলাম বিগর্হিত এবং ধর্মের নব আবিষ্কৃত রছম রেওয়াজে ব্যাপৃত হওয়া বিদ'আত এবং পাপের উৎস। এসব উদযাপন করা অনুচিত। ফরজ অর্থাৎ প্রথম কাজ প্রথমে করা এ ছিল তাদের মূল শ্লোগান। এজন্যই এদের বলা হত ফরায়েজী। দ্রঃ মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, ফরায়েয়ী ও ওয়াহাবী আন্দোলন, *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, সম্পা: সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও অন্যান্য (ঢাকা: ১৯৮৬), পৃ. ১৩২।

৩৯. *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪০; ***Muslim Society and Politics in Bengal***, p. 76.

৪০. M. A. Khan, ***History of the Faraidi Movement in Bengal***, pp. 1-4; ফরিদপুরে ইসলাম, পৃ. ১৪০; James Wise, ***Notes on Eastern Bengal***, op. cit., p. 23.; *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ১৭৫৭-১৯৪৭, পৃ. ৮২।

৪১. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ১৭৫৭-১৯৪৭, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে আত্ম প্রতিষ্ঠার বাণী শিক্ষা দেওয়া ছিল এ সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য।[৪২] হাজী শরীয়ত উল্লাহ দ্বিতীয়বার মক্কা শরীফে যান এবং ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন।[৪৩] এরপর তিনি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। অল্পকালের মধ্যেই ফরায়েযী আন্দোলন ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, যশোর-খুলনা ও ত্রিপুরা জেলায় প্রসার লাভ করে।[৪৪] স্থানীয় জমিদার ও ইংরেজগণ এ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। কারণ এ আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা একতাবদ্ধ হতে শুরু করে এবং জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।[৪৫] অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে এটি একটি ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল[৪৬] তারপরও হাজী শরীয়তউল্লাহ ইংরেজ ও জমিদারদের রোষানলে পতিত হন। হিন্দু জমিদারেরা তাঁকে তিতুমীরের মত ইংরেজদের বিকল্প সরকার গঠনের দায়ে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে। এমনকি ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়।[৪৭] তবুও তিনি এ আন্দোলন থেকে পিছু হটেননি, এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই সুযোগ্য পুত্র দুদুমিয়াকে আন্দোলনের প্রশিক্ষণ দিয়ে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ৫৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।[৪৮] হাজী শরীয়ত উল্লাহ মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোহসেন উদ্দীন ওরফে দুদুমিয়া 'ফরায়েযী আন্দোলনের' নেতৃত্ব গ্রহণ

---

৪২. *প্রাগুক্ত;* ডঃ মঈনউদ্দীন আহমদ খান, *ফারায়েজী আন্দোলন*, পৃ. ১১।

৪৩. M. A. Khan., *op. cit.*, p. 11; James Wise, *op. cit.*, pp. 22-23; ডঃ মঈনউদ্দীন আহমদ খান, *ফারায়েজী আন্দোলন*, পৃ. ১৭; ***Muslim Society and Politics in Bengal***, p. 76.

৪৪. *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪৪।

৪৫. ***Muslim Society and Politics in Bengal***, p. 77; এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ লিখেছেন- হিন্দু জমিদারগণ ফারায়েজী আন্দোলনের বিস্তৃতিতে ভয় পেয়ে যান, কারণ এই সংস্কার আন্দোলন মুসলমান প্রজাদিগকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। জমিদারগণ প্রজাদের উপর নানা রকম অবৈধ কর বসাত। দূর্গাপুজা, কালীপুজা ইত্যাদি হিন্দু উৎসবের জন্যও মুসলমান প্রজাদের নিকট হতে কর আদায় করত। cf. James Wise, *op. cit.*, p. 24.; হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদেরকে এই অবৈধ কর না দেয়ার জন্য উপদেশ/ নির্দেশ দেন। দ্রঃ *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৮৩।

৪৬. A. R. Mallick, ***Brithish Policy and the Muslims in Bengal***, op. cit., p. 83.

৪৭. *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪৫; মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ধর্ম সংস্কারক আন্দোলন, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খণ্ড, সম্পাঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলা সংস্করণ (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ২৩৬।

৪৮. ***Muslim Society and Politics in Bengal***, p. 77.

করেন।[৪৯] দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েয়ী আন্দোলন পূর্বের থেকে আরো সংগঠিতরূপ লাভ করে। এ সময় আন্দোলনটি ফরিদপুর সহ যশোর, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে।[৫০] ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফরায়েয়ী আন্দোলন নিছক একটি সংস্কার আন্দোলনে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অনুপ্রবেশ করে।[৫১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর বাংলার চাষিরা জমিদারদের হাতে শোষিত ও নিপীড়িত হতে থাকে।[৫২] নীল চাষ শুরু হওয়ার পর নীলকরদের অত্যাচারের শিকার বাংলার চাষিদের সামনে "ফরায়েযী আন্দোলন" আশার আলো হয়ে দেখা দেয়। মূলত মুসলিম চাষিরাই এই আন্দোলনের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হতে থাকে এবং জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের প্রতিরোধ করার সুযোগ পায়।[৫৩] উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ফরায়েজীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়; সংগঠনটি এ সময় উত্তরে দিনাজপুর থেকে দক্ষিণে ২৪ পরগণা ও বাকেরগঞ্জ হয়ে পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।[৫৪] যশোর জেলার চাষিদের একটি অংশ এতে যোগদান করে।[৫৫] যশোর জেলা ফরায়েযী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ফরিদপুর জেলার পাশেই অবস্থিত হওয়ার কারণে এ জেলার (যশোর) মানুষ বিভিন্নভাবে ফরায়েযী আন্দোলনের সংস্পর্শে

---

৪৯. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৮৩; তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এ সমস্ত প্রতিনিধির নাম ছিল খলীফা। ফরায়েী মতবাদের অনুসারীদের সংগঠিত করা এবং সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব ছিল। cf. ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, Vol- lxiii, No.i, 1894, p. 50; A. R. Mallick, ***op. cit.***, p. 83.

৫০. M. A. Khan, ***The Faraidi Movement in Bengal 1818-1906*** (Karachi: 1965), p. 122; P. Hardy, ***The Muslims of Brithish India*** (Cambridg: 1972), p. 57.

৫১. A. R. Mallick, ***op. cit.***, pp. 82-83; এ পর্যায়ে সংগঠনটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন- It (Faraidi Movement) was a fundamentalist movement involving the poorer section of agrasian society, and it was its particular emphasis on economic and agrarian questions, cf.: Rafiuddin Ahmed, ***The Bengal Muslims, 1871-1906: A Quest for Identity*** (Delhi: 1988), p. 40.

৫২. ***Ibid.***

৫৩. Nurul H. Choudhury, ***op. cit.***, p. 71.

৫৪. Md. Habibur Rahman, ***Bangladesh District Gazetteers Bakerganj*** (Dhaka: 1980), p. 47; মফিজুল্লাহ কবির, নীল বিদ্রোহ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ২১২।

৫৫. K. G. M. Latiful Bari, op. cit., p. 42.

Dhaka University Institutional Repository

আসে।[৫৬] যশোর জেলায় এ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দুদুমিয়া এ জেলায় একটি সুবিদিত নামে পরিণত হয়।[৫৭] দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েযী আন্দোলন একটি সশস্ত্র অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হলেও এ আন্দোলনের সদস্যগণকে শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সঠিক ইসলামের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে তারা সঠিক ইসলামের পথে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলন তথা হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও দুদুমিয়ার প্রচেষ্টা যশোর অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

ফরায়েযী আন্দোলনের পাশাপাশি তরীকা-ই মুহাম্মদী[৫৮] নামে আরো একটি আন্দোলন ভারতবর্ষে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। এতে নেতৃত্বদান করেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, আন্দোলন শুরু হওয়ার পর যশোর অঞ্চলের কিছু মানুষ সরাসারি সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এতে যোগ দেয়।[৫৯] পাটনা খলীফা নামে অভিহিত আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর মাধ্যমে এ আন্দোলন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এনায়েত আলী যশোরসহ চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়াসহ বিভিন্ন জেলায় তাঁর কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করেন।[৬০] ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা থেকে যশোর আসেন। যশোর জজ কোর্টের জনৈক নাজির বোরহান উদ্দীন এ ক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করেন। তিনি চাষিদের মুহাম্মদী মতবাদে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি যশোর ঝিনাইদহের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করার পাশাপাশি সেখানকার নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের

---

৫৬. ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী হাটের তাঁতিরা যশোর জেলার বিভিন্ন অংশে কাপড় বিক্রি করত। এ সকল তাঁতিদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ফরায়েযী মতবাদের অনুসারী। এদের মাধ্যমেও যশোর জেলার জনগণ ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়। cf.: W. W. Hunter, ***A Statistical Account of Bengal***, Vol-11 (Calcutta: 1978), p. 302.

৫৭. ***Ibid***, pp. 199-200.

৫৮. তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর করা। আন্দোলন কারীরা মনে করেছিল যে, ইসলাম বিচ্যুত হওয়ার কারণেই বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে। ফলে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা অত্যাবশ্যক। দেখুন: Rafiuddin Ahmed, ***op. cit.***; A. R. Mallick, ***op. cit.***; উদ্ধৃত: ***যশোর জেলার নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২ ঃ একটি সমীক্ষা***, পৃ. ১৬২।

৫৯. K. G. M. Latiful Bari, ***Bangladesh District Gazetteers Khulna*** (Dhaka: 1978), p. 58; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঝিনাইদহ মহকুমা সদরের বন হরদিয়া গ্রামের মৌলভী জমির। তাঁর নেতৃত্বে আরিফপুরের জোলারা সৈয়দ আহমদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়। cf. Ramshanker Sen, ***Report on the Agricultural Statistics of Jessor*** (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1873), p. 93.

৬০. Rafiuddin Ahmed, ***The Bengal Muslims,*** op. cit., p. 39.

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে সম্মেলন করেন। এই পদক্ষেপেটি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে ফলপ্রসু হয়।[৬১] অবশ্য এটি একটি ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ছিল। তাই মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাইরে এর সম্প্রসার ঘটেনি।

তিতুমীর ও তাঁর জিহাদ আন্দোলন ঃ বাংলায় তিতুমীরের আন্দোলন তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের একটি অংশ।[৬২] তিতুমীর ফরায়েযী নেতাদের মতো একটি শক্তিশালী প্রজা আন্দোলন গঠন করেছিলেন।[৬৩] তিনি তরীকা-ই-মুহাম্মদী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলাভি একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল সৈয়দ মীর নিসার আলী। তিনি ১৭৮১ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। [৬৪] তিতুমীর কলকাতার একজন মল্লযোদ্ধা ছিলেন। [৬৫] তিনি মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান এবং সেখানেই সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৬৬] ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি অবিভক্ত নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলাঞ্চলে তাঁর জিহাদ[৬৭] আন্দোলন শুরু করেন। সে সময় হিন্দু জমিদার ও নীলকর ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচারে মুসলমান চাষিগণ ভীষণ দুর্বিপাকে নিপতিত হয়। তিতুমীর কৃষকদের সংগঠিত করে অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন।[৬৮] একই সাথে তিনি মুসলমান সমাজের কুসংস্কার দূর করতেও সচেষ্ট হন। যে সকল বিদ'আত মুসলমান সমাজে প্রবল ছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিতুমীর মুসলমানদের দাড়ি রাখা, নামায পড়া,

---

৬১. Ramshanker Sen, ***op. cit.***, p. 93.

৬২. Mohammad S. A. Ibrahimy, Titumirs Reform Movement, ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, No-1, June, 1982, p. 18.

৬৩. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৮৮।

৬৪. *প্রাগুক্ত;* শহীদ তিতুমীর গ্রন্থের লেখক আবদুল গফুর, তিতুমীরের জন্ম সাল ১৭৮২ বলে উল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃত: আব্বাস আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮।

৬৫. A. R. Mallick, ***op. cit.***, p. 18-23.

৬৬. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২২৭।

৬৭. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮।

৬৮. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২২৭-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

রোযা রাখা ইত্যাদি কাজে উদ্বুদ্ধ করেন।[৬৯] যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুসলমানেরা বিদ'আত করত তিনি সে সকল কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেন।[৭০] তিতুমীরের এ ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করে বারাসাতের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মুসলমানদের দাড়ির উপর ২.৫ রুপি কর ধার্য করেন।[৭১] এই কর দিতে অস্বীকৃতি জানালে জমিদার চাষিদের দমন করতে অগ্রসর হলে তিতুমীরের সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়। তিতুমীরের কৃষক সংগঠন শক্তিশালী হওয়ায় অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর সাহেবগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। এমনকি অনেক জায়গায় জমিদার ও নীলকর লাঠিয়ালদের সঙ্গে তিতুমীর দলের ছোটখাট সংঘর্ষ হয়।[৭২] জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জনের পর তিতুমীর নিজেকে ভারতের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন।[৭৩] নারিকেল বাড়িয়া নামক গ্রামে অবস্থান করে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যান। এক সময় তিনি একের পর এক নীলকুঠি আক্রমণ করেন এবং সাফল্যও পান। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হননি। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর হাতে তিনি পরাজিত ও শহীদ হন।[৭৪]

পূর্ব হতেই যশোর জেলায় তরীকা-ই মুহাম্মদী আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। অত:পর তিতুমীরের নেতৃত্বে নীলকুঠি আক্রমণ চাষিদের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে।[৭৫] যশোরের শতকরা ৫৬ ভাগ চাষি ছিল মুসলমান।[৭৬] তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।[৭৭] এছাড়া

---

৬৯. অল্পকালের মধ্যে তিন-চারশত লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং ইসলামের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে। তারা দাড়ি রাখত ও বিশেষ ধরনের পোশাক পরত। এই জন্য সমাজে তাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্রঃ A. R. Mallick, ***op. cit.***, p. 76-80; *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৮৮।

৭০. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২২৮।

৭১. প্রমোদ রঞ্জণ সেন গুপ্ত, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ* (কলিকাতা: র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮), পৃ. ৭৭; মুসলমান প্রজাগণ সংঘবদ্ধ হচেছ দেখে স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ ভয় পেয়ে যান এবং তারা তিতুমীরের অনুচরদের শক্তি বৃদ্ধির পথ বন্ধ করতে সচেষ্ট হন। তারাগুনিয়া, এগবকোট ও কুমার গাছির জমিদারগণ তিতুমীরের শিষ্যদিগকে অপমান ও জরিমানা করতে শুরু করে। পুরয়ার কিষেণ দেবরায় মুসলামন প্রজাদের দাড়ির উপর কর বসান । সরফরাজপুরের প্রজাগণ এই অপমানজনক কর দিতে অস্বীকার করেন। দ্রঃ A. R. Mallick, pp. 76-80; *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৮৯।

৭২. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলিকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড, ৭ম সং, ১৯৮৯), পৃ. ২৭৪।

৭৩. *প্রাগুক্ত, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৮৯।

৭৪. A. R. Mallick, ***op. cit.***, p. 76-80; *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, পৃ. ৯০।

৭৫. Rafiuddin Ahmed, ***op. cit.***, p. 39.

৭৬. *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন ১৮৫৯-৬২ ঃ একটি সমীক্ষা*, পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

চব্বিশ পরগণা যশোরের পার্শ্ববর্তী জেলা হওয়ায় তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার ও নীলকর বিরোধী কর্মকান্ড যশোর অঞ্চলকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে যশোর জেলার মুসলমান চাষিরা এই আন্দোলনে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।[৭৮] শুধু নীলকর বিরোধী ভূমিকাই নয়; নামায, রোযা পালন দাড়ি রাখা ইত্যাদি ইসলামের সঠিক অনুসরণেও তিতুমীরের এ আন্দোলন যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। সুতরাং বলা যায়- যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তিতুমীর তাঁর 'জিহাদ আন্দোলন' এক অসামান্য ভূমিকা রাখে।

---

[৭৭]. K. G. M. Latiful Bari, ***Bangladesh District Gazetteers Khulna***, p. 42.

[৭৮]. *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন ঃ একটি সমীক্ষা*, পৃ. ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সূফী, ওলী-দরবেশ, পীর ও 'আলিম সমাজের ভূমিকা

মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ)

যশোর-খুলনা তথা সমগ্র বাংলায় কুসংস্কার, বিদ'আত, দূরীকরণ এবং ইসলাম প্রচার-প্রসারে মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) এর অবদান অপরিসীম।[৭৯] তিনি ১৮ই মুহররম ১২১৫হি:/১১ই জুন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের জৈনপুর[৮০] শহরে মুল্লাটোলা মহল্লায় ঐতিহ্যবাহী একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই পিতার নিকট থেকে কুর'আনের 'আমপারা কয়েকদিনের মধ্যে কণ্ঠস্থ করে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও ধী-শক্তির পরিচয় দেন।[৮১] কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হয়েও দক্ষ হাফিযের ন্যায় কুর'আন হিফয করেছিলেন। পিতার নিকট আরবী-ফার্সির প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের পর সমকালীন প্রথিতযশা পন্ডিত ইসলামী আইনজ্ঞদের কাছে বিশেষ করে মাওলানা কুদরত উল্লাহ বুদলবী, মাওলানা আহমদ আলী, মাওলানা আহমাদ উল্লাহ্ আনাসী প্রমুখের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৮২] মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইলমে মা'রিফাত অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি সাইয়্যেদ আহমেদ বেরেলভির নিকট গমন করেন। তিনি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার খিলাফত লাভ করেন।[৮৩] এরপর তদ্বীয়

---

[৭৯]. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম* (ঢাকাঃ ই. ফা. বা. ২০০১), পৃ. ১৪০।

[৮০]. জৈনপুর উত্তর ভারতের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশের গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। এর অক্ষাংশ ২৫.৪২ পূর্ব। সিংহাসনে আসীন হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ ইবনে তুঘলক (১৩১৫-১৩৫১ খ্রিঃ) এর নাম ছিল জাওনা শাহ। তার এ নামানুসারে ফিরোজ শাহ তুঘলক ৭৬০ হিজরী/১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইব্রাহিম শরকী (১৪০২-১৪৪০ খ্রী:) এর মত অনেক সংস্কৃতমনা, বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত এই নগরীর শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় নগরটি শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফিরোজশাহ কর্তৃক নগরটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শের-শাহের (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রিঃ) সময় পর্যন্ত জৈনপুর শিক্ষার জন্য হিন্দের 'সিরাজ' নাম প্রসিদ্ধি অর্জন করে। cf.: H.R. Nevill, Jaunupur, A Gazetteer, Vol- xxviii of the District Gazetteer of Agra (Alahabad, 1908), p. 145; Nazendra Nath Law, "Promotion of Learning is India During Muhammadan Rull (London: Longmans green and co. 1916), pp. 99-104; *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১১শ খণ্ড (১৯৯২), পৃ. ৭১১-১৩; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৭০, টিকা নং, ১২২।

[৮১]. মাওলানা আব্দুল বাতিন, *সিরাত-ই মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রঃ) এর জীবনী* (ঢাকাঃ আল করণী প্রেস, তা. বি.), পৃ. ৯-১১।

[৮২]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৭১; আবু নঈম মোঃ আব্দুল আলীম, *হায়াত কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ)* (ঢাকাঃ ফাহিম প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ৪।

[৮৩]. Muhammad Sekandar Ali Ibrahimy, "*Maulana Karamat Ali and his project of Reform*" Unpublished Ph.D. Thesis, Rajshahi University, 1997), p. 197.

Dhaka University Institutional Repository

মুরশিদ[৮৪] হযরত সৈয়দ আহমদের (রহঃ) নির্দেশে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বাকী জীবনে এদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে তিনি একাত্ম হয়ে যান। বাংলাদেশেই তিনি বিবাহ সম্পন্ন করেন এবং ১৮৭৩ খ্রিঃ ১১ই মে ইন্তেকাল করেন। রংপুর জেলা শহরের মুন্সীপাড়া মহল্লাতেই তার মাযার রয়েছে।[৮৫]

বাংলাদেশে আগমনের পর এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার ও মূলনীতি শিক্ষাদানে কারামত আলী জৈনপুরী দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৮৬] বাংলাদেশে তাঁর সফর সম্পর্কে মাওলানা আবুল বাশার উল্লেখ করেন- "মাওলানা প্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন সাইয়েদ আহমদের সাথে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়। এ সময় তিনি বেশি দিন এখানে অবস্থান করেননি। অবশ্য ১৮৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে তিনি আগমন করেন। এ সময় কলকাতা হয়ে ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, যশোর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও পাবনা পরিভ্রমণ করেন।[৮৭] তিনি এ সব অঞ্চলে সফর করে একাধিক যোগ্য ভক্ত গড়ে তোলেন। তার এ সব ভক্ত মুরীদগণ[৮৮] জৈনপুরী হুজুরের পদাংক অনুসরণ করে একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৮৯] চন্দ্রগঞ্জ কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, রামগতি কারামতিয়া আলিয়া

---

৮৪. মুরশিদ: এটি (مرشد) আরবী শব্দ। এর অর্থ আধ্যাত্মিক গুরু, পীর; পথ-প্রদর্শক। যেমন বলা হয়- "দূর্যোগ রাত্রিতে মুরশিদ ধরিয়াছিলেন হাল।" দ্রঃ সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ দ্বিতীয় পুণর্মুদ্রণ, ২০০২), পৃ. ৯৯৩।

৮৫. Muhammad Sekandar Ali Ibrahimy, p. 197; অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিব, *খুলনা জেলায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৮), পৃ. ১৩২ ও ১৩৮।

৮৬. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৭১।

৮৭. মাওলানা আবুল বাশার ও মাওলানা আব্দুল বাতেন, *সীরাতে মাওলানা আব্দুল আওয়াল জৈনপুরী (রহঃ)* (এলাহাবাদঃ ইসরার-ই কাশেমী প্রেস, ১৩৭০হিঃ), পৃ. ১৬।

৮৮. মুরীদ: শব্দটি মূলত: আরবী (مريد)। এর অর্থ হল- ভক্ত বা শিষ্য। মুরীদ শব্দের অর্থ সম্পর্কে Hans Wehr বলেন- Novice (of a Sufiorder); aspirant, adherent, Follower, disciple cf. ***A Dictionary of Modern Written Arabic***, p. 366; সূফীবাদে ব্যবহৃত 'মুরীদ' শব্দের অর্থ হল: আধ্যাত্মিক শিক্ষকের ছাত্র। তরীকতের পরিভাষায় যাকে সালেকও বলা হয়। এক কথায় পীরের শিষ্যকে মুরীদ বলা হয়। দ্রঃ মোহাম্মদ জাকারিয়া, *মাওলানা মোয়েজউদ্দিন হামিদী ঃ তাঁর জীবন ও কর্ম* (কুষ্টিয়া: অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ২২।

৮৯. মাওলানা আব্দুল বাতেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা, ভবানীগঞ্জ রব্বানীয়া হাইস্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আজও তার কীর্তি স্মারক হিসেবে দন্ডায়মান রয়েছে।[৯০]

যশোর-খুলনা অঞ্চলেও তাঁর প্রভাব ছিল ব্যাপক। হাজী শরীয়ত উল্লাহর দারুল হরব বা যুদ্ধভূমি সংক্রান্ত ফতওয়া সম্পর্কে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন। এজন্য মাওলানা সাহেবের ফতওয়া মুতাবিক তাঁরা (জনগণ) ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে একমত হওয়া সত্ত্বেও জৈনপুরী হুজুরের ফতওয়া মুতাবিক 'ঈদ ও জুমআর নামায প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কৌতুহলের ব্যাপার, সেই সঙ্গে তারা 'আখেরী জোহর' নামে অতিরিক্ত চার রাকাত জোহরের ফরজ নামাযের বদলাও আদায় করেছেন। [৯১] এই অঞ্চলে যে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় খুলনা জেলার ফকিরহাটে তাঁর মুরীদগণ কর্তৃক 'কারামতিয়া মাদরাসা' নামে একটি মাদরাসার প্রতিষ্ঠা [৯২] এবং যশোরের মুন্সী মেহেরউল্লা কর্তৃক নিজগ্রাম মনোহরপুরে (১৩০৭/৮বাং সালে) 'মাদরাসা-ই-কারামতিয়া' -এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।[৯৩] উল্লেখ্য, যশোরের ইসলামী জাগরণের নকীব মুন্সী মেহেরুল্লাহ জৈনপুরী (সঃ) এর অনুসারী ছিলেন।[৯৪] সুতরাং বলা যায়, যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এই মণীষীর অবদান অনস্বীকার্য। মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র মাওলানা আবদুল আওয়াল জৌনপুরী (১৮৬৭-১৯২১ খ্রিঃ) এই সিলসিলার হাল ধরেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন।[৯৫]

হযরত শাহ কারার (রঃ)

যশোরের কেশবপুর থানার বঁগা নামক গ্রাম ও তৎসলগ্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে হযরত শাহ কারার (রহঃ) এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ইসলাম প্রচারক সূফী সম্বন্ধে কপোতাক্ষ নদের তীরে বঁগায় তাঁর সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি হতে জানা যায়, ইনি বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারার্থে

---

৯০. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *ইসলামী দাওয়াহ বিস্তারে ও ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে আব্দুল আওয়াল জৈনপুরী (১৮৬৭-১৯২০ খ্রী:) এর অবদান* (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ১৯৯৭), পৃ. ১২৩।

৯১. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৩২।

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

৯৩. *প্রাগুক্ত*; নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার* (ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১২৯।

৯৪. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৩৯।

৯৫. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাড়ে পাঁচশত শিষ্যসহ বাগদাদ শরীফ হতে রওয়ানা হয়ে দিল্লী শহরে উপস্থিত হন। তৎকালের বাদশাহ মোঘল শাসনের শেষ দিকে দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রিঃ) দরবারসহ এই সূফীর হাতে বাই'য়াত-মুরীদ হন। সেই হতে বাদশাহ মুর্শিদের প্রতি রসদ মঞ্জুর করত: মীর্জানগর সুবাদারের প্রতি উহা যোগাবার আদেশ দেন। তৎপর এতদঞ্চলে এসে কপোতাক্ষ নদের তীরে উক্ত স্থান পছন্দ হওয়ায় বঁগা[৯৬] নাম স্থাপন পূর্বক আস্তানা গেড়ে শিষ্য-সামন্তসহ অবস্থান করেন। তৎপর ঐ বাদশাহর প্রদত্ত সনদভুক্ত একশত বিঘা নিস্কর জমি (লাখেরাজ) এবং রসদাদি ভোগজাত পূর্বক দীন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বঁগাকে কেন্দ্র করে তিনি এ অঞ্চলে বহু ভক্ত-মুরীদ গড়ে তোলেন এবং এই বঁগাতেই সমাধিস্থ হন। তাঁর নামানুসারে বঁগাতে (তাঁর মাযার সংলগ্ন) বর্তমানে একটি দাখিল (বঁগা শাহকারারীয়া দাখিল) মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য শিলালিপিতে তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সন উল্লেখিত হয়নি।[৯৭]

মওলানা নুরুদ্দিন শিকদার

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে কালিয়া উপজেলার বড়নাল গ্রামে নুরুদ্দিন শিকদার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কামিল দরবেশ ছিলেন। এলাকায় তার কারামত সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী রয়েছে।[৯৮] অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে এ দরবেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৭৬ সালে বড়নাল গ্রামে ইন্তেকাল করেন।

শাহ্ সূফী সৈয়দ কারামতুল্লাহ বোগদাদী (রহঃ)

শাহ সূফী সৈয়দ কারামতুল্লাহ বোগদাদী (রহঃ) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আগমন করেন। তিনি মাগুরার মুহাম্মদ পুরে নাকোল গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন এবং পরবর্তীকালে এখানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু

---

৯৬. বঁগা নামটি মূলত হযরত শাহ কারার (রহঃ) এর দেওয়া। এটি বাহগা ফার্সী এর অপভ্রংশ। ফার্সী বাহগা এর অর্থ মনোরম দৃশ্য। কথিত আছে, হযরত শাহ কারার (রহঃ) মীর্জানগর সুবাদারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কপোতাক্ষ নদের তীর ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। এ সময় এ অঞ্চলের সন্নিকটে আসলে তথায় বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ণ এলাকা লক্ষ্য করে অঞ্চলটি তাঁর পছন্দ হয় এবং তিনি এ দৃশ্য অবলোকন করে বাহ্‌গা, বাহ্‌গা বলে আনন্দ প্রকাশ করেন। সেই থেকে এ অঞ্চলের নাম হয় বাহ্‌গা। পরবর্তীতে এই বাহ্‌গার অপভ্রংশ হয়ে বর্তমানে বঁগা নামে রূপান্তরিত হয়েছে। উদ্ধৃত: মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী (বি. এ.), প্রাক্তন শিক্ষক, কেশবপুর পাইলট স্কুল, জন্ম ১৯২৭ (বুড়িহাটি, কেশবপুর) এর প্রদেয় তথ্যএবং স্থানীয় জনশ্রুতি।

৯৭. হযরত শাহ কারার (রহঃ) এর মাযারে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে প্রদত্ত তথ্য, যা গবেষক সরেজমিন গিয়ে সংগ্রহ করেছেন।

৯৮. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস গ্রন্থে জনাব মহসিন হোসাইন তার কারামত সম্পর্কে বলেন- "একবার দুদোমাতাল নামক এক ব্যক্তি নুরুদ্দিন সাহেবের গাছের কলা চুরি করতে গেলে কলা গাছের কাছেই হাত-পা আটকে যায় এবং সারারাত

করেন। বাগদাদ থেকে আসার কারণে তাঁকে বোগদাদী হিসেবে সম্বোধন করা হয়। এতদাঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে (আনুমানিক) ইন্তেকাল করেন।[৯৯]

সৈয়দ আহমদ 'আলী সিদ্দিকী (রহঃ)

প্রখ্যাত ওলীয়ে কামিল শাহ সূফী কারামতুল্লাহ বোগদাদী (রহঃ) এর সুযোগ্য পুত্র সৈয়দ আহমদ 'আলী সিদ্দিকী মাগুরার মুহাম্মদ পুরের নাকোল গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। যশোবন্ত পুরের পীর হযরত মাওলানা 'আবদুল লতিফ সাহেব ছিলেন তাঁরা জামাতা। অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে সৈয়দ আহমদ 'আলী সিদ্দিকী (রহঃ) স্মরণীয় হয়ে আছেন।[১০০]

হযরত মাওলানা সামসুদ্দীন (রহঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার মৎস রাঙ্গা (মাছ রাঙ্গা) মাওলানা সামসুদ্দীন (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। একজন পীর হিসেবে এতদাঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ইসলাম প্রচার-প্রসারে এ মহান পীরে কামিল ব্যক্তির অবদান চির স্মরণীয়। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইন্তেকাল করেন। মৎস রাঙ্গা গ্রামে মাযার রয়েছে। প্রতি বছর এখানে ফাল্গুন মাসে ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।[১০১]

হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (ফুরফুরা শরীফের পীর কিবলা) ঃ

বৃহত্তর যশোর-খুলনা তথা দক্ষিণবঙ্গে বিদ'আত দূরীকরণ ও ইসলাম প্রচারে যে সকল সূফী-পীর মাশায়েখ আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ভারতে যখন মুসলমানরা ইংরেজদের দমননীতির শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়া জাতিতে পরিণত হয় তখন মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য সূফীয়ায়ে কিরাম ও 'আলিম সমাজ আন্দোলন শুরু

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। পরদিন সকালে পীর নুরুদ্দিন সাহেব এসে দুদোমাতালকে কলাবাগান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।" দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

৯৯. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১০৮।

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-৯।

১০১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেন; এদের মধ্যে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ) [১০২] যে বিপ্লবী ও সংস্কার আন্দোলনের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেন- উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এসে তদানীন্তন বাংলা ও আসামের বুকে সেই আন্দোলনের পতাকা উত্তোলন করেন ফুরফুরা শরীফের পীর কিবলা হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ)।[১০৩] বাংলাদেশের যশোর খুলনা অঞ্চলেই তার পদচারণা বেশি ছিল।[১০৪]

তিনি ১২৬৩ হি:/১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ফুরফুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১০৫] ১৩৪৫ সালের ৩রা চৈত্র ১৯৩৯ খ্রিঃ ১৭ই মার্চ এই মহান পুরুষের ইন্তেকাল হয়। ফুরফুরায় তার মাযার অবস্থিত।[১০৬] তাঁর পিতার নাম মৌলভী মাখদুম আবদুল মুকতাদির এবং মাতা মহব্বতুন নিছা। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রহঃ)-এর অধ:স্তন বংশধর।[১০৭] তাঁর উর্ধ্বতন পুর্বপুরুষ মানছুর বাগদাদী (৭১৪হি:/১৩৪০ খ্রিঃ) সম্রাট আলাউদ্দীন খলজীর সময় ইসলাম প্রচারার্থে বাগদাদ হতে ভারতবর্ষে আগমন করে হুগলী জেলার মোল্লাপাড়ায় বসবাস আরম্ভ

---

[১০২]. সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভী সংগ্রামী ধর্মীয় নেতা। অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরলী জেলায় ১৭৮৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১০ সালে তিনি রাজপুত যান এবং সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন। ১৮২১ সালে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন এবং আরবে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পেশোয়ার হতে কাশ্মীর যাবার পথে শিখদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং ঐতিহাসিক বালাকোট ময়দানে ১৮৩১ সালে শহীদ হন। দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদিত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ই.ফা. বা., ১৯৮৬), পৃ. ৯৬।

[১০৩]. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪৬; মহসিন হোসাইন, "শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ)", *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, অগ্রপথিক সংকলন*, ই.ফা.বা. ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৪৫৫।

[১০৪]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৮।

[১০৫]. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদিত গ্রন্থ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫), পৃ. ৪৯; আব্দুস সাত্তার, *মোহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দিক (রহঃ) পীর কেবলার জীবন চরিত* (কলিকাতাঃ ইসলামিয়া আর্ট প্রেস ১৯৩৯), পৃ. ৬; *সংসদ বাঙালা চরিতাভিধান*, প্রধান সম্পাদক, সুবোধ চন্দ্রগুপ্ত (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬), পৃ. ৪৩; দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম হুসেন তর্কবাগিশ, *হকিকতে ইনসানিয়াত* (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সাল প্রেস, ২য় সং, ১৯৭৮), পৃ. ৩; অবশ্য তার জন্ম সাল বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 'জুলফিকর আহমদ কিসমতি তার গ্রন্থে আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর জন্ম সাল ১৮৪১ বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ* 'প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড (ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৬২; অধ্যাপক আবূ তালিব উল্লেখ করেছেন- ১৮৪৯ সালই তার জন্ম সাল। দ্রঃ *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৩৯; অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) প্রবন্ধে আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর জন্ম সাল ১৮৪৮ বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, অগ্রপথিক সংকলন*, পৃ. ৪৪৪।

[১০৬]. আব্দুস সাত্তার, *মোহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) পীর কেবলার জীবন চরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।

[১০৭]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৭; মাওলানা রুহুল আমিন, *হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী* (ঢাকাঃ ই. ফা. বা.), পৃ. ৬-৭; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, অগ্রপথিক সংকলন*, পৃ. ৪৪৩; মহসিন হোসাইন, *অগ্রপথিক সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১০৮] অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) মাতার তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় ফুরফুরা শরীফে। পরে মুহসীনীয়া মাদ্‌রাসা থেকে মাদ্‌রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে তিনি কলকাতার সিন্দুরিয়া পট্টি মসজিদে মাওলানা হাফেজ জামালউদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাফসীর, ফিকহ ও হাদীস অধ্যয়ন করেন।[১০৯] এছাড়া তিনি মক্কা ও মদীনা শরীফ হতে চল্লিশ হাদীসের সনদ লাভ করেন। ফলে ইসলামী শাস্ত্রে তার গভীর পান্ডিত্য অর্জিত হয়।[১১০] বিশেষত ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ‘ইলমি মা'রিফাতের কামালিয়াত অর্জনের জন্য তিনি কলকাতায় সূফী ফতেহ আলী (মৃ.১৮৯৬ খ্রিঃ) এর নিকট বাই‘আত[১১১] গ্রহণ করেন। আবূ বকর সিদ্দীকী তাঁর খিলাফত লাভ করেন। তিনি দু'বার হজ্জ সম্পন্ন করেন।[১১২]

---

১০৮. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, (১৯৮৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১-২২।

১০৯. *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, পৃ. ৬৬-৬৭; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, অগ্রপথিক সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪-৪৫৬।

১১০. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬; মোহাম্মদ রুহুল আমিন, *পূর্বোক্ত*, ১৩-১৪; *অগ্রপথিক সংকলন, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৪৫৬; মাওলানা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ সিদ্দিকী সংকলিত, *'আমিরু শরীয়াত মুজাদ্দেদে মিল্লাত ফুরফুরা পীর সাহেবের জীবন চরিত* (সিরাজগঞ্জঃ এহিয়া প্রেস, তা.বি.), পৃ. ১০-১১।

১১১. **বাই'য়াতঃ** বাই'য়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাহাবায়ে কিরাম, রাসূল (সঃ) এর নিকট বাই'য়াত হয়েছেন। বাই'য়াত (بيعة) শব্দটি আরবী بيع শব্দ থেকে নির্গত। بيع অর্থ-বেঁচা-কেনা, লেন-দেন, বিক্রি করা-খরিদ করা। এ শব্দটি বিক্রয়-ক্রয় উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে এর আসল অর্থ বিক্রয় এবং এই বিক্রয়ের কাজটিকেই بيعة বলা হয়। بيعة শব্দের মূল অর্থ বিক্রয় হলেও এর গৌণ অর্থ হল চুক্তি, শপথ, অঙ্গীকার। যেহেতু বেচা-কেনার ব্যাপারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে সব শর্ত (Terms) ঠিক করা হয় তা মেনে নেয়ার চুক্তির ভিত্তিতেই লেন-দেন হয়ে থাকে; সেহেতু بيعة শব্দটি চুক্তি, শপথ, অঙ্গীকার, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আনুগত্য স্বীকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। Milton Cowan সংকলিত معجم اللغة العربية المعاصر গ্রন্থে بيعة এর অর্থ লিখা হয়েছে- agreement, arrangement, bussiness deal, commercial transaction, bargain, sale purchase, homage etc.; উদ্ধৃতঃ অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাইয়াতের হাকীকাত* (ঢাকাঃ আল-আযামী পাবলিকেশন্স, ১১তম প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ৩-৪; আর শরীয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 'আলিমে দীন বা বুজুর্গের নিকট অথবা ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সপে দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত। দ্রঃ অধ্যাপক মাওঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, *কুর'আন ও হাদীস সঞ্চয়ন*, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড (ঢাকাঃ ভূঁইয়া প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২৭; বাই'য়াত সম্পর্কে আল্লাহ কুর'আনে বলেন- "إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ – يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ" অর্থাৎ হে রাসূল! যে সব লোক আপনার নিকট বাই'য়াত হচ্ছিল তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাই'য়াত হচ্ছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতের হাত ছিল। আল কুর'আন, সূরাঃ ফাতহ, আ: ১০; অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- "لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী যে সময়ে পরিণত বয়সে উপনীত এবং যখন তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা সে সময়ে বাংলাদেশসহ গোটা ভারতের মুসলমানের জীবনে চরম দুর্দিন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশ তখন ঝঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের জীবনে চরম দূর্দিন নেমে এসেছিল। তাদের উপর বিপদের পাঁহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। ঠিক এমনই সময়ে পীর সাহেব কিবলা বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।[১১৩] তাঁর জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর স্পষ্টতই পাওয়া যায়। মূলত তিনি ছিলেন উচ্চ স্তরের সূফী-সাধক, ইসলাম প্রচারক, সংস্কারক, দক্ষ সংগঠক ও যুগ স্রষ্টা চিন্তানায়ক।[১১৪] তাঁর নেতৃত্বে ফুরফুরা সিলসিলা গড়ে ওঠে।[১১৫] এই ফুরফুরা সিলসিলা ভিত্তিক যে ইসলামী সংস্কার ও প্রচার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তা যশোর-খুলনাসহ সারা বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ তুলেছিল। যুগ ও সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ আন্দোলন ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষিত সকল শ্রেণীর মুসলমানদের একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিল। যশোর-খুলনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরা সিলসিলার 'আলিম ও অনুসারীদের অবদানই সবচাইতে বেশি।[১১৬] মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি শিরক ও বিদ'আত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে তা প্রচার করেন।[১১৭] এছাড়া বাংলা ভাষায়

"يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ" অর্থাৎ- হে রাসূল! আল্লাহ মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বাই'য়াত হচ্ছিল। দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ ফাতহ, আ: ১৮; এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে عن عبد الله بن دينار رضى انه سمع عبد الله بن عمر رضى يقول كنّا نبايع رسول صعلم على السمع والطاعة يقول لنا فيها استطعتم (مسلم)– অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- عن عبادة بن الصامت رضى قال بايعنا رسول الله صلعم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط و المكره و ان لا ننازع الأمر اهله و ان نقوم بالحق حيث كنّا لا نخاف لومة لائم (نسائي) উদ্ধৃত: *কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন*, পৃ. ২৮।

১১২. মাওলানা এম. ওবায়দুল হক, *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ* (নোয়াখালীঃ রশিদ ব্রাদার্স, ১৯৬৯), পৃ. ৩৮।

১১৩. *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, পৃ. ৬২।

১১৪. *খাজা আবদুল মজিদ শাহঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৮।

১১৫. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৫।

১১৬. *খাজা আবদুল মজিদ শাহঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৮।

১১৭. এ সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- মিহির, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, নবনূর, মোসলেম, হিতৈষী, ইসলাম দর্শন, হানাফী, শরীয়তে ইসলাম, আল-ইসলাম ইত্যাদি। দ্রঃ *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, পৃ. ৬২-৬৩; *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, অগ্রপথিক সংকলন*, পৃ. ৪৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ সহ বিভিন্ন বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বলা আবশ্যক, সে সময়ে আরবী ভাষার বাইরে অন্য কোন ভাষায় ইসলামের প্রচার সম্পূর্ণ হারাম ফতওয়া দেয়া হত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলার মুসলমানদের এগিয়ে নিতে হলে তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। মুসলমানদের কুসংস্কার ও খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন' নামক একটি ইসলাম প্রচার সংস্থা গঠন করেন।[১১৮] এছাড়া বাংলার 'আলিম সমাজকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে তিনি ১৩২৯বাং/১৯২১ খ্রিঃ 'জমইয়াত-ই-ওলামায়ে বাংলা' গঠন করেন।[১১৯] ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম স্বার্থরক্ষায় এই সংগঠন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১২০]

মোটকথা, তার গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সিলসিলা ভিত্তিক কার্যক্রম যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছিল। বর্তমান শতকেও যশোর-খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে এই সিলসিলার তৎপরতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে নৌপথের সুবিধা থাকায় এর পুরোপুরি তিনি কাজে লাগিয়েছেন। এ অঞ্চলে তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও ও'য়া্য-নসীহত এবং স্কুল-মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছেন। তাঁর মুবাল্লিগদের মধ্যে এ অঞ্চলে মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) ও মাওলানা মোয়েজউদ্দীন হামিদীর নাম উল্লেখযোগ্য। [১২১] তাই যশোর-খুলনার ইসলাম প্রসার-প্রসারে এ মহান ব্যক্তির অবদান চিরস্মরণীয়।

মুন্সী জহিরুদ্দীন (১৮১১-১৯৩১)

হাজী তিতুমীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিক মুন্সী জহিরুদ্দীন যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার খাজুরা গ্রামে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিতুমীরের জিহাদ আন্দোলন ইংরেজদের

---

[১১৮]. এই সংগঠনে বহু অবৈতনিক এবং ১৩ জন বেতনভোগী ইসলাম প্রচারক নিযুক্ত করা হয়। এ সংগঠনের কাজ ছিল প্রচারকগণ পল্লীতে ঘুরে ঘুরে মক্তব, মাদ্‌রাসা স্থাপন, সালিশী, বিচার বোর্ড গঠন, সংবাদপত্র প্রচার, অমুসলমানকে মুসলমান করা, সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহ মীমাংসা করা। বায়তুল মাল ফাণ্ড স্থাপন, যুবক সমিতি গঠন ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করতে লোকদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা। দ্রঃ মোহাম্মদ রুহুল আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯-৭০; *অগ্রপথিক সংকলন*, পৃ. ৪৪৫-৪৬।

[১১৯]. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা* (ঢাকাঃ ই. ফা. বা. ১৯৯৫), পৃ. ৯৬; *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, পৃ. ৬৫।

[১২০]. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১।

[১২১]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৮-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

রোষানলে পড়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তিনি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ২২ নভেম্বর কলকাতার পত্নীতলা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমান জাতির জাগরণ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ফুরফুরা শরীফের পীর আবূ বকর সিদ্দীকী(রহঃ) এর সাথে সারা ভারতবর্ষে তিনি প্রচারাভিযানে অংশ নেন। তিনি একজন উঁচুমানের বাগ্মী ছিলেন। লেখক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তিনি 'রত্নখনি' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মুন্সী জহিরুদ্দীন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে খাজুরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১২২]

মাওলানা শাহ মোহাম্মদ 'আবদুল করিম ঃ

শুধুমাত্র যশোর জেলায় ইসলাম প্রচারে যাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ 'আবদুল করিম অন্যতম। তিনি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে যশোর শহরের উপকণ্ঠে খড়কীতে বিখ্যাত পীর পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন।[১২৩] তাঁর পিতার নাম শাহ মোহাম্মদ চিশতি একজন কামিল পীর ছিলেন। [১২৪] যতদূর জানা যায়- মাওঃ শাহ 'আবদুল করিমের পূর্ব পুরুষ হলেন হযরত শাহ সূফী সুলতান আহমদ। তিনি মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে সেনাপতি রাজা মানসিংহের পদাতিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে যশোরে আগমন করেন এবং যশোর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে থেকে যান।[১২৫] তৎকালে যশোরের চাঁচড়ার রাজা ছিল শুকদের সিংহরায়। তিনি সম্রাট আকবর ও রাজা মানসিংহকে খুশি করার জন্য শাহ সূফী সুলতান আহমদকে রাজবাড়ির খিড়কীর দিকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন।[১২৬] সূফী সুলতান আহমদ তথায় বসবাস করেন এবং অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান

---

[১২২]. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৪৯।

[১২৩]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৪; শেখ জমিরুদ্দীন, *আমার জীবন ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত* (রাজশাহীঃ নতুন সংস্করণ ১৯৬৭), পৃ. ১৭; শাহ মাহমুদ বখত চিশতী, *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ১৯৮৭), পৃ. ৩৫; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১০; মোঃ আমিরুল ইসলাম, *যশোর জেলায় শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৭), পৃ. ৩২।

[১২৪]. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১০; *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা*, পৃ. ৩৫।

[১২৫]. *আমার জীবন ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত*, পৃ. ২৯; *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা*, পৃ. ৩৫; *খাজা আবদুল মজিদ শাহঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৪।

[১২৬]. *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা*, পৃ. ৩৫; মুহাম্মদ আবূ তালিব, *যশোর জেলায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯১), পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ সূফী 'আবদুল করিম।[১২৭] তিনি কলকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে যশোর ফিরে আসেন এবং ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি যশোর জেলা স্কুলে কিছু দিন প্রধান মাওলানা হিসেবে শিক্ষকতাও করেন।[১২৮]

শাহ 'আবদুল করিম পূর্ব পাঞ্জাবের প্রখ্যাত সূফী সাধক খাজা আবূ সা'দ মুহাম্মদ 'আবদুল খালেকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কাদরিয়, চিশ্‌তিয়া, নকশ্‌বন্দীয়া, মুজাদ্দিদিয়া ইত্যাদি তরীকার খিলাফত ও সিলসিলা লাভ করেন। অতঃপর দেশে ফিরে এসে ইসলাম প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার বিশেষ করে সমাজের কুসংস্কার দূর করার ও মুসলমানদের আত্মসংশোধনের ব্যাপারে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলেন।[১২৯] বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক এসে তার নিকট মুরীদ হয়। তিনি এদেশের মানুষকে তাওহীদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।[১৩০] এই মহান সাধক বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মৌলিক ও বিস্তারিত তাসাউফ গ্রন্থ লিখে অমর হয়ে রয়েছেন।[১৩১] তত্ত্ব ও সাহিত্যের দিক বিবেচনায় তাঁর লিখিত 'এরশাদে খালেকীয়া' নামক তাসাউফ গ্রন্থ খানিকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৩০৬-১হি:/১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ।[১৩২] উল্লেখিত সূফী তাত্ত্বিক বই পড়েই ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (সমসাময়িক শাহ

---

১২৭. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ৯৯-১০০; *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা*, পৃ. ৩৫।

১২৮. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৩৬; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৪।

১২৯. মোঃ আমিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১০; *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা*, পৃ. ৩৫-৩৬।

১৩০. *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা*, পৃ. ৩৬।

১৩১. *প্রাগুক্ত; খাজা আবদুল মজিদ শাহঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৪।

১৩২. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৮০; *খাজা আবদুল মজিদ শাহঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৫; 'এরশাদে খালেকীয়া' গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রয়াত সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন- 'আব্দুল করিম ছিলেন নকশ্‌বন্দীয়া তরীকার একজন কামিল সূফী সাধক। নিজের জীবনে সূফী তত্ত্বের আমল করেছিলেন বলে দুরূহ সূফীতত্ত্ব সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল। বইটির প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি তাসাউফের জটিল দার্শনিক তত্ত্বের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং পঞ্চম থেকে নবম অধ্যায়ে তিনি সূফী সাধনার নকশ্‌বন্দীয়া, কাদিরীয়া এবং চিশতিয়া তরীকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। দশম বা শেষ অধ্যায়ে তিনি বেদ-পুরাণাদিতে প্রচলিত দার্শনিক বিষয়বস্তুর তত্ত্ব উদঘাটন করে ইসলামী সূফী মতবাদের সঙ্গে তার একটি তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। শাহ আবদুল করিমের 'খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বের' মত বাংলায় তাসাউফ সম্পর্কিত বই আর দ্বিতীয়টি দেখা যায়না। বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে এ পুস্তকখানা সাধনার পথিকদের জন্য একখানা মূল্যবান গ্রন্থ।' দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুল করিম সাহেবের সাথে যশোর স্কুলে একসাথে শিক্ষকতা করেছেন) তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।[১৩৩]

শাহ 'আবদুল করিমের অনেক কারামত জনশ্রুতিতে রয়েছে। এই মহান সূফীর অনেক মুরীদই ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজেদের উৎসর্গ করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। এদের মধ্যে কর্মবীর মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা তাঁর অন্যতম শিষ্য।[১৩৪] এছাড়া এখনো খড়কীতে তাঁর অসংখ্য মুরীদ ভক্তের আগমন ঘটে।[১৩৫] তাওহীদের এই বাণী প্রচারক ১৯১৫' খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মুতাবিক ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩২২বাংলা সনে খড়কীতে নিজের খানকাহ্ শরীফে ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে যশোর পৌরসভা তাঁর নামে শহরে একটি সড়কের নামকরণ করেছে।[১৩৬] যশোর তথা সারা বাংলার মানুষের কাছে ইসলামী দা'ওয়াতের মিশন পৌছানোর প্রচেষ্টায় এই আধ্যাত্মিক সাধক যশোরের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মুহাম্মদ 'আলী শাহ (রহঃ) ঃ

যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে মুহাম্মদ 'আলী শাহ ইরানী (রঃ) এর অবদান স্মরণীয়। তিনি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নওয়াপাড়ায় আগমন করেন।[১৩৭] তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরান থেকে যশোরের নওয়াপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। যশোর জেলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ পরিবারের অবদান অপরিসীম।[১৩৮]মুহাম্মদ 'আলী শাহ (রহঃ) এর পূর্ব নাম শের মুহাম্মদ। তিনি ইরানের সিস্তান

---

১৩৩. *প্রাগুক্ত; যশোর জেলায় ইসলাম,* পৃ. ৮০।

১৩৪. *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা,* পৃ. ৩৬।

১৩৫. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৬৪।

১৩৬. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১১২; *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যারা,* পৃ. ৩৬।

১৩৭. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৭৩।

১৩৮. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

জাহিদান[১৩৯] প্রদেশের রাজধানী ফিরোজাবাদে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ।[১৪০] ফিরোজাবাদ,[১৪১] আফগানিস্তান ও দক্ষিণ পাকিস্তানের নিকটবর্তী হওয়ায় করাচীর সাথে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।[১৪২] তাঁর পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে অধ্যাপক আবূ তালিব উল্লেখ করেন- "মুহাম্মদ 'আলী শাহ ফিরোজাবাদ রাজ্যের এক রাজ পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতার নাম আতা মুহাম্মদ। তাঁর বংশের পূর্ব পুরুষ খাজা মিরান থেকে যে রাজ বংশের সূত্রপাত, তাঁর পিতা 'আতা মুহাম্মদ তাঁর থেকে পঞ্চম পুরুষ।"[১৪৩] মুহাম্মদ আলী শাহের প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষার হাতে খড়ি তাঁর মায়ের কাছেই। পরবর্তীতে করাচীতে পূর্ব হতে বসবাসরত তাঁর মায়ের চাচাতোভাই মীর 'আব্বাসের কাছে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাকে লেখা-পড়ার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। বলা বাহুল্য, অতি অল্প বয়সে তিনি এক দরবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।[১৪৪] মামার কাছে অনুমতি নিয়ে তিনি সেই কামিল মুর্শিদের সন্ধানে করাচী হতে

---

১৩৯. সিস্তান-জাহিদান ইরানের সর্ব দক্ষিণে আফগান সীমান্তবর্তী একটি প্রদেশ। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

১৪০. *প্রাগুক্ত*, অবশ্য অধ্যাপক আবূ তালিব "যশোর জেলায় ইসলাম" গ্রন্থে তার জন্মকাল ১৮৬২/৬৩ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৪২; উল্লেখ্য, পারিবারিক সূত্র এটিকে অনুমান নির্ভর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৪১. ফিরোজাবাদ, সিস্তান-জাহিদান প্রদেশের রাজধানী, মুহাম্মদ 'আলী শাহের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ ফিরোজ শাহ এই শহরের পত্তন করেন। তাঁর নামানুসারে ফিরোজাবাদ নামকরণ করা হয়। বর্তমানে শহরটি ইরানের শিল্পাঞ্চল হিসেবে বিখ্যাত। আফগান সীমান্তবর্তী এই শহরটি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রামাণ্য দলীল পাওয়া যায়নি। দ্রঃ *সংক্ষিপ্ত ইরান পরিচিতি, ট্যুরিস্ট গাইড* (ঢাকাঃ ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৫), পৃ. ১৭।

১৪২. মুহাম্মদ ইকবল হোসাইন, খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম, *মাসিক অগ্রপথিক*, এপ্রিল ১৯৯৮, ই.ফা.বা. ঢাকা, পৃ. ৫০।

১৪৩. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৪১; ক্যাপ্টেন ডাঃ এম. ওয়াহেদ তাঁর গ্রন্থে মতটিকে সমর্থন করে লিখেছেন- মুহাম্মদ আলী ইরানের (তৎকালীন পারস্যের) আফগান সীমান্তবর্তী সিস্তান জাহিদান প্রদেশের রাজধানী ফিরোজাবাদের রাজকীয় বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন। দ্রঃ ক্যাপ্টেন ডাঃ এম. এ. ওয়াহেদ, *ইরানী হযরতের জীবন কাহিনী* (খুলনা প্রেস, ১৯৯২), পৃ. ২; তাঁর বংশের উর্ধ্বতন সাতপুরুষ যথাক্রমে ফিরোজশাহ, মালিক মিরণ শাহ, কামাল উদ্দীন শাহ, জাহাঙ্গীর শাহ, আতা মুহাম্মদ শাহ। দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২১।

১৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানে আসেন[১৪৫] এবং পুনরায় হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। পথে বেলুচিস্তানের অন্তর্গত কোয়েটাতে চমন শাহ নামে জনৈক সিপাহীর সহায়তায় সেনাবাহিনীতে সহিসের [১৪৬] চাকুরি নেন।[১৪৭] কিন্তু তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চাকুরি ত্যাগ করে [১৪৮] সিন্ধু আসেন, সেখান থেকে গুজরাট, বোম্বে, ইত্যাদি শহরে ছুটাছুটি করতে থাকেন।[১৪৯] এক পর্যায়ে তিনি তার মুর্শিদ কামিল পীরের[১৫০] সন্ধান পান এবং তার খিদমতে (মুর্শিদের ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত) ৭ বছর অতিবাহিত করেন।[১৫১] স্বীয় মুর্শিদের ইন্তেকালের পর শাহ মুহাম্মদ 'আলী বাগদাদে বড় পীর ʿআবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর মাযার যিয়ারত করেন। সেখান থেকে বোম্বে ফিরে আসেন। বোম্বে হতে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে গিয়ে দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর পুনরায় গোয়া হয়ে বোম্বে পৌছান।[১৫২] এরপর শ্রীলংকায় গমন করে ঐতিহাসিক তালাগাল পর্বতে হযরত আদম (আঃ) এর পায়ের দাগ দেখার জন্য আদম চূড়া দর্শন করেন অতঃপর বোম্বে ফিরে আসেন।[১৫৩] এরপর বোম্বে থেকে অল্প কিছু দূরে রত্নগিরি রাজ্যে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। রত্নগিরিতে অবস্থানকালে তিনি

---

১৪৫. এটি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা, কামিল মুর্শিদীদের সন্ধানে তিনি করাচী হতে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। দ্রঃ কাজী আব্দুর রব, *হযরত মোহাম্মদ শাহ সাহেবের জীবন কাহিনী* (কলিকাতাঃ রেডিয়েন্ট ইসলামিক সেন্টার, ১৯৩৮), পৃ. ১০।

১৪৬. ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনে আগানোর কাজ যে করে তাকে সহিস বলে সম্বোধন করা হয়।

১৪৭. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৭৩-৭৫; *যশোর জেলায় ইসলাম,* পৃ. ৪১-৪২।

১৪৮. কাজী আব্দুর রব, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১।

১৪৯. *যশোর জেলায় ইসলাম,* পৃ. ৪২।

১৫০. এই কামিল মুর্শিদের নাম সা'ঈদ 'আলী ইরাকী (রহঃ) তিনি বাল্যকাল হতেই একাকী দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। দুনিয়া বিমুখ এই দরবেশ সর্বদা আল্লাহর যিকর-এ মশগুল থাকতেন। তার সাথে সাক্ষাতের সময় আলী ইরাকীর ৮০ বছর বয়স হয়েছিল। কিন্তু কাজে কর্মে তাঁকে একজন যুবকের মত দেখা যেত। কোন ক্লান্তির চিহ্ন তার মধ্যে দেখা যেতনা। আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ফরাসী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। এছাড়াও তিনি অনেক ভাষা জানতেন।' দ্রঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, *ইরানী হযরতের জীবনী* (নওয়াপাড়াঃ প্রকাশিকা বেগম রাবেয়া বেগম, ১৯৯৩), পৃ. ১১।

১৫১. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৭৮।

১৫২. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৯-৮২।

১৫৩. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৩; শ্রীলংকা যাওয়ার পথে মুহাম্মদ 'আলী শাহ বোম্বে নগরীতে তাঁর বন্ধু বিখ্যাত হেকিম আজমল খাঁর নিকট থেকে হেকিমী বিদ্যা অর্জন করেন এবং উক্ত হেকিমের পরামর্শেই নওয়াপাড়ায় হেকিমী দাওয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন। দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৩য় খণ্ড (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭), পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানকার অসুস্থ রাণীকে কামালিয়াতের বদৌলতে ভাল করে তুলেছিলেন;[১৫৪] অতঃপর বোম্বে ফিরে আসেন। মুহাম্মদ আলী শাহ বোম্বে হতে আরো কয়েকবার দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, জোহান্সবার্গ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করেন। আফ্রিকার অসংখ্য জনপদে তিনি ব্যাপৃত থাকেন। ইংল্যান্ডের ইউলিয়াম নামক এক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস শুনে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং সাক্ষাতের পর আলজেরিয়া, মরক্কো সফর করে তিনি কেপটাউন প্রত্যাবর্তন করেন।[১৫৫] তিনি কেপটাউন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে জাহাজযোগে কলকাতায় এসে[১৫৬] রাজাবাজারে বসবাস শুরু করেন। তিনি কলকাতা ও বিহারের অনকে অঞ্চলে দীন ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে সক্ষম হন। তাঁর কাছে অনেকেই দীন ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর ভক্ত ও মুরীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতা থাকাকালীন তিনি বিবির মাযার মসজিদের নামায আদায় করতেন। সেখানে খুলনার আলাইপুরের[১৫৭] অধিবাসী হাজী সাদেক আহমদের সাথে তার পরিচয় ঘটে। তিনি প্রসিদ্ধ মাছ ব্যবসায়ী হওয়াতে কলকাতায় আসা-যাওয়া করতেন। সাদিক সাহেব- ইরানী শাহকে খুলনায় আমন্ত্রণ জানান। ইরানী শাহ এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিপুল কিতাব পত্র সহ হাজী সাহেবের নৌকায় খুলনার আলাইপুরে আসেন।[১৫৮] অবশ্য ডাঃ ক্যাপ্টেন ওয়াহিদসহ আরো অনেকের বর্ণনায় তিনি কলকাতা থেকে সরাসরি নওয়াপাড়ায় এসেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মতে- ইরানী শাহ হঠাৎ একদিন কলকাতা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে উদ্দেশ্যহীনভাবেই ট্রেনে চেপে বসেন।

---

[১৫৪]. ইরানী শাহ নওয়াপাড়ায় স্থায়ী বসতি করার পর রাজা-রাণী একবার নওয়াপাড়ায় এসেছিলেন বলে জানা যায়। দ্রঃ *আব্দুস সাত্তার কর্তৃক লিখিত পান্ডুলিপি*।

[১৫৫]. *প্রাগুক্ত;* কাজী আব্দুর রব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১-৪২।

[১৫৬]. ঠিক কোন সালে তার আগমন ঘটেছিল সঠিকভাবে এর লিখিত কোন দলীল পাওয়া যায়নি। তবে পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে ইকবাল হোসাইন উল্লেখ করেছেন- ঘটনাটি সম্ভবত ১৮৯৯ এর শেষ ও ১৯০০ শতকের প্রথম দিকের। দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৮৬।

[১৫৭]. ভৈরব নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 'আলাইপুর' খুলনা জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন শাহের নামানুসারে জায়গার নাম হয় আলাইপুর। কথিত আছে, আলাইপুরের নিকট চাঁদপুরের কাজী বাড়িতে হোসেন শাহ বাল্যকালে জায়গীর থেকে লেখাপড়া করতেন। ভৈরব নদে যখন বড় বড় নৌযান চলত তখন এই আলাইপুরে নদী বন্দর ছিল। কিন্তু ভৈরব মরে যাওয়ায় এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। আলাইপুরের বিপরীতে ভৈরবের দক্ষিণ পাড়ে কাজদিয়া গ্রাম, আরও দক্ষিণে সামন্তসেনা সবই ঐতিহাসিক স্থান। কথিত আছে- শাহজাদা নুসরত শাহ এই এলাকা দিয়ে বাগেরহাট যান এবং খলিফাতাবাদ থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন। মোঃ নুরুল ইসলাম, *খুলনা জেলা* (খুলনাঃ দাউদ প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স ১৯৮২), পৃ. ৩৮৪।

[১৫৮]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

খুলনার পথে ট্রেনটি নওয়াপাড়া স্টেশনে আসলে তিনি নেমে পড়েন।[১৫৯] ব্যাধি ও সমস্যার উত্তরণে[১৬০] এলাকায় ইরানী শাহের নাম দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে খুলনার আলাইপুর, সোলপুর, যুগীহাটি, দিঘলিয়া নামক ইত্যাদি গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করার পর নওয়াপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১৬১] নওয়াপাড়ায় স্থায়ী হওয়ার পূর্বে খুলনার উল্লেখিত অঞ্চল সমূহে এবং এর আশেপাশে অনেকে মুহাম্মদ আলী শাহের ভক্ত ও মুরীদে পরিণত হয় এবং অমুসলিম অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে দৌলতপুরের দিঘলিয়ার মাওলানা কাসেম ছিলেন অন্যতম।[১৬২] এই মাওলানা কাসেমের পরামর্শে তিনি নওয়াপাড়া পীরের পুরাতন বাড়ির স্থানটি নির্ধারণ করেন এবং একটি খড়ের ঘরে ইরানী শাহের থাকার ব্যবস্থা করেন।[১৬৩] পরবর্তীতে বর্তমান স্থানে বাড়ি স্থানান্তর করা হয়। ইরানী শাহ নওয়াপাড়ায় স্থায়ীভাবে বাড়ি করে পারিবারিক জীবন আরম্ভ করেন। সাথে সাথে দ্বীন প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। নওয়াপাড়ায় তিনি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে মানুষকে দীনের দা'ওয়াত দিতেন, সাথে সাথে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বালা-মুসীবতের থেকে মুক্তির জন্য তদবীর দিতেন।[১৬৪] মুহাম্মদ 'আলী শাহের নওয়াপাড়ায় আগমন ও ইসলামী সংস্কার কার্যের খবর সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে অনেক 'আলিমে দীন ও স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য নওয়াপাড়ায় আসেন।[১৬৫]

---

১৫৯. ডাঃ এম. এ. ওয়াহেদ, *ইরানী হযরতের জীবনী* (নওয়াপাড়াঃ মজিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২)। উদ্ধৃত: *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৮৮।

১৬০. ইরানী শাহ তার আধ্যাত্মিক সাধনা ও হেকিমী দাওয়াখানার মাধ্যমে এলাকার এবং দেশের বিভিন্নাঞ্চলের লোকদের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য ঔষধ দিতেন। দ্রঃ আব্দুস সামাদ, *ইরানী হযরতের জীবনী,* পৃ. ১৫-২১।

১৬১. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২২-২৫; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৮৯-৯০; ইরানী পীর সাহেবের বাসনা ছিল যে, যেখানে রেল, নদী ও সড়ক পথ পাশাপাশি থাকবে সেখানে তিনি থাকবেন। তিনি বলেছিলেন- "ম্যায় এ্যায়ছা জাগা হোনা চাহিয়ে জো দারিয়া কা কেনার মে রাস্তাভি বলগামে রহে, আওর ষ্টেশন ভি নজদিক হোনা চাহিয়ে।" দ্রঃ অধীর কুমার দাস, "হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী শাহ" *সাপ্তাহিক নওয়াপাড়া,* ১১ই জানু, ১৯৯৭, পৃ. ২।

১৬২. মাওলানা কাসেম সাহেব ছিলেন একজন স্বনামধন্য 'আলিমে দীন ও খুলনা এলাকার প্রসিদ্ধ শিক্ষক। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। পরপর চারবার সরকারি বৃত্তি লাভ করে তিনি উক্ত মাদ্রাসা হতে জামাতে উলা (ফাজিল) পাস করেন। আরবী, উর্দূ ও ফার্সীতে অভিজ্ঞ এ 'আলিম দেশে ফিরে এসে 'ইলমে দীনের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং ইরানী শাহের একজন শিষ্যে পরিণত হন। দিঘলিয়ায় তার বাড়িতে মুহাম্মদ আলী শাহ বেশ কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। দ্রঃ আব্দুস সামাদ, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২২-২৭।

১৬৩. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

১৬৪. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৯০।

১৬৫. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

এঁদের মধ্যে ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ)[১৬৬] পাঞ্জাবের পীর[১৬৭], রত্নগিরি [১৬৮] রাজা ও ইংল্যান্ডের উইলিয়াম, সেলড্রিক্ অন্যতম।

মুহাম্মদ 'আলী শাহের জীবন ছিল ভ্রমণ কাহিনীতে ভরপুর এক জীবনালেখ্য। তবে তাঁর ঘোরাফেরা বা ভ্রমণের পিছনে লুকায়িত ছিল ইশা'আতে দীন তথা দীন ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং খিদমতে খালক এর মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। শেষ জীবনে যশোরের নওয়াপাড়ায় এসে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে তাবলীগ দ্বীনের কাজ করতে থাকেন। আর এ সময়ে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[১৬৯] তাঁর পাঁচ সন্তানের তৃতীয় খাজা 'আবদুল মজিদ শাহ পরবর্তীতে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নওয়াপাড়া মুহাম্মদী খানকাহ্র গদ্দিনশীন হন। মুহাম্মদ 'আলী শাহ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার স্পীকার সৈয়দ নওশের 'আলীর বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।[১৭০]

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের সূচনাপর্বে বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অধ:পতন ও অবক্ষয়রোধে যে সব ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গ সক্রিয়, আন্তরিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন যশোরের কৃতি সন্তান মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা[১৭১] ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

---

[১৬৬]. ফুরফুরা শরীফের পীর দীনি সফরে এ বঙ্গে প্রায়ই আসতেন। তিনি নওয়াপড়ার ইরানী শাহের কথা জানতে পেরে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। আর তাঁকে সত্যিকার পীর হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করত লোকদেরকে তাঁর কাছে মুরীদ হতে পরামর্শ দেন। দ্রঃ আব্দুস সামাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮-২৯।

[১৬৭]. আব্দুস সামাদের পান্ডুলিপি থেকে জানা যায় "পাঞ্জাবের সুবিখ্যাত পীর নওয়াপাড়ায় এসেছিলেন। উল্লেখ্য কলকাতাস্থ পাঞ্জাবের স্বনামধন্য চিশতীয়া তরীকার পীর কেবলা হযরত মাওলানা বরকতউল্লাহ শাহ (রহঃ) ইরানী শাহের সাক্ষাত লাভের জন্য নওয়াপাড়া খানকা শরীফে এসেছিলেন।" দ্রঃ আব্দুস সামাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫।

[১৬৮]. রত্নগিরি নওয়াপাড়ায় এসেছিলেন এবং পীর সাহেবকে পাকাবাড়ি নির্মাণের জন্য অনেক উপঢৌকণও দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। দ্রঃ *ইরানী হযরত সাহেবের জীবনী*, পৃ. ৩৪।

[১৬৯]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৯২।

[১৭০]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১।

[১৭১]. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র নামের বানান নিয়ে রয়েছে বিভ্রাট ও বিভ্রান্তি। মেহেরউল্লা'র নিজের রচিত পুস্তকে ব্যবহৃত বানান, তাঁর জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ, এবং তাঁর উপর লেখা প্রখ্যাত ভাষাবিদ, পণ্ডিতদের রচনায় ব্যবহৃত নামের বানান এ বিভ্রাট ও বিভ্রান্তির কারণ। সম্প্রতি প্রথমে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ডি. এফ. আহমদ (দৈনিক সংগ্রাম ২০ জুন, ১৯৯৭) এবং পরে নাসির হেলাল মুন্সীর নামের সঠিক বানান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। এ ব্যাপারে নাসির হেলাল সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁর মতে, নামের সঠিক বানান "মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা"। তিনি এ বানানের উৎস

এক ব্যক্তিত্ব। এই মহান ব্যক্তি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর (১০ পৌষ ১২৬৮ বাং) যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার কালিগঞ্জ উপজেলার ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭২] তাঁর পিতা মুন্সি ওয়ারেস উদ্দীন যশোর থেকে চার মাইল পশ্চিমে ছাতিয়ানতলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।[১৭৩] দরিদ্র পরিবারের সন্তান মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা শৈশবেই পিতৃহারা হন। সম্ভবত সেকারণেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর লেখা-পড়া বেশিদূর এগুয়নি। যে কারণে কিশোর বয়সেই তাকে রোজগারের পথ বেছে নিতে বাধ্য হতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি একটি সরকারি চাকুরি নিয়েও তা ছেড়ে দেন এবং স্বাধীন পেশা হিসেবে দর্জির কাজ শুরু করেন।[১৭৪] এ পেশাতে কর্মরত অবস্থায় তৎকালীন মুসলমানদের করুণ অবস্থা তাঁকে ব্যথিত করে তোলে এবং তিনি এর বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার পাশাপাশি যশোর তথা সারা বাংলায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।[১৭৫] যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদানই সবচাইতে বেশি।

উল্লেখ্য, মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র আবির্ভাব কাল ছিল বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক অধঃপতনের যুগ। ব্রিটিশ উপনিবেশ, দেশের পরাধীনতা,

---

হিসেবে ১৩ আষাঢ় ১৩০৯ সালে লেখা একটি ক্ষুদ্র চিঠির নিচে মুন্সীর স্পষ্ট স্বাক্ষর উল্লেখ করেছেন। আমাদের কাছে নাসির হেলাল উল্লেখিত উৎস ছাড়াও মুন্সীর পাঠানো একটি মানি অর্ডার কার্ডের কপি আছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এতে মেহেরউল্লা'র স্বহস্তে প্রেরকের নাম লেখা আছে "মহম্মদ মেহেরউল্লা"। এসব তথ্য প্রমাণের আলোকে আমরা তাঁর নামের সঠিক বানান হিসেবে "মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা" কে গ্রহণ করেছি।

[১৭২]. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, *মেহের-চরিত* (কলকাতাঃ ১৩১৫ বাং), পৃ. ১; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬২; আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা), *যশোর জেলার ইতিহাস* (ঢাকাঃ দিগন্ত প্রচারণী লিমটেড, ১৯৯০), পৃ. ১৮৮; মীর্জা মোহাম্মদ আল ফারুক (সম্পা), *ঝিনাইদহের ইতিহাস* (ঝিনাইদহঃ জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ, ১৯৯১), পৃ. ৯১; মুহাম্মদ শাহাদত 'আলী আনসারী, *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান* (যশোরঃ প্রকাশক শামসুন্ নাহার লিলি, ১৯৮৭), পৃ. ৫৪-৫৫; আলো আরজুমান বানু, *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ঃ তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২), পৃ. ১।

[১৭৩]. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৫; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬২।

[১৭৪]. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩-৫; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৫৫; "মেহেরুল্লাহর প্রথম কর্মস্থল ছিল যশোর জেলা বোর্ড। ১৮৮১ সালে এখানে তিনি সামান্য করণিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। অবশ্য তার পক্ষে এ চাকুরিটি বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যগতভাবে স্বাধীন চেতা। তাই কর্মক্ষেত্রের নিয়মের বাধ্যবাধকতা ছিল তার কাছে একেবারেই অসহনীয়। এজন্য তিনি স্বেচছায় চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীন দর্জি পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।" দ্রঃ আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫।

[১৭৫]. যশোর শহরের অন্তর্গত মজানদী দড়াটানার মোড়ে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র দর্জির দোকান ছিল। তাঁর এ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পাদ্রীরা প্রায়ই ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, পবিত্র কুর'আনের আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা এবং মহানবীর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করত। এতে ধর্মপ্রাণ মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ব্যথিত হন। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার ব্যাপারে তিনি মনস্থির করেন। দ্রঃ আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি জাতীয় জীবনের গ্লানি নানাভাবে বাঙালি মুসলমানদের পরিবদ্ধ করে। ব্রিটিশদের আগ্রাসী তৎপরতায় বাংলা তথা উপমহাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী সংস্কৃতি নিস্পেষিত হয়। ইংরেজদের চক্রান্তে নিস্পেষিত মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব তখন বিপন্ন প্রায়।, অশিক্ষা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।[১৭৬] ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের ধর্ম প্রচারের[১৭৭] সাথে সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমান তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার পাশাপাশি তাদেরকে ধর্মান্তরিতকরণের চেষ্টা করে।[১৭৮]

মুসলিম মিল্লাতের এমনই এক মহা দুর্দিনে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক অকুতোভয় মর্দে মু'মিন বীর মুজাহিদ মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ইসলাম বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। মিশনারিদের কুর'আন ও রাসূল (সঃ) বিরোধী প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলিম জনতাকে জানিয়েছিলেন ইসলামের অমীয় বাণী।[১৭৯] তিনি ছিলেন একাধারে একজন ধর্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক। ইসলাম ধর্মের প্রচার, এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও এর মর্যাদা সংরক্ষণ এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণ কামনা ইত্যাদি ছিল তাঁর জীবন

---

১৭৬. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ভূমিকা; জেমস ওয়াইজের মতে (James Wise) এদেশের মুসলমান জনসাধারণ রাখালহীন (মেষপালকের ন্যায় হয়ে পড়েছিল। cf. James Wise, ***Notes on he Races Cattes and Trades of Eastern Bengal***, London: 1884, p. 2.

১৭৭. ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্যোগ নেয় পর্তুগীজরা। ১৪৯৮ সালে ভাস্কোদাগামা এ দেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ধারার সূচনা করেন। ইউরোপে ক্রুসেডের পটভূমিতে পর্তুগীজরা ছিল চরম মুসিলম বিদ্বেষী। সেই পর্তুগীজরা মুসলিম ভারতে এসেছিল এক হাতে বাইবেল ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে। সাথে ছিল বাণিজ্যের বেসাতি। এদের সম্পর্কে William Hunter লিখেছেন- They were not Traders, but knighterrant and crusaders .... Their national temper had been formed in their contest with the moors (Muslim) at home (A Brief History of the Indian people, 1863, p. 168), ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্লস গ্রান্ড ১৭৯২ সালে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কোম্পানি সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। খ্রিস্টান পাদ্রীরা মুসলমানদের টার্গেট বানায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মফস্বল এলাকায় বিশেষত: নদীয়া, যশোর, খুলনা, মালদহে খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্টান মিশনারিরা রীতিমত দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে নানারূপ নতুন নতুন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হয়। দ্রঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতা, মুন্সী মেহেরুল্লাহ ও আজকের প্রেক্ষিত, খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত '*প্রেক্ষণ*, মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৭৮. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ভূমিকা।

১৭৯. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিন, ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষানুরাগী সেই মানুষটি, প্রেক্ষণ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৫৭-৫৮; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রত।[১৮০] মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা অনুধাবন করেন যে, খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যশোরসহ সমগ্র বাংলার মুসলমানদের সতর্ক করতে হবে। তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে কুসংস্কারমুক্ত করতে হবে। তদুপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে তাদের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হবে।[১৮১] এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেগুলোর মধ্যে সভা-সমিতি, ও'য়াজ-নসীহত করা, বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা এবং ইসলামী বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা রচনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলঃ

ধর্মীয় মাহফিল ও অন্যান্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান ঃ

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা জীবনব্যাপী সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূলত তিনটি যথাঃ ১. খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারকে প্রতিহত করা। ২. ইসলাম প্রচার করা এবং ৩. সমাজ সংস্কার। এসব উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য তিনি বক্তৃতাকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৮২] ইসলাম প্রচার ও মুসলমান সমাজের উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে তিনি বাংলা-আসামের সর্বত্র ধর্ম সভায় বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতিলাভ করেন। উল্লেখ্য, মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা প্রচারকার্য শুরু করেছিলেন তাঁর জন্মস্থান যশোর থেকেই। কারণ যশোরে তখন খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা এমন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এখানকার মুসলমান সমাজ বিপন্নবোধ করছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা যশোর থেকেই তাঁর প্রচারকার্য শুরু করেন।[১৮৩] শেখ হবিবর রহমানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টান পাদ্রীদের অনুকরণে

---

১৮০. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৩।

১৮১. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৪।

১৮২. এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবূ তালিব লিখেছেন- "আমরা আজকাল যে ধরনের ধর্ম সভা বা ওয়াজের মাহফিল করি, মুন্সী সাহেবই তার প্রবর্তক ছিলেন। এর আগে মুসলমানগণ এ ধরনের ধর্ম সভার কথা জানতই না। ধর্ম সভা করে তখন খ্রিস্টান পাদ্রী সাহেবগণ খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াতেন এবং সেই সূত্রে অপর ধর্মের নিন্দা ও বিষোদগার করতেও তারা ছাড়তেননা।" দ্রঃ মুহাম্মদ আবূ তালিব, *মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৩), পৃ. ৫৮।

১৮৩. এ সম্পর্কে "ইসলাম প্রচারক" পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, "যশোর জেলার খ্রিস্টীয়ান প্রচারকগণ বড়ই গলযোগ করিয়া তুলিয়াছেন; বহু সংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাহাদের অযথা কুহুকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদনিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মুন্সী মোহাম্মদ কাসেম প্রমুখ প্রচারক সাহেবানের কঠোর উদ্যোগে খ্রিস্টীয়ানগণের অভিপ্রায় নিস্ফল হইয়াছে।" দ্রঃ *ইসলাম প্রচারক পত্রিকা,* কলিকাতা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯৮বাং/ ১৮৯১ইং; উদ্ধৃত: মুহাম্মদ আবূ তালিব, বাংলার নবজাগরণ ও ইসলাম প্রচারক মুন্সী সাহেব, *প্রেক্ষণ,* মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ৪০; আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৭১; মোশাররফ হোসেন খান, "প্রদীপ্ত এক সূর্য" *প্রেক্ষণ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা প্রথমে হাটে হাটে বক্তৃতা শুরু করেন, এতে তিনি পাদ্রীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের সাথে সাথে ইসলামের মাহাত্ম্য ও গৌরববাণী প্রচার করতে থাকেন। যে কারণে অনেক ধর্মান্তরিত ও নির্লিপ্ত মুসলমান ইসলামের পথে পুনরায় ফিরে আসে। অচিরেই বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতির বিস্তার ঘটে।[১৮৪] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে পিরোজপুরে পাদ্রীদের সাথে তর্কযুদ্ধ এবং রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীনের সাথে কলম যুদ্ধ বাংলার মুসলিম সমাজে তাঁকে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করে। (উল্লেখ্য, পরবর্তীতে জন জমিরুদ্দীন মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র সাথে তর্কযুদ্ধে হেরে গিয়ে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবের পার্শ্বচর ও পরবর্তীতে তাঁর আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন।) বিভিন্ন স্থান থেকে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র ডাক আসতে থাকে। তিনি সানন্দচিত্তে এসব ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার সর্বত্র তর্ক সভা ও ধর্মসভায় বক্তৃতা করতে থাকেন।[১৮৫] এসকল সভার মধ্যে যশোরের কেশবপুরে অনুষ্ঠিত সভাটি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। শেখ হবিবর রহমানের ভাষ্যমতে কেশবপুরের এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩০৬ সালে।[১৮৬]

উক্ত (১৩০৬ বাং) সালেই মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা খুলনাঞ্চলে বেশ কয়েকটি ধর্মসভায় বক্তৃতা করেছিলেন। এ সভাগুলোর মধ্যে পয়গ্রাম কসবা ও দৌলতপুর সভায় জীবনীকার (মুন্সী মেহেরুল্লাহর)

---

১৮৪. কবি আব্দুর রহিম তাঁর আখলাকে আহমদীয়া নামক গ্রন্থে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আর অনুভূতি দিয়ে পয়ার ছন্দে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র প্রশস্তি গেয়েছেন এভাবে-

মুনশী মেহেরুল্লাহ নাম যশোর মোকাম
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম ॥
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণধর
হিদায়েতের হাদী জানো দ্বীনের হাতিয়ার॥
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খ্রীস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া॥
মুসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া
অসার তাদের দ্বীন দিল যে ছাড়িয়া॥

উদ্ধৃত: নাসরিন মুস্তাফা, "জাতির ধ্রুব নক্ষত্র", প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২; মুহাম্মদ আবু তালিব, *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দেশ কাল সমাজ*, পৃ. ৬৫।

১৮৫. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১; মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র জীবনীকার আছিরুদ্দীন প্রধান লিখেছেন- ১৩০৪ সাল হতে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত শেখ সাহেব সহ তিনি (মেহেরুল্লাহ) একত্রে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ পরগণা, বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নদীয়া, যশোর, হুগলী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলায় শহর ও মফস্বলের ধর্ম সভায় বক্তৃতা করে বেড়ান। দ্রঃ শেখ আছিরুদ্দীন, *মেহেরুল্লাহর জীবনী*, জলপাইগুড়ি, ১৯০৯, পৃ. ১৩; উদ্ধৃত: আবুল হোসেন চৌধুরী, *জীবনী গ্রন্থমালা-২৩* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৮০।

১৮৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ* (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), পৃ. ৯।

 Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমাহন যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮৭] জীবনীকার আরো উল্লেখ করেছেন মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব জীবনে কত সভা-সমিতি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। নিখিলবঙ্গের এমন কোন স্থান ছিলনা, যে স্থানে তাঁর মধুর বক্তৃতা ঝংকারে মুখরিত হয়নি।[১৮৮]

ধর্মীয় মাহফিলে বক্তৃতার পাশাপাশি এ সময় তিনি খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে অনেকগুলো প্রকাশ্য বাহাসে (তর্কযুদ্ধ) লিপ্ত হন।[১৮৯] এগুলোর মধ্যে ১২৯৮ বাং সালের আশ্বিন মাসে (১৮৯১ অক্টো:) তৎকালীন বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে অনুষ্ঠিত তর্ক যুদ্ধটি উল্লেখযোগ্য। শেখ হবিবর রহমান একে পাদ্রীদের সাথে মুন্সীর প্রথম প্রকাশ্যযুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। সমকালীন 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্রে উল্লেখিত তথ্যমতে পিরোজপুরের পাদ্রী রেভারেন্ড আর এ স্পার্জন; পাদ্রী টিম্মান ও তাদের দোসরগণের দেয়া চ্যালেঞ্জের জবাব দানে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ এক যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখে পাদ্রীদেরকে পরাজিত হতে বাধ্য করেছিলেন।[১৯০] তাদের দেয় প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি ছিল মুহাম্মদ (সঃ) যদি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও মানবতার মুক্তির দিশারি হন তবে কারবালায় তাঁর প্রিয় দৌহিত্র, পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের এরূপ পরিণতি হল কেন?[১৯১] মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা পাদ্রীর এহেন প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন এভাবে যে- "আখেরী নবী হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবার বর্গের প্রতি মমত্ববোধ করে পাদ্রীসাহেব সত্যিই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু পরের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে তারা নিজেদের ঘরের কথা ভুলে গেছেন। রাসুলুল্লাহ যখন এই দুঃসংবাদ আল্লাহর কাছে জানতে গেলেন, আল্লাহ তা'য়ালা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, দোস্ত তুমিতো তোমার নাতি-

---

১৮৭. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৭৭; শেখ হবিবর রহমানের বর্ণনামতে, "১৩০৬ সালের ৭ই জৈষ্ঠ্য তারিখে সভার দিন ঠিক হয়। ঐ তারিখেই আমার সহিত মুন্শী সাহেব দ্বয়ের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। অতিবৃষ্টির দরুণ ঐদিন সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। সমবেত জনগণকে সম্বোধন করিয়া মুনশী সাহেব সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন মাত্র। আপাতত উহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছিল। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সুন্দরভাবে উক্ত সভার কার্য সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মোপলক্ষ্যে আমাদের স্কুল বন্ধ থাকায় আমার এই সভায় যোগদানের সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তখন যশোহর জেলার অন্তর্গত ঘোষগাতি গ্রামে আমার নিজ বাটিতে গিয়াছিলাম। উক্ত সভা উপলক্ষ্যে আমি দুটি কবিতা লিখিয়াছিলাম; তিনি তাহা শ্রবণে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন, এবং একান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিজ স্নেহগুণে আমাকে 'শিশু কবি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।" দ্রঃ শেখ হবিবর রহমান, *কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ* (কলিকাতাঃ ১৯৩৪), পৃ. ৮১-৮২।

১৮৮. শেখ হবিবর রহমান, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫।

১৮৯. মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ* (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৩), পৃ. ৪-৫।

১৯০. শেখ হবিবর রহমান, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৪।

১৯১. মুহাম্মদ আবূ তালিব, *মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৩), পৃ. ৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

নাতনীদের কথা ভাবছো, এদিকে খ্রিস্টানরা যখন আমার পেয়ারা যিশুকে (যারা তাঁকে আমার পুত্র বলেন) ক্রুশে বেঁধে মেরে ফেলল, আমি স্বয়ং খোদা হয়েই বা তার কি করতে পারলাম। পাদ্রী সাহেবেরা আমার সমস্ত শক্তিই কেড়ে নিয়েছে।"[১৯২]

এছাড়া যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমাতে পাদ্রীগণ একটি খ্রিস্টান মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানকার মুসলমানদের আমন্ত্রণে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সেখানে যান এবং একটি সভা করে মিশনারিদের উদ্দেশ্য পণ্ড করে দেন।[১৯৩] উনিশ শতকের শেষার্ধে 'বিধবা বিবাহ'[১৯৪] নিয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজে তোলপাড় শুরু হয়। মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা এ বিষয়ে ধর্ম সভার মাধ্যমে হিন্দুদের এ আইনের অসারতা প্রমাণ করেন।[১৯৫] এমনিভাবে খ্রিস্টানদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, হিন্দুদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের মধ্যে সঠিক ইসলামী জ্ঞানের আলো পৌঁছানোর জন্য এই মর্দে মুজাহিদ তাঁর অসাধারণ বাকপটুতাকেও কাজে লাগান; যা যশোর তথা সমগ্র বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।[১৯৬]

সাংগঠনিক উদ্যোগ ঃ

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ বক্তৃতা, বাহাসের পাশাপাশি সাংগঠনিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, খ্রিস্টান পাদ্রীদের বক্তৃতার জবাবে শুধু বক্তৃতা বা সাধারণ ও'য়ায-নসীহতের মাধ্যমে স্থায়ী, ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী সাফল্য অর্জন সম্ভব নয় বরং এজন্য প্রয়োজন খ্রিস্টানদের অনুরূপ এমন কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা যেগুলো অবহেলিত ও অল্প শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।[১৯৭] বলা আবশ্যক, সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যে ছিলনা তা নয় কিন্তু সেগুলো ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা যশোর তথা সমগ্র পূর্ববঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের কথা চিন্তা করে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি স্ব-উদ্যোগে কিছু সংগঠন গড়ে তোলেন, এমনকি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য

---

১৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫।

১৯৩. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫।

১৯৪. এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক অবস্থার মধ্যে বৈবাহিক অবস্থা দ্রষ্টব্য।

১৯৫. মুহাম্মদ আবূ তালিব, *মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দেশ কাল সমাজ*, পৃ. ৫৫-৫৬।

১৯৬. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯।

১৯৭. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাধনের নিমিত্তে গড়ে ওঠা কিছু সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। [১৯৮] সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাঁর প্রথম উদ্যোগ- "এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা"। এটিই মুন্‌সী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন।[১৯৯] এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার, খ্রিস্টান মিশনের অনুরূপ মিশন বা সমিতি স্থাপন করে মুসলমানদেরকে সংগঠিত করার মাধ্যমে প্রচার কার্য পরিচালনা করা। [২০০] যশোরের ঘোপ গ্রামের খ্যাতনামা রইস সৈয়দ আবদুল্লাহর বাসভবনে "এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা"র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[২০১] এছাড়া তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টান মিশনারিদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে ও ইসলামের আদর্শ প্রচার করার লক্ষ্যে তাঁরই উদ্যোগে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' গঠিত হয়। নবগঠিত সমিতির সদস্যগণ বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেন মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র উপর। মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সানন্দে এ গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে ফুরফুরা শরীফের পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন।[২০২]এ প্রচার সমিতি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্তির পরপরই মুন্‌সী মহম্মদ

---

১৯৮. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৪।

১৯৯. এটি খুব সম্ভবত ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের আগে কোন এক সময়ে গঠন করা হয়েছিল। দ্রঃ ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা,* ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৮৪।

২০০. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৪-৮৫।

২০১. শেখ জমিরুদ্দীনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সংগঠনের একটি বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র আমন্ত্রণে কলকাতার মুন্সী মেয়ারাজুদ্দীন আহমেদ, মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও মুন্সী শেখ আব্দুর রহিম যশোর শহরে এসেছিলেন। তাদের উপস্থিতিতেই রইস সৈয়দ আব্দুল্লাহর বাসভবনে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভার' প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্রঃ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, *মেহের চরিত* (কলিকাতা: ১৩১৫বাং), পৃ. ৯-১০।

২০২. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন, *সাহিত্য পত্রিকা,* শীত সংখ্যা, ১৩৬৭বাং, পৃ. ৮৯; উল্লেখ্য, যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে মেহেরুল্লাহর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল হওয়াতে তিনি দার্জিলিং-এ বদলি হওয়ার পর মুন্‌সী সাহেবও দার্জিলিং-এ গিয়ে দর্জির দোকান খোলেন। এখানে তিনি বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থাবলি যেমন- বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব ও গীতা প্রভৃতি পাঠ করার সুযোগ পান। এ সময় তিনি মিশরের সোলায়মান ওয়াসি লিখিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ পড়ে খ্রিস্টান ধর্মের অসারতা এবং এর দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর যশোরে ফিরে এসে খ্রিস্টান মিশনারিদের ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা দেখতে পান। এ সময় থেকেই শুরু হয় তাঁর সংস্কার জীবন। পরামর্শের জন্য তিনি কলকাতায় গিয়ে মিহির সম্পাদক মুন্সী রেয়াজুদ্দীন পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী প্রমুখের সাথে আলাপ করে কলকাতার না খোদা মসজিদে এক সভার আয়োজন করেন। সভায় খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার খান বাহাদুর নূর মোহাম্মদ যাকারিয়া প্রমুখ চিন্তাবিদ সহায়তা করেন। সভায় "নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি" নামক একটি সংস্থা গঠিত হয় এবং এর বাংলা ও আসামের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরউল্লাহ ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল সফর শুরু করেন এ সময় থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিদের সাথে তাঁর বাহাস চলতে থাকে এবং তাদের কার্যক্রম ও প্রচার বাধাগ্রস্ত হতে থাকে।[২০৩]

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ "আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম" নামক একটি শিক্ষামূলক সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন। উল্লেখ্য, সে সময় যশোর জেলা সেশন জজ সৈয়দ নূরুল হুদার নামানুসারে সমিতির নামকরণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়।[২০৪] এ সংগঠনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল যশোরের 'মনোহরপুরের' একটি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহর প্রচেষ্টায় এর সঙ্গে একটি মাদ্‌রাসাও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩০৭ বাং সালে অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জৈনপুরের মাওলানা কারামত আলীর নামানুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়- মাদ্‌রাসা-ই কারামতিয়া।[২০৫] উল্লেখ্য, মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ উক্ত মাদ্‌রাসার সেক্রেটারী ছিলেন।[২০৬] তিনি যে একজন শিক্ষানুরাগী, সমাজ-সংস্কারক ও সফল সংগঠক ছিলেন মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ সে সময়ে সরকারের সাহায্য ছাড়াই প্রতিকূল পরিবেশে এ ধরনের একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা ছিল সত্যিই দুরূহ ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ।[২০৭] বলা আবশ্যক, জেলা জজ নূরুল হুদা

উপর। দ্রঃ *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৫৬-৫৮; মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশে মণীষী মেহেরুল্লাহ, *প্রেক্ষণ*, মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, ১৯৯৬- ঢাকা, পৃ.১৭৯-৮০।

২০৩. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, *প্রেক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০; আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭।

২০৪. ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় 'আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম' শিরোনামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রে দেখা যায় ১৩০৬ সালে (১৮৯৯) যশোর মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মাহতাব উদ্দীন সাহেবের প্রযত্নে 'শুভকরী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে প্রথম থেকেই শিক্ষা বিস্তারে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে শুরু করে। পরবর্তীতে ১৩০৯ সালের এক অধিবেশনে ঐ সময়ে যশোরের ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ সৈয়দ নূরুল হুদার অবস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'শুভকরী' নাম পরিবর্তন করে 'নূরুল ইসলাম' বা 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম' রাখা হয়। দ্রঃ মিহির ও সুধাকর, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯বাং; মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, *প্রেক্ষণ পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।

২০৫. মিহির ও সুধাকর, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯বাং; শেখ হবিবর রহমান, *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ*, কলিকাতাঃ ১৯৩৪ ইং, পৃ. ৮৮; ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৪।

২০৬. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৪; মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, '*প্রেক্ষণ*' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।

২০৭. মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত মুসলিম সমাজের জাগরণ সম্ভব নয়। এজন্য তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তার কল্পে জনসাধারণকে উদ্দীপনাময় ভাষায় উপদেশ দিতেন। তাই তিনি বাংলা-আসামের যেখানেই বক্তৃতা করেন সেখানে মুসলমানদের স্কুল, মক্তব, মাদ্‌রাসা স্থাপনের উপর সর্বত্রই বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, পাশাপাশি মাদ্‌রাসা-ই কারামতিয়া প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন। দ্রঃ মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ*, পৃ. ১০; শাহাদত আলী আনসারী, *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ*, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

'মাদ্‌রাসা-ই কারামতিয়া'র একজন পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।[২০৮] 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম' একটি শিক্ষামূলক সংগঠন হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতে এ সংগঠন ভূমিকা রেখেছিল। ১৩০৯ সালে এ সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সাধন ও নিকটবর্তী নদী, খাল পারাপারের জন্য সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। উক্ত সমিতির প্রথম সারির একজন সভ্য হিসেবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র সমাজ সংস্কারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[২০৯]

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ছিলেন একজন সুলেখকও বটে। সাহিত্যের মাধ্যমে যখন ইসলাম তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, চরিত্র কলংকিত ও হীনবীর্য করে চিত্রিত করার প্রবণতা শুরু হয় তখন তার প্রতিবাদের লক্ষ্যে এবং বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব ও অন্যান্যদের উদ্যোগে গঠিত হয় "বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ণী মুসলমান সমিতি"।[২১০] ১৩০৬ বাং/১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে হাবিবুল্লাহ বাহার ও কবি মোজাম্মেল হক উল্লেখ করেছেন।[২১১] এছাড়া তিনি "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি" নামক একটি শিক্ষামূলক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।[২১২] এ সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বাধ্যতামূলক করার দাবি ও প্রচেষ্টা চালানো হয়।[২১৩] মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা আমৃত্যু এ সমিতির কার্যক্রমে একজন বলিষ্ঠকর্মী, উদ্যোক্তা, সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন

---

২০৮. এ সম্পর্কে মাদ্‌রাসার সেক্রেটারী মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা নিজেই বর্ণনা করেছেন- "এই উদার চেতা, স্বধর্মরত, সর্বজন প্রিয়, সুক্ষ্মদর্শী ও সুবিচারক জজ বাহাদুর (সৈয়দ নূরুল ইসলাম) যশোহর থাকাকালীন মাদ্রাসার দরিদ্র সেক্রেটারী (মেহেরুল্লাহ) কে সুমধুর ভাষায় 'ইসলাম মিশন স্থাপন' ও মাদ্রাসা-ই কারামতিয়ার উন্নতি বিধান করতে উৎসাহ প্রদান পূর্বক স্বয়ং সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাহার যশোর আগমণের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ ' নূরুল হুদা' নামের সংস্পৃষ্টে আমরা ' নূরুল ইসলাম সমিতি' 'নূরুল ইসলাম মিশন' ও নূরুল ইসলাম পত্রিকার সূত্রপাত করিলাম।" দ্রঃ নূরুল ইসলাম, পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৩০৮ বাং; যশোর, পৃ. ৮; উদ্ধৃত: ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮।

২০৯. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮; আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।

২১০. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০০; বাংলা ভাষা ও বাংলার স্বার্থরক্ষাকারী অভিভাবক সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সমিতির সভাপতি এবং শেখ আব্দুর রহিম ছিলেন সম্পাদক। দ্রঃ আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০।

২১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

২১২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৫।

২১৩. আবুল হাসান চৌধুরী, *জীবনী গ্রন্থমালা-২৩*, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

করে মুসলিম পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২১৪] বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠায় সমসাময়িককালে খ্রিস্টান মিশনের অনুরূপ 'ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন কতিপয় মুসলিম মণীষী।[২১৫] এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৩১০ সালে ২০ চৈত্র 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার তথা মুসলমান সমাজকে রক্ষা।[২১৬] উল্লেখ্য, মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ছিলেন এ সংগঠনের নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য।[২১৭]

প্রোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়- মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা যেসব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অন্যদের প্রতিষ্ঠিত যেসব সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন সমকালীন যশোর তথা বাংলার ইতিহাসে এসব সংগঠনের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত এসব সংগঠন সে সময় বাংলায় ইসলাম ধর্মপ্রচার এবং ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এসব সংগঠন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের আক্রমণ প্রতিহত করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণ ও সমাজ উন্নয়নে এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে।

বই-পুস্তক রচনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারঃ

বক্তৃতা প্রদান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ইসলাম প্রচারার্থে এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের জবাব দানে সাহিত্য সাধনা তথা পত্র-পত্রিকা প্রকাশের পথ বেছে নেন। কেননা স্ব-জাতি ও স্ব-ধর্মের উন্নয়নে ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে তিনি অনুধাবন

---

২১৪. আনিছুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯; মোহাম্মদ আশরাফুল, *প্রেক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮-৭৯।

২১৫. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৯-২০।

২১৬. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯; সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন মিশন সমিতির যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রস্তাব করেন সেগুলো হলো- "অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানব সমাজে সত্য সনাতন ইসলাম ধর্মের প্রচার, হৃত সচেতন মুসলিম সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি, ইসলাম ধর্মের উন্নতি বিধান কল্পে বাংলা ভাষায় নানাবিধ ট্রাক্ট বা পুস্তিকা এবং পত্রিকাদির প্রকাশ, ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান ও অন্যান্য বিধর্মীদের অযথা আক্রমণ হতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজকে রক্ষার বিধান এবং প্রয়োজনে এসব আক্রমণের প্রতিবিধানের চেষ্টাকরণ, মফস্বল ও গ্রামে ইসলাম প্রচারের জন্য বেতনভোগী স্বেচ্ছা প্রণোদিত বক্তা বা প্রচারক নিযুক্ত করণ ইত্যাদি।" দ্রঃ ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১।

২১৭. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

করেন যে, বক্তৃতার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। একাজে বক্তৃতা প্রদান, সংগঠন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং পুস্তক রচনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।[২১৮] এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহিত্য চর্চা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও লেখা-লেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা ভাষায় তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া কম হওয়াতে সে সকল পুস্তক সমূহ লেখালেখির সাহিত্যিকমান উন্নত না হলেও বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব এবং সহজবোধ্যতার কারণে তাঁর রচিত সাহিত্য পাঠক নন্দিত হয়েছিল।[২১৯] আর সবচেয়ে গুরুত্বের ব্যাপার সমকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে এর গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। বলা আবশ্যক, তিনি নিছক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেননি। বরং মুসলমানদেরকে কুসংস্কারমুক্ত করার জন্য এবং পাদ্রীদের অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যা প্রতিহত করার জন্যই তিনি সাহিত্য সাধনা, বই-পুস্তক রচনা করে তা প্রকাশ করেন।[২২০]

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র সমগ্র রচানবলির সন্ধান পাওয়া যায়না। এছাড়া তাঁর রচনা সংখ্যা নিয়েও নানাজনের নানামত লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক আবূ তালিব মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র রচনা সংখ্যা ৮টি বলে উল্লেখ করেছেন।[২২১] মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি বলে উল্লেখ করেছেন।[২২২] মুস্তাফা নুর-উল ইসলাম 'মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র রচিত ১০টি পুস্তক-পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন।[২২৩] মোহম্মদ শাহাদত

---

২১৮. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, মেহেরুল্লাহ- জমিরুদ্দীনের সাহিত্য সাধনা, *প্রেক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৫১; আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬।

২১৯. এ ব্যাপারে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা নিজেই বলেছেন- "যদিও আমি বাংলা জানিনা, তথাপি ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি। তদ্বারা সমাজের কতকানি উপকার হইয়াছে বলিতে পারিনা; তবে এইমাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয়না।" দ্রঃ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইসলাম প্রচারক পত্রিকা হতে উদ্ধৃত, সম্পাদক, ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৬।

২২০. মুহাম্মদ শাহদত আলী আনসারীর ভাষায়- "তিনি (মেহেরুল্লাহ) সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন মুসলমানদের মনে কুসংস্কার এবং ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর করে ইসলাম সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার জন্য, নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আর পাদ্রীদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অপপ্রচার, অপব্যাখ্যা প্রতিহত করার জন্য। প্রসঙ্গত: অপর ধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য।" দ্রঃ ***মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ*** (১৯৮৩), পৃ. ১১-১২।

২২১. অধ্যাপক আবূ তালিব, ***মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ***, পৃ. ১০২; ***যশোর জেলায় ইসলাম***, পৃ. ৭৯।

২২২. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯।

২২৩. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, ***মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ*** (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আলী আনসারী মুন্সীর রচনা সংখ্যা ৯টি বলে উল্লেখ করেছেন।[২২৪] মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান মুন্সীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯টি বলে জানিয়েছেন[২২৫] আর সম্প্রতি নাসির হেলালের সম্পাদনায় 'মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচনাবলী-১' শিরোনামে গ্রন্থে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ রচনা সংখ্যা ১২ টি বলে উল্লেখ করেছেন।[২২৬] মোটকথা বিভিন্ন লেখক গবেষকদের বর্ণিত গ্রন্থের প্রদত্ত নামসমূহ বিশ্লেষণ করলে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭টি। যেগুলো হল- ১. খৃষ্টান ধর্মের অসারতা, ২. খৃষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ ৩. মেহেরুল এছলাম ৪. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা ৫. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার ৬. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম ৭. বাবু ঈশান চন্দ্র মন্ডল ও চার্লস ফ্রেঞ্চের ইসলাম গ্রহণ (সংগৃহীত) ৮. পান্দেনামা (বঙ্গানুবাদ) ৯. শ্লোকনামা ১০. উপদেশমালা ১১. নবরত্নমালা বা বাংলা গজল ১২. জওয়াবুন্নাছারা ১৩. কারামতিয়া মাদ্রাসা ১৪. মানব জীবনের কর্তব্য ১৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ১৬. ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকাভঞ্জন ১৭. বয়েতনামা ইত্যাদি।[২২৭] উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর সবগুলোই মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র রচিত নয় বলে অনেক গবেষক, পণ্ডিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া এর মধ্যে অনেকগুলো পুস্তক নয় বরং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বলেও উল্লেখ করেছেন।[২২৮] তবে এসব গ্রন্থের অধিকাংশের মূল বিষয়বস্তু ছিল খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অসারতা প্রমাণ পূর্বক তুলনামূলক ইসলামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনা, মুসলমানদের মধ্য থেকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করে তাওহীদের বিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলা এবং তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়াবলি উল্লেখ পূর্বক মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামের অনুসারী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। [২২৯] খ্রিষ্টান ধর্মের অসারতা তথা তাদের অপতৎপরতার বিষয়ে তিনি একাধিক বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এর মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের অসারতা, রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম,

---

[২২৪]. মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

[২২৫]. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। উদ্ধৃত: আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮।

[২২৬]. নাসির হেলাল সম্পাদিত, *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ মুনশী মেহেরুল্লাহ ফাউণ্ডেশন, ১৯৯১), পৃ. ১৪-১৭।

[২২৭]. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১।

[২২৮]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১২।

[২২৯]. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *প্রেক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ, জওয়াবুন্নাছারা, ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধোঁকাভঞ্জন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টান ধর্মের অসারতা গ্রন্থে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা নিজেই উল্লেখ করেছেন-

> "খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারকগণকে যেইরূপ অপর ধর্মের প্রতি নিন্দা ও দোষ প্রকাশ করিতে দেখা যায় সেইরূপ আর কোন সম্প্রদায়কে দেখা যায়না। .. কেবল যাহারা ঈশ্বরের ত্রিতত্বে বিশ্বাস করিবে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে। প্রায়ই খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারক পাদ্রীগণ এইরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা কিঞ্চিত গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, খ্রীস্টানগণ যাহা প্রচার করেন ও যাহা শিক্ষা দেন তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক এবং নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন।"[২৩০]

মুসলমানদের মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করা ও তাওহীদের বাণীতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর "মেহেরুল এছলাম" গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র ভাষায়-

নাড়ার ফকির যারা আছে গাঁয় গাঁয়,
এই ঘুরি বহুজানে ফেলিল দাগায়॥
বহুতি আফছোছ হয় তাহাদের তরে।
বানাইল পশু তারা বহুতর নরে॥[২৩১]

এছাড়া উক্ত গ্রন্থে পারলৌকিক পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন-

যে সকল আহাম্মক নামাজে নারাজ,
বলে পাঁচ ওয়াক্ত কেন পড়িব নামাজ॥
হামেশা ইয়াদ মোরা করি পরোয়ারে,
ডাকিলে কি হবে তায় শুধু পাঁচ বারে॥[২৩২]

তৎকালীন হিন্দু আধিপত্যবাদের সন্ধিক্ষণেও মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের কঠোর সমালোচনা করত এর অসারতা প্রমাণ পূর্বক ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার' ইত্যাদি গ্রন্থ এ ক্ষেত্রে

---

[২৩০]. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, *খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা*, কলিকাতাঃ ১৩১৮, পৃ. ১-২।

[২৩১]. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মেহেরুল এসলাম, উদ্ধৃতঃ *মেহেরুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭-১৮।

[২৩২]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা গ্রন্থে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন-

"মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুগণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পনার বলে মুসলমান ধর্ম ও সমাজকে বিবিধ কুৎসিৎ চিত্রিত করিয়াছেন; আমরা তৎপ্রকার মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া, হিন্দু ধর্ম রহস্য লিখিতে কৃৎ সংকল্প হইনাই। জগতে হিন্দুর ন্যায় কল্পনাপ্রিয় জাতি অতি বিরল। তাহারা সত্য সনাতন অনাদী অনন্ত পবিত্রময় খোদা তা'য়ালাকে বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ অসার ও কাল্পনিক দেব-দেবী, ঘাট-মাঠ, প্রস্তর, বৃক্ষ, পশু-পাখি এবং শিবলিঙ্গ ইত্যাদির পুজা-উপাসনা করিয়া দূর্লভ মানব জীবনটির অপব্যয় করিয়াছেন; আমরা তাহাদিগের জানতি মানতি ধর্মগ্রন্থ সকল হইতে দেব ও দেবী কাহিনী এবং বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করতঃ প্রকাশ করিলাম। যদি সেই সত্যময় অদ্বিতীয় খোদা তা'য়ালার দিকে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলেও আমাদের শ্রম ও জীবন সার্থক হইবে।"[২৩৩]

এছাড়া 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার' মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। হিন্দুদের বিধবা বিবাহ বর্জন নীতির প্রতিবাদ ও মুসলমানদের হিন্দুয়ানি এই অনুকরণ থেকে রক্ষা করার জন্য মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র এ গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।[২৩৪] মেহেরউল্লা নিজেই উল্লেখ করেছেন-

অবলা রমণীকূল চির পরাধীনা
সেই বিধবারা থাকে পতিহীনা
তাও এ ভারতে কতিপয় পাপালয়
ব্যতীত এ পৃথিবীর কুত্রাপিও নয়।[২৩৫]

তিনি এই গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন- "এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলা সমূহের স্থানবিশেষ হিন্দুগত প্রাণ মুসলমান নামধারী বহুতর মিঞা সাহেবেদিগের গৃহে এমনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভুত

---

[২৩৩]. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, *হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ১৬।

[২৩৪]. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[২৩৫]. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার, *মেহেরুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

হইতেছেন।"[২৩৬] মুন্‌সী মেহেরউল্লা এসকল বই পুস্তক ছাড়াও তর্ক-বাহাস ও বক্তৃতার সংকলন আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা বাংলা সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কেননা তিনি বই-পুস্তক লিখেই শুধু ক্ষান্ত হননি; বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ছাড়াও একদল শক্তিশালী ইসলামী লেখকদল সৃষ্টি করে নযীর স্থাপন করেন। যারা পরবর্তীতে স্ব-নামে খ্যাতিও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-অগ্নিপুরুষ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, শাহ্‌ মোহাম্মদ 'আবদুল করিম, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ।[২৩৭]

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা বই-পুস্তক রচনার পাশাপাশি তৎকালীন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর মাধ্যমেও ইসলামের প্রচার-প্রসারে তৎপর হন। তিনি অনুধাবন করেন যে, সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এজন্য তিনি তৎকালীন মুসলমান সাময়িক পত্র সাধনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ইসলাম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি সাময়িক পত্রে নিয়মিত প্রবন্ধ রচনাই শুধু করেননি, বরং তৎকালীন মুসলিম পরিচালিত কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে যথাসাধ্য শ্রম স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে ইসলাম প্রচারক 'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর' 'সোলতান' ইত্যাদি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি এসব পত্রিকাকে সহযোগিতা করেছেন, এমনকি কোন কোনটির পরিচালনার সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। 'কোহিনূর ও নূরুল ইসলাম' নামে দু'টি পত্রিকার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।[২৩৮] আর তিনি "নূরুল ইসলাম" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলে জানা যায়।[২৩৯] বলা আবশ্যক, এই সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি খ্রিস্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ বা কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল জমিরুদ্দীনের সাথে তাঁর কলমযুদ্ধ।[২৪০] জনরেভারেন্ড জমিরুদ্দীন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে, 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' নামে একটি মাসিক-এ আসল কোরআন কোথায়? শিরোনামে ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে পাদ্রী সাহেব প্রমাণের চেষ্টা

---

২৩৬. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৬।

২৩৭. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১৩০।

২৩৮. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৫০-৫১।

২৩৯. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৪৩।

২৪০. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেন(?) আসল কোরআনের অস্তিত্ব কোথাও নেই।[২৪১] মুন্সী মেহেরউল্লা এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রবন্ধের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ঈসায়ী' বা 'খ্রীস্টান ধোঁকাভঞ্জন' শিরোনামে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে। যা ধারাবাহিকভাবে 'সুধাকরে' (২০ ও ২৭ চৈত্র ১২৯৯ বাং এবং ২ বৈশাখ ১৩০০ বাং সাল) প্রকাশিত হয়।[২৪২] এরপর জন জমিরুদ্দীন সুধাকর পত্রিকায় একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন।[২৪৩] উত্তরে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা 'আসল কোরআন সর্বত্র' এ শিরোনামে সুধাকরে অন্য একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন যাতে মেহেরউল্লা'র পান্ডিত্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল।[২৪৪] উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিরোধী মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। জন জমিরুদ্দীন নিজের অবস্থান সম্বন্ধে ভাবতে থাকেন।[২৪৫] এক পর্যায়ে তিনি খ্রিস্টান ধর্মত্যাগ করে মুন্সী মেহেরউল্লা'র হাতে বায়'আত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন[২৪৬] আর মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লার সহযোদ্ধা হিসেবে ইসলাম প্রচারে আজীবন তাঁর পাশে থেকে কাজে আত্মনিয়োগ করেন ।[২৪৭] তাই বলা যায়, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর মাধ্যমেও তাঁর ইসলাম প্রচার-প্রসারে অবদান বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। মুন্সী মেহেরউল্লা'র বক্তৃতা, তর্ক (বাহাস), সংগঠন প্রতিষ্ঠা, বই-পুস্তক রচনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল খ্রিস্টান ও হিন্দুদের অপতৎপরতার প্রতিরোধ করে ইসলামের

---

[২৪১]. জন জমিরুদ্দীন তার প্রবন্ধে বহু কুট যুক্তি ও বাকজালের সাহায্যে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুর'আন শরীফ আসল নয়। আসল কুর'আন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর নির্দেশে অগ্নীদগ্ধ করা হয়েছে। তদস্থলে যে কুর'আন আসল বলে চালানো হয় তাতে মূল কুর'আনের অনেকাংশ এমনকি একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা পর্যন্ত বর্জিত হয়। তাই তিনি প্রশ্ন করেন আসল কুর'আন কোথায়? দ্রঃ শেখ হবিবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩-২৬; *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৩৭; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৫৮-৫৯।

[২৪২]. আবুল হাসান চৌধুরী, *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৯), পৃ. ২৬; শেখ হবিবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৭; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১২৮।

[২৪৩]. ; শেখ হবিবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯-৪০।

[২৪৪]. প্রবন্ধ শেষে মেহেরউল্লা বলেন- "ঈসাঈ, আমরা অনুরোধ করি তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের কোরআন একত্র করে পরস্পরের ঐক্য করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নহে। তাই বলি সর্বত্রই আসল কোরআন," দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।

[২৪৫]. আবুল হাসানের মতে- মেহেরউল্লা'র যুক্তিনিষ্ঠ জবাব, জমিরুদ্দীনের মনে গভীর দাগ কাটতে সক্ষম হয়। এ সময় থেকে তাঁর অন্তর্জগতে ক্রমশ: ভাবান্তরের আভাস দেখা যায়। দ্রঃ আবুল হাসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।

[২৪৬]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৮১; জমিরুদ্দীনের বর্ণনায়- "তাহার পরে অনেক অনেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার পরম ভক্তি ভাজন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব কৃত, রদ্দে খৃষ্টান ও দলীলোল এসলাম, ও শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আব্দুর রহিম সাহেবকৃত ইসলাম তত্ত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করনান্তর পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।" দ্রঃ *শেখ জমিরুদ্দীন আমার জীবনী*, পৃ. ১৭।

[২৪৭]. আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার-প্রসার। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সবই ছিল যুগোপযোগী ও বস্তুনিষ্ঠ। আর এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সফল এক ব্যক্তিত্ব। উল্লেখ্য মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র চিন্তাধারার প্রতি সমকালীন মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল অনুকূল এবং আশা ব্যঞ্জক। খ্রিস্টান এবং হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে মুন্সীর ক্রিয়াকাণ্ডের বাদ-প্রতিবাদ হলেও প্রতিরোধ প্রয়াস ছিল নগণ্য; কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এক রকম ছিলনা বললেই চলে।[২৪৮]

মুন্সী মেহেরউল্লা ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রম, তার ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার ভাবনা সমকালীন মুসলিম সমাজ তথা যশোর অঞ্চলকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। মুন্সীর প্রচেষ্টায় যে ধর্মীয় সম্মেলন/ ও'য়াজ মাহফিলের প্রচলন হয়েছিল তা তৎকালীন মুসলমানদের ধর্মীয়বোধে উদ্বুদ্ধ করা ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ও জড়িত সংগঠন সমূহের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা যে সকল সাহিত্য রচনা করেছিলেন তা তৎকালীন ঘুনেধরা ভ্রান্ত মুসলমান সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে অবদান রেখেছিল। এছাড়া তিনি যে, তরুণ সাহিত্য ও সমাজ সেবী দল সৃষ্টি করেছিলেন পরবর্তীতে তাঁদের হাতে বাংলার মুসলিম জাতি ও তার সাংস্কৃতিক জীবনধারা লালিত ও সমৃদ্ধ হয়। তিনি মুসলমান সমাজের জাগরণের লক্ষ্যে সংবাদপত্রের আশ্রয় নিয়েছিলেন; এসব সংবাদপত্রও বাংলায় মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন পুনর্গঠন এবং সমাজ উন্নয়নে বলিষ্ঠ অবদান রাখে। সুতরাং বলা যায় সমকালীন যশোর তথা বাংলা-আসামের ইতিহাসে যশোরের মুন্সী মেহেরউল্লা এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ, মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত, যুগ সচেতন সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্য সেবক। যশোর তথা বাঙালি মুসলিম সমাজের চরম দুর্দিনে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনার ফলে খ্রিস্টান মিশনারি ও হিন্দুদের প্রবল আক্রমণের কবল হতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজকে রক্ষা, বাঙালি মুসলামনদের ধর্ম, জীবনবোধ ও গৌরব এবং ঐতিহ্যবোধ উজ্জীবিত করণে তিনি যে কর্ম প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন, যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, বাংলার বিশেষ করে যশোরের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামী রেনেসার এ পথিকৃত ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯০৭ সালে শুক্রবার মাত্র ৪৫ বছর বয়সে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৪৯] তাঁর মৃত্যুতে সারা বাংলায় শোকের ছায়া

---

২৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

২৪৯. শেখ জমিরুদ্দীন, *মেহের চরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

নেমে আসে। শেখ হবিবর রহমান অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় এর বিবরণ দিয়েছেন।[২৫০] এছাড়া মেহেরউল্লা'র মৃত্যুতে অনেকের সাথে সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তাঁর শোকোচ্ছ্বাস কবিতায় লেখেন-

যার সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগণে মধুর লগনে পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল রতন হায়কি কখন মিলিবে সমাজে আর
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন বিশ্বময় অন্ধকার।[২৫১]

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি এদেশের মুসলিম জাগরণের অন্যতম অগ্রপথিক।

---

২৫০. তাঁর ভাষায়- "তৎকালে মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'মিহির ও সুধাকর', সোলতান, ইসলাম প্রচারক ইত্যাদিতে সমস্ত সংবাদ শ্লোকগাঁথায় পূর্ণ থাকিত। বাঙলার এমন কোন মুসলমান লেখক ও কবি ছিলেননা, যিনি মুন্সী সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক গভীর শোকোচ্ছাসপূর্ণ কবিতা লিখেন নাই। বাঙলার এমন কোন পল্লী ছিলনা যাহা মুন্সী সাহেবের মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাসে আকুল হইয়া ওঠে নাই। মুসলিম বঙ্গের সেই দারুণ দুর্দ্দিনে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া যে শোকের তুমুল ঝড় বহিয়া গিয়াছিল এমন কোন মোসলেম হৃদয় ছিলনা যে তাহার সহিত নিজের তপ্ত হৃদয়ের হতাশার দীর্ঘশ্বাস মিশায় নাই।" দ্রঃ শেখ হবিবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮।

২৫১. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন

ইংরেজ শাসনামলে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মুসলমান সমাজ যখন এক প্রকার দিশেহারা হয়ে পড়েছিল; মুসলমানদের সেই দুর্দ্দিনে তাঁদের দরিদ্রতা ও অশিক্ষার সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারিরা বিভিন্ন লোভ-লালসায় ভুলিয়ে ব্যাপকহারে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে।[২৫২] মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন ছিলেন তেমনি খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত একজন ব্যক্তি। তিনি মুনসী মেহেরউল্লা'র প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্মে পুনপ্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাঁর (মুনসী মেহেরউল্লা) ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর হিসেবে[২৫৩] ইসলাম প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে তাঁর জীবন চেতনা প্রভাবিত হয়। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং মুসলমান সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুর (মেহেরউল্লা'র) অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেন। মেহেরউল্লা'র জীবদ্দশায় তিনি যেখানেই গিয়েছেন জমিরুদ্দীনও ছায়ার মত তাঁর পাশে থেকেছেন এবং মেহেরউল্লা'র মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত কাজ আঞ্জাম দানে সচেষ্ট হন মুন্সী জমিরুদ্দীন। মুনসী মেহেরউল্লা'র সহচর হিসেবে যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীনের অবদানও ব্যাপক।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান মেহেরপুর) জেলার গাড়াডোব বাহাদুর পুর গ্রামে ১২৭৭ সালের (১৮৭০ খ্রিঃ) ১৫ই মাঘ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ আমির উদ্দীন।[২৫৪] ৫বছর বয়সে জমিরুদ্দীন গ্রামের মক্তবে ভর্তি হন। মক্তবে পড়াকালে তিনি নিয়মিত নামায ও রোযা আদায় করতেন। মক্তব শেষে জমিরুদ্দীন আমঝুপি খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি হন, এখানে কিছুকাল লেখাপড়া করার পর কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন।[২৫৫] কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পাঠকালে তিনি খ্রিস্টধর্মের বই-পুস্তক পাঠ করে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।[২৫৬] ১৮৮৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর নদীয়া

---

[২৫২]. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিন, ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষানুরাগী সেই মানুষটি, *প্রেক্ষণ*, পৃ. ১০৯; শেখ হবিবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

[২৫৩]. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, মেহেরুল্লাহ জমিরুদ্দীনের সাহিত্য সাধনা, *প্রেক্ষণ*, পৃ. ৫৭; মুহাম্মদ রবীউল আলম, *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ই. ফা. বা. ১৯৯৪), পৃ. ২৮; আলো আরজুমান বানু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩।

[২৫৪]. মুহাম্মদ আবু তালিব ও মোহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম সম্পাদিত, *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত* (রাজশাহীঃ নতুন সংস্করণ ১৯৬৭), পৃ. ১; *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১১; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪২।

[২৫৫]. *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত*, পৃ. ১-২; *আঞ্জুমান এত্তেফাক এসলাম*, নদীয়া কুমারখালী, ৬ষ্ঠ বার্ষিক রিপোর্ট, পৃ. ২; *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১১-১২;

[২৫৬]. *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৩-১৪; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪৩।

জেলার চাপড়া গীর্জার পাদ্রী সালিভান সাহেবের নিকট জমিরুদ্দীন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন।[২৫৭] আর তখন তাঁর নাম রাখা হয় রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন।[২৫৮] ১৮৯১ সালে এলাহাবাদ সেন্টপল ডিভিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি বি.টি. এইচ এবং এইচ.জি.আর উচ্চ শ্রেণীর পাঠক বা পাঠকরণ ডিগ্রি লাভ করেন। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে জমিরুদ্দীন বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবী, ফার্সি, উর্দূ, গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সমসাময়িককালে তাঁর মত বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত আর কেউ ছিলেননা।[২৫৯]

১৮৯২ সালের জুন মাসে জমিরুদ্দীন 'খৃস্টান বান্ধব পত্রিকায়' 'আসল কোরআন কোথায়'? শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে সাতদফা কারণ প্রদর্শন করে কুরআন শরীফের মৌলিকত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এই নিবন্ধের দফাওয়ারী দাতভাঙ্গা জবাব দেন ইসলামের গৌরব যশোরের মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। জমিরুদ্দীন ও মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র মধ্যে এ বিষয়ে কিছুদিন বাদানুবাদ, কলম যুদ্ধ চলার পর জমিরুদ্দীন পরাজিত হন। মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা জমিরুদ্দীনের খ্রিস্টধর্মের প্রতি যে আঘাত করেছিলেন তাতে তাঁর মনে খ্রিস্টধর্মের অসারতার ধারণা জন্মে।[২৬০] ফলত: খ্রিস্টধর্ম হতে বেরিয়ে আসলেন শেখ জমিরুদ্দীন। তাঁর নিজের ভাষায়- "আমি যখন খ্রিস্টান ধর্ম মানিনা, তখন আর সমাজে থাকিবনা বলিয়া মিশনারী কার্য পরিত্যাগ ও নিজবাড়ীতে আগমন পূর্বক প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের সমক্ষে মৌলভী রেয়াজউল হক কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হই।"[২৬১] পরবর্তীতে মুন্সী রেয়াজউদ্দীনের পরামর্শক্রমে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র সাথে যোগ দিয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[২৬২] পাদ্রী জন জমিরুদ্দীন ইসলাম গ্রহণ করে হলেন মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন।[২৬৩] এবার স্রোত উল্টো দিকে বইতে আরম্ভ করল। মুন্সী জমিরুদ্দীন ইসলাম সম্পর্কে

---

২৫৭. *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত*, পৃ. ৫; *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৬।

২৫৮. *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৬; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪৩।

২৫৯. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: ১৯৭১), পৃ. ৩০৫; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪৩।

২৬০. আবুল আহসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭; *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত*, পৃ. ১০।

২৬১. আবুল আহসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭; ; *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২২-২৩।

২৬২. *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত*, পৃ. ১৭।

২৬৩. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *প্রেক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও হাদীস বিষয়ে যে জ্ঞান পাদ্রীদের নিকট থেকে লাভ করেছিলেন ইসলামকে ধ্বংস করার মানসে সেই জ্ঞান দ্বারা এবার তিনি খ্রিস্ট ধর্মের অসারতা এবং খ্রিস্টান পাদ্রীদের ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লেখনি ধারন করেন। নিজেকে তিনি ইসলামের সেবায় সম্পূর্ন সপে দেন। দেশের সর্বত্র তিনি অসংখ্য সভানুষ্ঠানে বক্তৃতা করে খ্রিস্টধর্মের অসারতা প্রমাণ এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তিনি প্রবন্ধ-পুস্তিকাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[২৬৪] খ্রিস্টান পাদ্রীগণ জমিরুদ্দীনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করতে চেয়েছিলেন তা এখন বুমেরাং হয়ে পাদ্রীদেরকেই আঘাত করল। জমিরুদ্দীন তাঁর কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইসলামের চিরন্তন সত্য প্রচার করে বহু নব দীক্ষিত খ্রিস্টানকে পুনরায় মুসলমান ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। অনেক জায়গায় পাদ্রীদের সাথে বাহাসে তাদেরকে পরাজিত করেন। যেসব মুসলমান খ্রিস্টান হয়েছিল তারাও মুন্সী জমিরুদ্দীনকে দেখে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতে লাগল। অবিভক্ত নদীয়া, যশোর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার অসংখ্য দরিদ্র মুসলমান যারা খ্রিস্টান হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই মুসলমান হন তাঁর চেষ্টায়।[২৬৫] সে সময় যশোর কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। মুন্সী জমিরুদ্দীন ও মুন্সী মেহেরউল্লা তাদের পুনরায় মুসলমান না করালে এ অঞ্চলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহ।

মুন্সী জমিরুদ্দীন অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদেরকে সজাগ ও তাঁদের ভিতরে ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর এসব পুস্তক রচনা ও তা প্রকাশের ব্যাপারে মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছেন।[২৬৬] মুন্সী জমিরুদ্দীন লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ হল- মেহের চরিত, শোকানল, ইসলাম গ্রহণ, হযরত ইসহাক, পেশ খবর, বাঙালা গজল, ইসলামী বক্তৃতা, ইসলামের সভ্যতা, খতনামা, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন চরিত, হযরত ঈসা কে? পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন, রদ্দে খৃষ্টান, হানুলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য, রদ্দে সত্যধর্ম নিরুপণ ও হেদায়েতুল খৃস্টান, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ, উপদেশ ভান্ডার প্রভৃতি।[২৬৭] এছাড়া তিনি অসংখ্য অনুবাদ

---

২৬৪. *প্রাগুক্ত*।

২৬৫. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪৪।

২৬৬. *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩১-৩২; মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *প্রেক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

২৬৭. *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩৭-৬১; মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *প্রেক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬৩; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ[২৬৮] ও পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর এ সকল রচনাবলি তৎকালীন মুসলিম সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাঁর জীবনাচরণ, বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখনি সব কিছুই ছিল ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য নিবেদিত। এই মহান ব্যক্তি ১৯৩৮ সালে অতিশয় দরিদ্রাবস্থায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।[২৬৯] যশোর তথা পূর্ববঙ্গে ইসলামের সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি যে আত্মত্যাগ করে গেছেন আমাদের ইসলামের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সূফী সদরউদ্দীন

সূফী সদরউদ্দীন ১৮৬৩ সালে শালিখা থানার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন বিভাগের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ধর্মীয় প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। একজন উঁচু মানের সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'ইলমে তাসাউফ' আমার প্রাণের রাসূল নবী মুহাম্মদ (সঃ), বুজুর্গনামা, আকায়েদুল এছলাম, ফজিলতে কুরবাণী ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ মহান ব্যক্তি ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী ফেনীতে ইন্তেকাল করেন। ফেনীতেই তাঁর মাযার রয়েছে।[২৭০]

মাওলানা হাতেম আহমদ

মাওলানা হাতেম আহমদ ১২৭৩ বঙ্গাব্দে নড়াইল মহকুমার কালিয়া থানার জানরিল ডাঙ্গা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ সেরবান উল্লাহ ছিলেন তার পিতা। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পাশ করার পর দেওবন্দ গমন করে শাইখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, মওলানা ইয়াসিন সাহেবের সাহচর্য লাভ করেন এবং হাদীস, তাফসীর ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র ৪ মাসে কুরআন হিফ্‌জ করার মাধ্যমে তার ধী-শক্তির পরিচয় দেন।[২৭১]

---

২৬৮. *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৪৯।

২৬৯. মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, মুন্সী জমিরুদ্দীন, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* (মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬ বাং); *মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২৬; *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ২৪৫।

২৭০. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১৩।

২৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি জীবনে তিনবার হজ্জব্রত পালন করেন। তবে হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জ হওয়ায় তিনি এর অনেক বিষয় শরীয়ত পরিপন্থী বলে তীব্য প্রতিবাদ করেন।[২৭২] তিনি একজন কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এলাকায় অনেক অলৌকিক কর্মকান্ডের কথা জানা যায়। তিনি এলাকায় বহু মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাগ্মী হিসেবেও তিনি ছিলেন উঁচুমানের। যশোর-খুলনা, ফরিদপুর অঞ্চলে ধর্মীয় মাহফিলে বক্তৃতার মাধ্যমে ব্যাপ্ক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। এই ইসলামী ব্যক্তিত্ব বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যপাদে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা 'আবেদ 'আলী

মাওলানা 'আবেদ আলী যশোর সদরের এনায়েতপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা শাহ আসমত উল্লাহর পূর্ব পুরুষ ছিল ইরাকী।[২৭৩] ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দীকী (রহঃ) কে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান। তিনি একজন অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। ইসরাম প্রচারের কাজে ফুরফুরার পীর কিবলার সাথে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ও'য়া'য-মাহফিলে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি দু'বাংলাতেই একাধিক মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশে যশোর জেলার ঘোপ, সাজিয়ালী ও এনায়েতপুর গ্রামের মসজিদ ও যশোরের তীরের হাট সিদ্দিকীয়া মাদ্‌রাসার নাম উল্লেখযোগ্য। মিহির ও সুধাকর নামক আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বলিত একখানা পুস্তক রচনার মাধ্যমে তিনি লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মাওলানা 'আবেদ 'আলী ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ইন্তেকাল করেন।[২৭৪]

---

২৭২. হাম্বলী মাযহাব অনুসৃত হজ্জের নিয়ম শরীয়ত পরিপন্থী মনে হওয়ায় তিনি বিশুদ্ধ আরবীতে জনসমক্ষে এক ভাষণের মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তৎকালীন বাদশাহ ইবনে সউদের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁকে তাঁর দরবারে ডেকে সব কিছু শোনেন। বাদশাহ তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বীয় জুব্বা, ১২টি স্বর্ণমুদ্রা ও হাম্বলী মাযহাবের মশহুর কিতাব "শররবুম বেলোলী" (১২ খন্ড) উপহার দেন। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার*, পৃ. ১৫২-৫৩।

২৭৩. শাহ আসমত উল্লাহর পূর্ব পুরুষ-সৈয়দ শাহ বখশী ও তাঁর ভাই সৈয়দ শাহ হামজা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর ইরাক থেকে আসেন। সে সময়ে দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর এই ইসলাম প্রচারক ভ্রাতৃদ্বয়কে যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠান। তাঁরা যশোর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়। তাদের স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ এখনো শৈলকুপা এলাকায় তাঁদের তৈরি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ও মাযার রয়েছে। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩।

২৭৪. *প্রাগুক্ত*।

আলহাজ্ব মুন্সী 'আবদুল 'আজীজ (রহঃ)

মুন্সী 'আবদুল 'আজীজ যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমান জেলা) মোহাম্মদপুর থানার যশোবন্তপুর গ্রামে আনুমানিক ১২৮০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আরিচ উদ্দীন। তিনি একজন মশহুর ওলীয়ে কামিল ব্যক্তি ছিলেন। এলাকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয়সমূহ সমাধানের জন্য লোকজন তার নিকট আসত। মূলত তিনি কাযীর দায়িত্ব পালন করতেন। এলাকায় তাঁর কারামতের অনেক ঘটনা লোকমুখে শোনা যায়। ইসলাম প্রচারের সুমহান দায়িত্ব পালনে মুন্সী 'আবদুল 'আজীজ ছিলেন অত্যন্ত তৎপর ব্যক্তি। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে হজ্জের শেষদিন শুক্রবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁর কবর রয়েছে। তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করে প্রতি বছর ১ মাঘ যশোবন্তপুরে ওরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।[২৭৫]

মাওলানা 'আবদুল লতিফ (রহঃ)

মুন্সী 'আবদুল 'আজীজ (রহঃ)-এর ভাই মুন্সী 'আব্দুর রহীমের পুত্র মাওলানা 'আবদুল লতিফ ১৩০০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দেওবন্দ থেকে লেখা পড়া শেষ করার পর তিনি প্রথম জীবনে কলকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ৭ বছর মুদাররিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 'আবদুল 'আজীজ সাহেবের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় স্বীয় যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র 'আবদুল লতিফকে খিলাফত দান করেন। চাচার মতই মশহুর ওলীয়ে কামিল হিসেবে মাওলানা 'আবদুল লতিফের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে এই কামিল ব্যক্তির অবদান স্মরণীয়। তিনি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ১৪ই ফাল্গুন মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[২৭৬]

হাজী হাফেজ 'আবদুল করিম

হাজী হাফেজ 'আবদুল করিম সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর/আশির দশকে কালিয়া উপজেলার নলীয়া নদীর তীরবর্তী কলাবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২৭৭] তিনি কলকাতার মাটিয়া বুরুজ মসজিদ সংলগ্ন হেফযখানা হতে হাফিয হন। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারক ছিলেন। আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) প্রতি মুহাব্বত এত তীব্র ছিল যে, তিনি পায়ে হেটে হজ্জব্রত পালন করেন।[২৭৮] জানা যায়, হাফেজ 'আবদুল করিম অল্পবয়সে বাদাখশানের জনৈক তাপস পুরুষের নিকট মুরীদ হন। আর অবিভক্ত

---

[২৭৫]. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১৩-১৪।

[২৭৬]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

[২৭৭]. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৭; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৮৯।

[২৭৮]. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১৯।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর হাতে বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন। তিনি ছিলেন নির্ভিক আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন একজন সিদ্ধপুরুষ। হাফেজ 'আবদুল করিম সাহেব সে যুগে এ অঞ্চলের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন।[২৭৯] কবি হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ১৩১১ বঙ্গাব্দে তাঁর 'নূরুল ইসলাম' ছহি জুলফক্কার হাদী নামক একটি পুঁথি কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁর আর একটি বাক্য 'গুপ্ত কালাম রত্নমানিক' অপ্রকাশিত থেকে যায়।[২৮০] বই দু'খানির নাম থেকে অনুমান করা যায়- গ্রন্থ দু'টিতে ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।[২৮১] দক্ষিণবঙ্গের বহু স্থানে এখনো হাফেজ সাহেবের অগণিত ভক্ত মুরীদ রয়েছে। ইসলাম প্রচারক এই মহান সাধক মাত্র ৪০ বছরকাল জীবিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি ১৯২৭ সালে ইন্তেকাল করেন।[২৮২]

মাওলানা রুহুল আমিন

বাংলাদেশে ইসলামের দা'ওয়াত ও মাহাত্ম্য প্রচারে এবং সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে অনুপ্রবিষ্ট শিরক বিদ'আত ও হিন্দুয়ানি প্রথার উচ্ছেদ সাধনে ফুরফুরা সিলসিলা যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে, মাওলানা রুহুল আমিন পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে যশোর-খুলনাঞ্চলে সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[২৮৩] এই মণীষী ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২ খ্রিঃ) চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার টাকী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী গাযী দবীরুদ্দীন ও মাতার নাম রহীমা খাতুন।[২৮৪] প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাওলানা সাহেব কলকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসা হতে জামা'আতে উলা (ফাজিল) পরীক্ষায় তিনি সমগ্র বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন।[২৮৫]

---

২৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

২৮০. *প্রাগুক্ত; বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৭; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৮৯।

২৮১. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৮৯।

২৮২. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১২০।

২৮৩. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৩৯; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৮-৬৯।

২৮৪. *বাংলাদেশে সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩; মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, মাওলানা রুহুল আমিন, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, *অগ্রপথিক সংকলন*, পৃ. ৪৬০।

২৮৫. *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ.৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবী জ্ঞানার্জন শেষ করে আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য তিনি ফুরফুরা শরীফের স্বনামধন্য পীর হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দীক (রহ:) এক নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং বহু বছর তাঁর সাহচর্যে থেকে ইলমে মা'রিফাতের গভীর জ্ঞান লাভ করেন।[২৮৬] আর পীর সাহেব কিবলার নির্দেশে তিনি যশোর-খুলনাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন। মুবাল্লিগ (ধর্ম প্রচারক) হিসেবে তিনি খুব সফল হন।[২৮৭]

হযরত মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব ছিলেন একাধারে ধর্মপ্রচারক, সংগঠক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ফুরফুরার পীর সাহেব হযরত মাওঃ আবূ বকর সিদ্দীকী(রহঃ) বাংলা ও আসামের 'আলিম সমাজকে একত্রিত করে সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন'[২৮৮] নামে একটি শক্তিশালী প্রচার সমিতি গঠন করেন।[২৮৯] 'আঞ্জুমানে' তেরজন বৈতনিকসহ বহু অবৈতনিক প্রচারক নিযুক্ত ছিলেন।[২৯০] এর সভাপতি ছিলেন স্বয়ং পীর আবূ বকর সিদ্দীকী এবং সেক্রেটারী ছিলেন মাওলানা রুহুল আমিন।[২৯১] একাধিক্রমে ৩০/৩২ বছর যাবত তিনি বাংলা ও আসামের শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সফর করে দিশেহারা মানব সমাজকে পথের সন্ধান দিয়েছেন, বার মাসের একটি মাসও তিনি বাড়িতে থাকতে পারতেননা।[২৯২] তিনি বিদ'আতী ও ভন্ড ফকীরদের সঙ্গে বহুস্থানে তর্ক বাহাসে অংশ নেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন।[২৯৩]

---

২৮৬. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *অগ্রপথিক সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬০-৬১।

২৮৭. মোহাম্মদ এবরাহিম মোহাব্বতী, *হামিদী চরিত* (ঢাকাঃ কামাল লাইব্রেরী ১৩৬৭ বাং, ১ম সং), পৃ. ৭৪; *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৪০; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৮-৬৯।

২৮৮. আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন সম্পর্কে হযরত বড় পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) নিবন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২৮৯. মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন, *হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী*, পৃ. ২৭২; মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, মাওলানা রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১।

২৯০. মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯-৭০।

২৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।

২৯২. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১।

২৯৩. কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমীন, পৃ. ৬০-৬৯।

মাওলানা রূহুল আমিন বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ও 'উলামা সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন।[২৯৪] তিনি জীবনে বহু মক্তব, মাদ্রাসা ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মাওলানা বশিরহাটী তাঁর অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার ও অসাধারণ পান্ডিত্যকে বক্তৃতা এবং লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ও আসামের মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন।[২৯৫] তিনি একজন নামজাদা লেখক ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বাঙালি 'আলিমগণ সাধারণত বাংলা ভাষা চর্চা করতেননা। পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) রূহুল আমিনকে বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তক রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। মাযহাব অনুসরণ, কাদিয়ানী মতবাদ, বিদ'আত ও ভন্ড-পীর ফকিরদের প্রতিরোধ মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামের অনুসরণ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি একাধিক বই-পুস্তক রচনা করেন।[২৯৬] এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- মাযহাব মিমাংসা, কাদিয়ানী-রদ, ছায়েকাতুল মোছলেমিন, দাফয়োল মোফছেদিন, ফেরকাতুন নাজেয়ীন,হানাফী ফেকাহ তত্ত্ব বা মাছলা ভান্ডার, ফাতওয়ায়ে আমিনীয়া, তরদীদোল মোবতেলীন, বাগমারী ফকিরের ধোকাভঞ্জন, গ্রামে জুমা; এছাড়া আধুনিক বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ- ইসলাম ও সঙ্গীত, ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলাম ও বীমা, ইসলাম ও পর্দা; এছাড়া বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ, কুর'আন মজীদের প্রথম তিন পারার তাফসীর এবং জীবনীমূলক গ্রন্থ ফুরফুরার পীর ছাহেবের বিস্তারিত জীবনী, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়ার কাহিনী ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।[২৯৭] উল্লেখ্য, তিনি প্রায় ১৩৫টি পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা এবং সবগুলোই বাংলা ভাষায় লিখিত। তম্মধ্যে ১১৪টি গ্রন্থ এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে।[২৯৮]

মাওলানা রূহুল আমিন ও'য়ায-নসীহত ও পুস্তক রচনার সাথে সাথে পত্র-পত্রিকা ও সাংবাদিকতার মাধ্যমেও ইসলামের মহান আদর্শকে সমুন্নত রেখে বাতিল শক্তি সমূহের দাতভাঙ্গা জবাব

---

২৯৪. আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন ছাড়াও মাওলানা বশিরহাটী প্রাদেশিক জমি'য়ত এ 'উলামার সভাপতি নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সহ সভাপতি ছিলেন মতামত ও নীতির মিল না হওয়াতে তিনি শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। দ্রঃ *আল আমিন,* ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ১০; *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ,* পৃ. ৭৭।

২৯৫. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *অগ্রপথিক সংকলন,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১।

২৯৬. *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ,* পৃ. ৭৫।

২৯৭. *কর্মবীর মাওলানা রূহুল আমীন,* পৃ. ১১৫-২০; *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ,* পৃ. ৭৫-৭৬।

২৯৮. *আল আমীন,* ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন।[২৯৯] একজন 'আলিমের পক্ষে সেযুগে সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকার সম্পাদন ও প্রকাশনার ব্যাপার ছিল খুবই দুরূহ। এতদসত্ত্বেও মাওলানা রুহুল আমিনের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় ১৯২৬ সালে 'সাপ্তাহিক হানাফী' প্রকাশিত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক 'মোসলেম' ও 'মাসিক ছুন্নত অল-জামায়াত'[৩০০] প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি পত্রিকাই মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। এড়াও তিনি ইসলাম দর্শন, শরিয়াত, শরিয়াতে এসলাম ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।[৩০১]

খুব সাদাসিদে জীবনের অধিকারী মাওলানা রুহুল আমিন সত্য প্রকাশে ছিলেন নির্ভীক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী এই মণীষীকে তাঁর পীর ইমাম ও আল্লামা-ই বাঙ্গালা উপাধি প্রদান করেন।[৩০২] যশোর-খুলনা অঞ্চলে তিনি একাধিক ও'য়ায মাহ্ফিল করেছেন, এ অঞ্চলে তার বহু মুরীদ রয়েছে। বিশ্রামহীনতার ফলে জীবনের শেষদিকে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন এবং ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ১৬ই কার্তিক (২ নভেম্বর ১৯৪৫খ্রিঃ) শুক্রবার ফজরের নামাযের পর এই মণীষী ইন্তেকাল করেন।[৩০৩] তাঁর ইন্তেকালের পর সাতক্ষীরার মোয়েজউদ্দীন হামিদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৩০৪]

সূফী মোহাম্মদ ইউসুফ

মোহাম্মদ ইউসুফ ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার কাশীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই ইউসুফ পিতাকে হারান। তিনি ফুরফুরা শরীফে গমন করেন এবং

---

২৯৯. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *অগ্রপথিক সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২।

৩০০. রুহুল আমিনের সম্পাদনায় ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত 'ছুন্নত অল জামাত' পত্রিকা সারাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পত্রিকাটি জমি'য়তের মুখপাত্র ছিল। তরিকার সংবাদ ও এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম। দ্রঃ মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮।

৩০১. *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, পৃ. ৭৬।

৩০২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

৩০৩. *প্রাগুক্ত*, মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *অগ্রপথিক সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

৩০৪. *হামিদী চরিত*, পৃ. ৭৩-৭৬; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পীর কিবলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) এর নিকট পুত্র স্নেহে লালিত পালিত হন।[৩০৫] ফুরফুরাতে ১৫/১৬ বছর অবস্থান করে লেখাপড়া শেষে পীর সাহেবের খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।[৩০৬]

তিনি ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বহু মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) এর নামানুসারে তিনি নিজ গ্রাম কাশীপুরে "কাশীপুর সিদ্দিকীয়া মাদ্‌রাসা" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাধক পুরুষ বাংলা ১৩৫২ সনের ১৪ই ফাল্গুন বুধবার ইন্তেকাল করেন। ফুরফুরা হুজুরের পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।[৩০৭]

মাওলানা মোয়েজউদ্দীন হামিদী (রহঃ)

আধ্যাত্মিক সাধক, বিশিষ্ট 'আলিম, সমাজ সংস্কারক মাওলানা মোয়েজউদ্দীন হামিদী সাহেবের (রহঃ) ইসলাম প্রচারের খ্যাতি সর্বাধিক। তিনি ১৮৯৫ সালে বৃহত্তর খুলনার আলাইপুরে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের নাম সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার হামিদপুর। গ্রামের নামানুসারে তাঁকে হামিদী বলে সম্বোধন করা হয়।[৩০৮] তাঁর পিতার নাম মুনশি মুহাম্মদ কাদের বকস্ এবং মাতার নাম মতিবিবি।[৩০৯] তাঁর পিতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযান্তে তাঁর জন্য দু'আ করতেন।[৩১০] পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা পার্শ্ববর্তী পরাণপুর ইউ.পি. স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। পরাণপুর ইউ.পি. স্কুল, মাধবকাটি মধ্য বাংলা স্কুলে পড়াশোনা করার সময়[৩১১] পিতা-মাতার আদরের সন্তান হামিদী (রহঃ) হঠাৎ আপনাতেই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।[৩১২] তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করে পিতা তাঁকে

---

৩০৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৬শ খণ্ড, ২য় ভাগ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৬), পৃ. ১৫২।

৩০৬. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার*, পৃ. ১৫৪।

৩০৭. *প্রাগুক্ত*, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৫২।

৩০৮. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৫।

৩০৯. গবেষক কর্তৃক মোয়েজউদ্দীন হামিদী সাহেবের পৌত্র ওয়ালিউল্লাহ হামিদী এর কাছ থেকে সংগৃহীত পান্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

৩১০. মোহাম্মদ এবরাহিম মোহাব্বতপুরী, *হামিদী চরিত*, পৃ. ১-২।

৩১১. শেখ মাসুম কামাল ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (সাতক্ষীরাঃ জেলা প্রশাসন, ১৯৮৬), পৃ. ৮৪।

৩১২. *হামিদী চরিত*, পৃ. ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

যোগীখালি মাদ্‌রাসায়[৩১৩] ভর্তি করেন। এরপর তিনি ১৯২০ সালে হুগলী মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে জামা'আত-ই- উলা (ফাজিল) এবং ১৯২৫ সালে ফুরফুরা সিনিয়র 'আলিয়া মাদ্‌রাসা[৩১৪] হতে টাইটেল (কামিল) উত্তীর্ণ হন। ফুরফুরা মাদ্‌রাসা হতে কামিল উত্তীর্ণ হওয়ার পর [৩১৫] ফুরফুরা শরীফের পীর কিবলা ও বশিরহাটের মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের সান্নিধ্যে এসে ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করে দীন প্রচার ও জনহিতকর কাজে অবদান রাখেন।[৩১৬] বলা আবশ্যক, ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) মোয়েজউদ্দীন হামিদী সাহেবকে পীর খিতাব প্রদান করে একটি সনদপত্র প্রদান করেন।[৩১৭] তার সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে তথা যশোর-খুলনাঞ্চলে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা তুলনামূলক অধ:পতিত ছিল। কবর পুজা, পীর পুজা ও ভণ্ড সূফীদের কুপ্রভাব সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ঢুকে পড়েছিল।[৩১৮]

---

৩১৩. যোগীখালি হামিদপুর হতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। এখানে মাদ্রাসাটি অবস্থিত হওয়ায় নামকরণ করা হয় 'যোগীখালি মাদ্‌রাসা'।

৩১৪. বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলার একটি গ্রামের নাম ফুরফুরা, ফুরফুরা সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) গ্রামের নামে মাদ্‌রাসটি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৬৫; মোহাম্মদ জাকারিয়া, *মাওলানা মোয়েজউদ্দিন হামিদী ঃ তাঁর জীবন ও কর্ম,* অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, জুন ২০০১, পৃ. ১৩।

৩১৫. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৬৫।

৩১৬. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৮৪; মাওলানা মোয়েজউদ্দীন হামিদী (রহঃ) ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী সাহেবের নিকট সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর সান্নিধ্যে দীর্ঘ চার বছর থাকেন এবং পূর্ণ চার তরীকার কামালিয়াত লাভ করেন। মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী সাহেব বাংলা ১৩২৭ সালে হামিদী সাহেবকে চার তরীকার খিলাফতের সনদপত্র দেন এবং তিনি 'আল্লামা শাহ' এই উপাধিতে বিভূষিত করেন। আর তাঁরই আদেশে ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি বশিরহাটের প্রখ্যাত পীর 'আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবকে দীক্ষাগুরু হিসেবে বেছে নেন। মাওলানা রুহুল আমিনও তাঁর জীবদ্দশায় অসিয়ত অনুযায়ী হামিদী সাহেবকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বশিরহাটের গদ্দীনশীন পীর হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেন। দ্রঃ ওয়ালিউল্লাহ হামিদী রচিত অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি হতে প্রাপ্ত তথ্য যা গবেষকের নিকট সংরক্ষিত আছে।

৩১৭. সনদপত্রটি নিম্নরূপ- "الحمد لله رب العالمين– والصلوة والسلام على رسـوله محمـد وسيلة الطـالبين و علـى ألـه و أصحابه ائمة السالكين– يس مولانا شاه صوفي معز الدين حميدي صاحب بشرف بيعت و توبـة مشـرف شـد درسـلك طريقة عليه جشتيه و قادريه و نقشبنديه و مجدديه او سبه محمديه بتوسط فقير حقير محمد أبو بكر صديقي" দ্রঃ *হামিদী চরিত,* পৃ. ৪৩-৪৪।

৩১৮. ঐতিহাসিকভাবে এ কথা সত্য যে, উপমহাদেশ কবর পূজা, পীরপূজা, ভন্ড সূফী-দরবেশদের কু-প্রভাবে আক্রান্ত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম বীর ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী সাধকদের সমাধিস্থলকে (দরগাহ) অধিকাংশ স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

মূলত মোয়েজউদ্দীন হামিদী ছিলেন এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠ। [৩১৯] বলা আবশ্যক, তিনি ছিলেন একজন উঁচুমানের ও'য়ায়েযীন। [৩২০] শুধু খুলনা জেলাতেই নয় সারা বাংলা-আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও'য়ায়েয বা ধর্মপ্রচারক হিসেবে হামিদী সাহেবের খ্যাতি আজও অমলিন।[৩২১]

মাওলানা মোয়েজউদ্দীন হামিদী কর্মজীবনের প্রথম দিকে ফুরফুরা টাইটেল মাদ্রাসায় প্রায় ২ বছর হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার ম্যারিজ রেজিস্টার ও কাযীর পদে প্রায় ৮/৯ বছর চাকুরি করেন। কাজের মাঝে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে রচনা করেন একাধিক বই। যা তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম ও অমুসলিম সমাজে ইসলামের সঠিক অনুসরণে দারুণভাবে সহায়তা করে।[৩২২] অধ্যাপক আবূ তালিব, 'খুলনা জেলায় ইসলাম' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেন- মাওলানা হামিদী সাহেব একজন সাহিত্যিকও বটে। তাঁর সাহিত্য সাধনা মূলত প্রচারমূলক হলেও সাহিত্যিক গুণ বর্জিত নয়। ছোট-বড় মিলিয়ে তিনি প্রায় শ'খানেক গ্রন্থের রচয়িতা, এ দিক দিয়ে তিনি

পূজনীয় বস্তু বলে মনে করা হয়। কেউ বিপদগ্রস্ত হয়ে পরিত্রাণের আশায়, কেউ বা পূণ্য লাভের আশায় আবার কারো এমন বিশ্বাস যে, কবরে শায়িত ব্যক্তি ভক্তের মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারবে। এছাড়া দুরারোগ্য দূর করে সন্তান লাভের আশায় তাঁরা মাযারকে স্পর্শ করে কান্নাকাটি করত। দ্রঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব* (কলিকাতা: ১৩৯৫ বাং), পৃ. ২৪১; এ ব্যাপারে মহর আলীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- We found a fertile Sufi Bengal in that both Hindus and Buddhists had identical beliefs in avatars and 'Saints' in consonance with such beliefs many Hindu writers fostered the idia and depicted muslim heroes and Shaikhs with legendary embellishments, They cumutative effect of all these was the growth of another superstitiuous practice (Not necessarily peculiar to Bengal alone nor even confined to the local converts) of sanctifying the graves of real or imaginary piers and Sufis, or even of known historical figures, Often designated as darkish, this graves were visited by Hindus as well as many credulous Muslims. It is not worthy that a good number of such drags in Bengal are found to exist the sites of ancident stapes or mounds. Visits to the darkish were considered to be or religious merits and offerings of various sorts were made there in solicitation of the piers interession for such special divine blimings as the birth of a child or sure for a chronic illness. cf.: Mohammad Mohar Ali, ***History of the Muslims of Bengal***, Vol-1 (Riyadh: Imam Muhammad Ibn saud Islamic University 1985), pp. 802-3.

৩১৯. *হামিদী চরিত*, পৃ. ২৭।

৩২০. ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ৮৪।

৩২১. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৪০।

৩২২. ওয়ালী উল্লাহ হামিদী কর্তৃক অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

খান বাহাদুর আহসানউল্লাহর সহযাত্রী।[৩২৩] তাঁর লিখিত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক ও গ্রন্থ সমূহ সম্পর্কে বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি ৬২ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এরমধ্যে খুতবার বঙ্গানুবাদ, বৃহৎ নামায শিক্ষা, মাছলা ভান্ডার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩২৪] এছাড়া গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি ছাত্রজীবন হতে 'মোসলেম প্রভা, হানাফী, মোসলেম ও মাসিক হেদায়েত পত্রিকার সম্পাদনা করেন।[৩২৫] মুসলমানদের করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য ও'য়া্য-নসীহত ও লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ১৯১৯ সালে খুলনা জেলা বোর্ডের বেসরকারি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[৩২৬] এরপর আরো কয়েকবার জনতার প্রতিনিধি হয়ে তাঁর জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর রাখেন। এলাকার খ্রিস্টান মিশনারিদের দাতভাঙ্গা জবাবদানে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী ও ইসলামী পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী মোয়েজউদ্দীন হামিদী বাংলার কৃষক প্রজা আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা ছিলেন। উল্লেখ্য, কৃষক প্রজামুক্তি আন্দোলন ছিল একটি মুসলিম আন্দোলন।[৩২৭] এছাড়া তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ কলারোয়া জামি' মসজিদ, কলারোয়া ব্রীজ, হামিদপুর আলিয়া মাদ্রাসা, মেহমান খানা, ছাত্রাবাস, মসজিদ, টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট অফিস ইত্যাদি।[৩২৮]

মূলত ময়েজউদ্দীন হামিদী ছিলেন একজন সফল দা'ঈ ইলাল্লাহ[৩২৯] (داع إلى الله)। ইসলাম প্রচারে তিনি ছিলেন জাত বৈদ্য এবং এদেশীয় জনগণের ধর্মীয় রোগ নিরাময়ের সঠিক পন্থা নিরুপণে ও দাওয়া প্রদানে ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। বাংলাদেশ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও কুচবিহার রাজ্যের মাটিতে বিজাতীয় ভাবধারার 'বুনো ওল' যেমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীর বাঘাতেতুল' তেমনি এর বিন্যাস ও প্রতিরোধে হয়েছিল প্রকৃষ্ট সহায়ক। তাঁর গুরু গম্ভীর কণ্ঠে ও জ্বালাময়ী

---

৩২৩. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৪০।

৩২৪. ওয়ালী উল্লাহ হামিদী, *পূর্বোক্ত*।

৩২৫. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৮৪।

৩২৬. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৬৬; ওয়ালী উল্লাহ হামিদী, *পূর্বোক্ত*।

৩২৭. *হামিদী চরিত*, পৃ. ১০৬।

৩২৮. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৮৪।

৩২৯. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় কুর'আন-হাদীসের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য দূরদূরান্ত হতে হাজার হাজার মানুষ পতঙ্গের মত ছুটে আসত। তাঁর সকল বক্তৃতাই ছিল সংস্কারধর্মী। মুসলিম জাতির সামগ্রিক কল্যাণ, উন্নতি ও ইসলামের পুনর্জাগরণই ছিল তাঁর বক্তৃতা, পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকা লেখনীর অন্যতম লক্ষ্য।[৩৩০] বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিশেষ করে যশোর অঞ্চলে তাঁর পদচারণা ছিল ব্যাপক। আর যশোরের অধিকাংশ অঞ্চলেই তাঁর অগণিত ভক্ত ও মুরীদ এখনও বিদ্যমান।[৩৩১] সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে হামিদী সাহেবের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি বহন করে। তাঁর জীবদ্দশায়ই হামিদপুরে প্রতি বছরই ইসালে ছাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। সেখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত 'আশিকান উপস্থিত হত তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্য। এই মহান বাগ্মী পুরুষ বাংলা ১৩৭৭ সালের ২৯ শ্রাবণ ইন্তেকাল করেন।[৩৩২] এখনো প্রতি বছর ৩ ও ৪ চৈত্র হামিদপুরে ইসালে সওয়াব অত্যন্ত জাকজমকের সাথে পালিত হয়।[৩৩৩]

খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ

এই উপমহাদেশের যে সকল ব্যক্তিত্ব দেশ জাতি ও সমাজের জন্য অপরিহার্য ছিলেন। যাদের জন্ম না হলে পুরাতন, জীর্ণ ঘুনেধরা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন আসতনা, যারা দেশ-কালের আঙ্গিকে ঐতিহ্য ভাবনায় এ দেশের মুসলমান জাতিকে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ (রহঃ) নি:সন্দেহে একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি এই উপমহাদেশের বাঙালি মুসলিম সমাজের চৈতন্য ও সামাজিক সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।[৩৩৪] এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৮৭৩ সালে তৎকালীন যশোর জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত নলতা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩৫] তাঁর পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ

---

৩৩০. ওয়ালী উল্লাহ হামিদী, *পূর্বোক্ত*।

৩৩১. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৩৩২. ওয়ালী উল্লাহ হামিদী, *পূর্বোক্ত*।

৩৩৩. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৩৩৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৮-৯৯),* নলতা কেন্দ্রীয় আহছানিয়া মিশন, নলতা শরীফ সাতক্ষীরা, পৃ. ১৩।

৩৩৫. খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ, *আমার জীবন-ধারা* (ঢাকাঃ আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ৭ম সং, মে ২০০০), পৃ. ১; *খুলনা জেলায় ইসলাম,* পৃ. ১৬৭; *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৮৩;

মফিজউদ্দিন। তাঁর পিতামহ মুহাম্মদ দানেশ কাশেম শাহ নামে এক দরবেশের বিশেষ কৃষ্টি লাভ করেন। এই দরবেশ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, মুন্সী দানেশের মৃত্যুকালে জনৈক কামিল ব্যক্তি উপস্থিত হবেন। সত্যিই তাঁর মৃত্যুর পর ইরান থেকে মাওলানা সূফী মুহাম্মদ আলী শাহ আহছান উল্লাহর বাড়িতে উপস্থিত হন। এই পীর মুহাম্মদ আলী শাহ পরবর্তীতে যশোরের নওয়াপাড়াতে বসতি স্থাপন করেন এবং নওয়াপাড়ার ইরানী পীর নামে খ্যাত হন। আহছান উল্লাহর পিতা মুন্সী মুহাম্মদ মফিজউদ্দিন ইরানী পীরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩৩৬]

খানবাহাদুর অল্প বয়সেই শিক্ষা জীবন শুরু করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন।[৩৩৭] কর্মজীবনের শুরুতেই রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সুপার নিউমেররী শিক্ষকের পদে কিছুদিন কাজ করার পর ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে (আই-ই-এস) পদে যোগদান করে স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসেবে ফরিদপুর ও বাখেরগঞ্জ ও পরে বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর পদ গ্রহণ করে দীর্ঘদিন চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর (মুসলিম শিক্ষা) এর পদ অলংকৃত করেন, যে পদ কেবলমাত্র ইউরোপীয়ানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।[৩৩৮] এ অঞ্চলে তিনিই প্রথম আই.ই.এস.। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর, সিন্ডিকেটের সদস্য এবং লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য ছিলেন।[৩৩৯]

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ* (১৮৭৩-১৯৬৫), (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯), পৃ. ৯।

৩৩৬. *আমার জীবন-ধারা,* পৃ. ১-২; মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৯; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ২৩১; গোলাম মঈন উদ্দীন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৯০), পৃ. ৪।

৩৩৭. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০; *আমার জীবন-ধারা* পৃ. ১১; উল্লেখ্য, ১৮৯৫ সালে তিনি এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। বাঙালি মুসলমানদের গ্রাজুয়েটদের প্রথম শতজনের মধ্যে তিনি একজন। দ্রঃ *বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮-৯৯,* পৃ. ৬৭।

৩৩৮. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৮৩; *আমার জীবন-ধারা,* পৃ. ১১-২১; উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় উক্ত I.E.S অর্থাৎ Indian Educational Service পদে নিয়োগ পান নাই। এতদ্দেশীয় অফিসারদের মধ্যে খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ প্রথম ব্যক্তি। এমনকি তাঁর চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের পরও দ্বিতীয় কোন ভারতীয় ঐ পদে নিয়োগ পাননি। দ্রঃ *বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮-৯৯,* পৃ. ১৭; মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৩-১৪; *খুলনা জেলায় ইসলাম,* পৃ. ১৬৮; *আমার জীবন-ধারা,* পৃ. ৯২-৯৩।

৩৩৯. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৮৩; বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটর, সিন্ডিকেট সদস্য সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন- "আমি কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়া সিনেটর মনোনীত হইলাম। পরে সিন্ডিকেট-এ প্রবেশ করি। ইতিপূর্বে কোন মুসলিম সিন্ডিকেটের সভ্য নির্বাচিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের ভার সিন্ডিকেটের হাতে

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ সারাটি জীবন শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের এগিয়ে নেয়ার সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁরই সক্রিয় হস্তক্ষেপে শিক্ষা বিভাগে বিশেষ করে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপুল সংস্কার সাধিত হয়। এছাড়া পরীক্ষায় ক্রমিক নম্বর দিয়ে খাতা দেখা তাঁর উদ্যোগে চালু হয়। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি ও ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার প্রেরণাসহ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুসলিম ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ, মুসলিম ছাত্রদের উচচ শিক্ষার পথে বাধা দূরীকরণ, মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, স্কুলে মৌলভীর পদ চালুকরণ, টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সভ্যদের নিয়োগ, হাইস্কুলে আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা (Second language) হিসেবে গৃহীতকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম সভ্যদের অন্তর্ভুক্ত করণ ইত্যাদি মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। বলা যায়, মুসলমানদেরকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সময় ও মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৩৪০]

খানবাহাদুর একজন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি তাঁর সমস্ত জীবন ইসলামী যিন্দেগানীর উন্নতি ও প্রসারে উৎসর্গ করে গেছেন।[৩৪১] অবসর গ্রহণের পর তিনি আধ্যাত্ম্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং পরবর্তীতে পীরের মর্যাদা লাভ করেন।[৩৪২] তিনি গফুর শাহ নামক পীরের মুরীদ ছিলেন।[৩৪৩] শুধু পীর হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত করেননি। তিনি ইসলাম-সেবক হিসেবে তাঁর সাধনার ফসল সাহিত্যিকরূপে দান করেছেন। কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ৭৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থের কোনটাই বলতে গেলে ইসলামিক আদর্শ বর্জিত নয়।[৩৪৪] শিক্ষা

ন্যস্ত; তাই এ পদের গুরুত্ব অত্যধিক। এখানকার সভ্য নির্বাচিত হয়ে বহু হিতকর কার্য সমাধানে কৃতকার্য হইয়াছিলাম।" দ্রঃ *আমার জীবনধারা*, পৃ. ৯৩।

৩৪০. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬-১৭; *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ৯৩-৯৭; *বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮-৯৯*, পৃ. ১৮-২০।

৩৪১. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৪২।

৩৪২. *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৮৪; মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০-২১।

৩৪৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩।

৩৪৪. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৪২; তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পদার্থবিদ্যা, বিশ্ব শিক্ষক, হযরত মোহাম্মদ (সঃ), হেজাজ ভ্রমণ, ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ, ইসলাম ও মহতী শিক্ষা, ইসলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি, বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, আমার জীবন ধারা, প্রেমিকের পত্রাবলী ইত্যাদি। দ্রঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ও শিক্ষা সংস্কারমূলক কাজে অবদানের জন্য সরকার তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৩৪৫]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্বদেশবাসীর রূহানী খিদমত এবং সমাজ সেবার জন্য নিজ গ্রামে 'আহছানিয়া মিশন' নামে একটি ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৩৪৬] এ মিশনের মূল লক্ষ্য ছিল 'স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা'। [৩৪৭] এই ধর্মীয় ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি একদিকে মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী ও উন্নতির পথ দেখাতে চেয়েছেন, অন্যদিকে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজও আঞ্জাম দিয়েছেন। যশোর খুলনাঞ্চলেও এই মিশনের কার্যক্রম ছিল ব্যাপক। যশোরে- 'যশোর আহছানিয়া মিশন, নওয়াপাড়া আহছানিয়া মিশন, রূপদিয়া আহছানিয়া মিশন এবং খুলনাতে- খুলনা আহছানিয়া মিশন, খুলনা আহছানিয়া মহিলা মিশন ও পয়গ্রাম আহছানিয়া মিশন, স্থাপন তার জলন্ত প্রমাণ।[৩৪৮] এই মহান শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, পীর ইসলাম প্রচার-প্রসারে যে ভূমিকা রেখেছেন তাঁর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, 'আলিম, মাওলানা আকরাম খাঁ ১৩৭১ বাং সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ শিরোনামায় সম্পাদকীয়তে লিখেছেন- "বহুজনের কর্মে ও সাধনায় ধ্যানে ও জ্ঞানে সাফল্য ও ব্যর্থতায় যে আন্দোলন মুসলিম জাতির মূল জীবন প্রবাহের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে; তাহার পরিপূর্ণ ইতিহাস যেদিন লিখিত হইবে সেদিন খানবাহাদুর সাহেবের ভূমিকার যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।"[৩৪৯]

আলহাজ্জ মুন্সী মুহাম্মদ শামনূর (রহঃ)

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা বাড়ীয়ালী গ্রামে ১৮৯৭ সালে মুন্সী শামনূর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাডেমিক কোন লেখাপড়া শেখেননি। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সামান্য লেখাপড়া শিখেন। ছোটবেলায় তিনি একজন রাখাল ছিলেন। মৎস রাঙ্গার পীর মাওলানা সামসুদ্দীন সাহেব তাকে একদিন গরু চরানো অবস্থায় দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই ছেলে বড় হয়ে একজন বিশিষ্ট কামিল ব্যক্তি হবেন। মুন্সী শামনূরের সময়ে এতদাঞ্চলে হিন্দুদের বিশাল দৌরাত্ম্য ছিল। আযান, নামায, রোযা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়ে প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে প্রায়ই বাদানুবাদ হত। মুন্সী শামনূর কর্তৃক একটি গরু কুরবানিকে কেন্দ্র করে অত্র অঞ্চলের হিন্দুদের সাথে তার দ্বন্দ্ব চরমে পৌছে। তারা যশোর জেলায় গোহত্যা মামলা দায়ের করে এবং তাঁর তিন ভাইসহ তাঁকে নলডাঙ্গার জমিদার বাড়িতে চরম শারীরিক নির্যাতন করা হয়। কিন্তু উক্ত মামলায় তিনি বিজয়ী হন। মুন্সী শামনূর ১৯৭১ সালে হজ্জব্রত পালন করেন। ঝিকরগাছা, শারশা, চৌগাছা, যশোর সদর, কালিগঞ্জ ও মহেশপুর এলাকায় তিনি ইসলাম

---

[৩৪৫]. *ব্যঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৮৩-৮৪; ১৯০৬ সালে তাকে এই উপাধি দেয়া হয়। দ্রঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৫।

[৩৪৬]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ২৩২।

[৩৪৭]. *বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮-৯৯,* পৃ. ৫।

[৩৪৮]. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬।

[৩৪৯]. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। অত্র এলাকায় তাঁর অসংখ্য ভক্ত মুরীদান রয়েছে। বাড়ীয়ালীর পীর নামে খ্যাত এই মহান সাধক ১৯৭৮ সালে ইন্তেকাল করেন।[৩৫০]

খানবাহাদুর মাওলানা আহমদ 'আলী এনায়েতপুরী

যশোরে (সদর উপজেলায়) ইসলাম প্রচারে খানবাহাদুর মাওলানা আহমদ 'আলী এনায়েতপুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে যশোর সদর উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৫১] আহমদ 'আলী এতদাঞ্চলে পীরে কামিল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর সুনাম যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়।[৩৫২] তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো: ফতোয়ায়ে ইসলামিয়া, তফসীরে সুরায়ে ইয়াসিন, ওযীফা এরশাদে ছিদ্দিকীয়া, তালিমে মুসলিম বা নামাজ শিক্ষা, দাফায়ে জ্বোলমাত বা দ্বীন দুনিয়ার শান্তি, কারামতে আওলিয়া বা শাহ সাহেবের জীবনী, একামাতুস্ সুন্নাহ বা বেদয়াত খন্ডন ইত্যাদি।[৩৫৩] বলা বাহুল্য, এই পীরে কামিল তৎকালীন মুসলমানদের দুরাবস্থা লক্ষ্য করে দীনের দা'ওয়াত প্রদানের পাশাপাশি উল্লেখিত ইসলামী ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থগুলো রচনা করেন। যা মুসলমানদের সঠিক ইসলামী 'আকীদা ও ঐতিহ্যের অনুসারী —

করে তাঁদেরকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখে। শুধু বই-পুস্তক লিখেই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রয়োজনে তিনি সাংবাদিকতা পেশায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং ১৯৪৮ সালে মাসিক শরীয়তে এসলাম নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৩৫৪] উল্লেখ্য, ফুরফুরা পীর কিবলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (রহঃ) তাঁর সিলসিলা ভিত্তিক আন্দোলনের যে সকল মহৎপ্রাণ, পীরে কামিল ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কার্যক্রম চালিয়ে ছিলেন হযরত খানবাহাদুর আহমদ 'আলী

---

৩৫০. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১৫-১৬।

৩৫১. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯১; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১০৭; মুহাম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, *কিংবদন্তীর যশোর, সাহিত্য প্রসঙ্গ* (ঢাকাঃ নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৩৯৫ বাং), পৃ. ৬৩।

৩৫২. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১৪-১১৫।

৩৫৩. *প্রাগুক্ত; বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১০৭; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯১; *কিংবদন্তীর যশোর, সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৬৩।

৩৫৪. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

এনায়েতপুরী তাঁদের অন্যতম। তিনি ফুরফুরা পীর কিবলার বিশিষ্ট মুরীদ ও খীলফা ছিলেন।[৩৫৫] আর তাঁরই নির্দেশে "শরিয়তে এসলাম" পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। [৩৫৬] ফুরফুরার পীর সাহেব জমিয়ত-ই-উলামা-ই বাংলা ও আসাম নামে একটি রাজনীতিক দল গঠন করেন।[৩৫৭] আহমদ আলী এনায়েতপুরী এই দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত 'শরীয়তে এসলাম' পত্রিকাটি উক্ত জমিয়তে-ই-উলামা বাংলা মুখপত্র হিসেবেই প্রকাশিত হয়।[৩৫৮] যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে এই মণীষীর অবদান চিরস্মরণীয়। ১৯৫৯ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩৫৯] আর এনায়েতপুরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এখনো প্রতি বছর হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উপস্থিতিতে এখানে ইসালে সওয়'ব অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬০]

মাওলানা জয়নুল আবেদীন (রহঃ)

মাওলানা জয়নুল আবেদীন (রহঃ) যশোর জেলার চৌগাছা থানার বাড়ীয়ালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আনুমানিক ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা সাহারানপুর মাদ্রাসায় তিনি লেখা পড়া করেন। অধ্যবসায় শেষে দেশে ফিরে তিনি এলাকায় ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কামালিয়াত ও সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মে বায়'আত হতে থাকে। তিনি একজন উঁচু স্তরের আলিম ছিলেন। জানা যায়, তিনি মুরীদানদের বাড়িতে বাড়িতে ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর কামালিয়াত সম্পর্কে এলাকায় অনেক জনশ্রুতি রয়েছে। এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৪৬ সালের শেষদিকে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাড়ীয়ালী গ্রামের মাধবপুকুর কবরস্থানে তাঁর মাযার রয়েছে।[৩৬১]

---

৩৫৫. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১১৪।

৩৫৬. পত্রিকাটি প্রথম ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়, দ্রঃ মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭।

৩৫৭. মাওলানা রুহুল আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩।

৩৫৮. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭।

৩৫৯. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯১; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১০৭।

৩৬০. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১১৫।

৩৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা 'আবদুল মজিদ শাহ (রহঃ)

যশোর-খুলনা অঞ্চলে যাঁদের পদচারণায় ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় মানুষ অশিক্ষা ও সামাজিক, ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকিত পথের সন্ধান লাভে ধন্য হয়েছিল খাজা[৩৬২] 'আবদুল মজিদ শাহ (রঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৩৬৩] তিনি একাধারে 'আলিমে-দীন, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য সাধক এবং সর্বোপরি নিবেদিত প্রাণ একজন "দা'ঈ ইলাল্লাহ" [৩৬৪] ছিলেন। দীন ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলের কারণে তিনি এ এলাকার কিংবদন্তীতে পরিণত হন। উল্লেখ্য, তাঁর পিতা ছিলেন পীর মুহাম্মদ আলী শাহ। তাঁর সুযোগ্য পিতা নওয়াপাড়ায় 'মুহাম্মদী খানকা' প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে যে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের নবযাত্রা সূচিত করেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে খাজা আবদুল মজিদ শাহ (রহঃ) এর পরিচালনা ও নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন।[৩৬৫]

খাজা 'আবদুল মজিদ শাহ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নওয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতা উভয়ে ইরানী হলেও খাজা 'আবদুল মজিদ শাহ জন্মগতভাবে একজন খাঁটি বাঙালি ছিলেন। কারণ তাঁর জন্ম ও যাবতীয় কর্মধারা বাংলার মাটি বিশেষ করে যশোর অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এবং বাংলার মাটিতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে।[৩৬৬]

পিতা-মাতার মেঝ সন্তান মজিদ শাহ শিশুকালেই তাঁর মাকে হারান। শিশুকাল থেকেই ভিন্ন প্রকৃতির মজিদ শাহকে তাঁর পিতা আদর করে মজিদী বলে সম্বোধন করতেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর

---

৩৬২. আবদুল মজিদ শাহ এর নামের পূর্বে 'খাজা' শব্দটি পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে। খাজা নক্শাবন্দীয়া তরীকার সিলসিলা হতে প্রাপ্ত। পারিবারিক সূত্র হতে জানা যায়- আবদুল মজিদ শাহ যখন ভারতের খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (রহঃ) এর তরীকতের একজন যোগ্য শিষ্য হিসেবে মনোনয়ন পান, তখন থেকেই তার নামের প্রারম্ভে খাজা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৩৬৩. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ১৯।

৩৬৪. 'দা'ঈ-ইলাল্লাহ (داع إلى الله): ইসলামী দা'ওয়াহ এমন একটি দ্বীন যা আল্লাহ সমগ্র জগতের জন্য মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের শিক্ষা ও বিধানগুলোকে রাসূল (সঃ) এর উপর নাযিল করেছেন; যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে সংরক্ষিত। আর এই সংরক্ষিত দীনের প্রতি দায়িত্ববোধের কারণে যাঁরা আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেন, মূলত তাঁরাই দাঈ-ইলাল্লাহ। দ্রঃ আহমাদ গালুশ, *আদ দাওয়াতুল ইসলামীয়্যাহ উসুলুহা ওয়া ওয়াসাইলুহা* (কায়রোঃ দারুল কুতুব মিসরী, ১৩৯৩ হিঃ), পৃ. ১২।

৩৬৫. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ২০।

৩৬৬. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে কামালিয়াত ও কারামতের[৩৬৭] আলামত পরিলক্ষিত হয়।[৩৬৮] খাজা'আবদুল মজিদ শাহ নওয়াপাড়ায় তাঁদের নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত Ghoro Training (G.t) স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[৩৬৯] আর পারিবারিক পরিমন্ডলে পিতার কাছে কুর'আন, হাদীস, আরবী ও ফার্সী শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর উচচ শিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি দিল্লীতে গমন করেন।[৩৭০] এক বছরেরও বেশি সময় তিনি দিল্লীতে ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর পড়াশুনা করেন অত:পর কলকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসায় তাঁকে ভর্তি করানো হয়।[৩৭১]

---

৩৬৭. কারামত: (كرامة) আরবী শব্দ। কারমুন (كرم) শব্দের ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। ক্রিয়ামূল থেকে অর্থ দাঁড়ায় উদার হওয়া, দয়ালু হওয়া, সম্মানিত হওয়া। দ্রঃ মু. রবিউল ইসলাম, কারামাহ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৭ম খণ্ড (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৯৩), পৃ. ৩২০; এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Dihgnity, Honour, Respect. cf. D Rohi Baalabak, ***Al- Mawrid*** (Bairuit: Darul Marife, 1988), p. 890; প্রখ্যাত লেখক আল্লামা তাফতাযানী (রহঃ) তাঁর শরহে আকাঈদে নাসাফীয়াতে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, নবীর দাবিদার নন এমন কোন ব্যক্তি থেকে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম কোন কাজ সংঘঠিত হওয়াকে 'কারামত' বলে। দ্রঃ আল্লামা তাফতাযানী (রহঃ) শরহে আকাইদ নাসাফী (জেদ্দাঃ দারুল মারুফ, ১৯৮৭), পৃ. ২১৩; মুবারক ইবন মুহাম্মদ সাইলির মতে, অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আল্লাহর কোন 'আবিদের কাছ হতে যদি কোন কার্য সম্পাদিত হয় তবে তাকে 'কারামাত' বলে। দ্রঃ মুবারক ইবন মুহাম্মদ সাইলি, *আশ-শিরক ওয়া মাজাহিরুহু* (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনামুনাওয়ারাহ, ১৪০৭ হিঃ), পৃ. ১২৭; আবু বকর জাবির আল-জাযাইরী তাঁর 'আকীদাতুল মু'মিন' গ্রন্থে বলেন- কারামাহ- একটি ইবাদাত যা আল্লাহ তাঁর পছন্দের বান্দাদের দান করেন। এই শক্তি দ্বারা এমন সব অস্বাভাবিক কার্য সংগঠিত হয় যার জন্য সেও প্রস্তুত নয়। দ্রঃ আবু বকর জাবের আল-জাযাইরী, *আকিদাতুল মু'মিন* (জেদ্দাঃ দারুশ শরফ ১৯৮৭), পৃ. ১৭৭; কারামাহ শব্দটি আল্লাহ তায়ালার বন্ধু তথা আউলিয়াদের অলৌকিক ঘটনাবলিকে নির্দেশ করে, যা আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তাঁদেরকে দান করেছেন। দ্রঃ ***The Encyclopeadia of Islam*** (Bairut: Indian 1995), New edition, p. 110; বলা আবশ্যক, নবী-রাসূল (সঃ) দের দ্বারা সংগঠিত অলৌকিক ঘটনাবলিকে বলা হয় মু'জিযা (معجزة)। আর কোন কাফির, ইসলাম অস্বীকারকারী, অমুসলিম ব্যক্তি হতে প্রকাশিত অস্বাভাবিক ঘটনাকে 'ইসতিদরাজ' বলে। দ্রঃ *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫), পৃ. ৩৩৩ ও ৩৪০; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে- নবী-রাসূলদের মু'জিযা এবং ওলীদের কারামত সত্য।

৩৬৮. আবদুল মজিদ শাহ যখন বালক সে সময় কলিকাতার প্রখ্যাত সার্কাস পার্টির এক অধিনায়ক নওয়াপাড়ায় সার্কাস দেখাতে আসেন। লোকজনকে খেলা দেখানোর সময় বালক মজিদও তা দেখছিল। এক পর্যায়ে সার্কাসের অধিনায়ক যাদু কোন কাজ না করলে তিনি বালক মজিদের সরণাপন্ন হন মজিদশাহ তাকে যাদু না দেখানোর শর্তে কারামতের মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করেন। দ্রঃ অধির কুমার দাস, প্রসঙ্গ ইরানী পীর, ১৭তম সংখ্যা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৬; মৌলভী মোহাম্মদ আলী, *খাজা আবদুল মজিদ শাহ* (যশোরঃ রেডিয়েন্ট লাইব্রেরী, ১৯৯১), পৃ. ২০।

৩৬৯. আকরামুজ্জামান, *খাজা আবদুল মজিদ শাহ পান্ডুলিপি*, পৃ. ৩; আকরামুজ্জামান ১৯২১ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা থানাধীন তেতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে তার বড় বোনের সাথে খাজা মজিদ শাহের বিবাহ হয়। মজিদ শাহের ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আকরামুজ্জামান সর্বদা তাঁর সাথেই থাকতেন। দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৪।

৩৭০. আকরামুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯।

৩৭১. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৪।

'আবদুল মজিদ শাহ এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি দূর অগ্রসর হয়নি বলে জানা যায়। তবে কর্মজীবনে তিনি ইসলামের খিদমতে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। [৩৭২] তাঁর সুযোগ্য পিতা পীর মুহাম্মদ 'আলী শাহ এর মৃত্যুর পর মজিদ শাহ নতুন গদ্দিনশীন পীর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং নওয়াপাড়া খানকাহ্‌র যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খাজা'আবদুল মজিদ শাহ উনিশ শত ত্রিশের দশকের দিকে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[৩৭৩] ১৯৪০ সালে তিনি কংগ্রেসের যশোর জেলা সভাপতি নিযুক্ত হন।[৩৭৪] পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে 'মুসলিম লীগে'[৩৭৫] যোগদান করেন।[৩৭৬]

খাজা'আবদুল মজিদ শাহ যোগ্য 'দা'ঈ ইলাল্লাহ' হিসেবে নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন। দীন প্রচারে তিনি মাসের পর মাস, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন দীনী শিক্ষার নূরানী কেন্দ্র তথা মাদ্‌রাসা ও মক্তব।[৩৭৭] যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সংস্কার আন্দোলন সম্প্রসারণে এই মণীষীর অবদান অপরিসীম। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সমগ্র বাংলদেশ তথা যশোর-খুলনা অঞ্চল শিরক-বিদ'আতে মোহাচ্ছন্ন ছিল ঠিক সে সময় 'আবদুল মজিদ শাহ এ সবের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও'য়ায-নসীহতের মাধ্যমে জনসাধারণকে সঠিক ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি নৌপথে বোট নিয়ে এলাকার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন

---

৩৭২. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০।

৩৭৩. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯-৩১।

৩৭৪. তিনি কংগ্রেস করতেন ঠিকই কিন্তু এর যশোর জেলা সভাপতি হয়েছিলেন কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণাদি পাওয়া যায়না। পীর সাহেবের পারিবারিক সূত্র থেকেও এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। দ্রঃ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১-৩২।

৩৭৫. মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার আহবানের শ্লোগান নিয়ে ১৯০৬ সালে ঢাকা নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংগঠন ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে। ১৯১৩ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেয়ার পর এর গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মুসলিম লীগের। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর এর সভাপতি কায়েদে আজম জিন্নাহ নতুন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্রঃ ডঃ সালাহ উদ্দিন আহম্মদ, *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি,* প্রবন্ধ, বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত (ঢাকাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯২), পৃ. ১৭।

৩৭৬. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৩২-৩৩।

৩৭৭. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাজা আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৯), পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

এবং মুরীদানদের মাঝে ইসলামের তা'লীম দান করতেন।[৩৭৮] ইসলামী দা'ওয়াহর অন্যতম পদ্ধতি জনকল্যাণ অর্থাৎ মানব সেবা করা। একজন দা'ঈ হিসেবে 'আবদুল মজিদ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে "শাফাখানায়ে হামিদীয়াহ"[৩৭৯] নামে একটি দাওয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যা দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি ইসলাম প্রচার কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে।[৩৮০]

খাজা 'আবদুল মজিদ শাহ পূর্বোক্ত ও'য়ায-নসীহত, দাওয়াখানা সেবামূলক কাজের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি অনুধাবন করেছিলেন একমাত্র দীন ইসলামের বিস্তার দ্বারাই সমাজরে অন্ধত্ব ও বন্ধাত্ব দূর করে লোকদের মাঝে ইসলামের সঠিক বাণী পৌছানো সম্ভব। এজন্য তিনি দীনি 'ইলম প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এলাকার আনাচে-কানাচে ছুটে বেড়িয়েছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন একাধিক দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্‌রাসা-মক্তব।[৩৮১] প্রায় দুইশত বছর ইংরেজ গোলামীর পিঞ্জরে আবদ্ধ থেকে মানুষগুলো নিথর ও ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছিলেন। সে অবস্থায় পতিত মানুষগুলোকে শিক্ষিত, সমাজ সচেতন ও প্রগতিমুখী করাকে তার দায়িত্ব বলে মনে করেন। তাই তিনি ধর্মীয় ও আধুনিক-কারিগরি শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৩৮২] শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এহেন পদক্ষেপের কারণে খাজা 'আবদুল মজিদ শাহ যশোর তথা বাংলাদেশের দীনী শিক্ষা বিস্তারের অগ্রজ দিশারি হয়ে আছেন।[৩৮৩]

---

৩৭৮. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৪৪ এবং ৩০।

৩৭৯. খাজা আবদুল মজিদ শাহের আরেকজন ভাই ছিল যাঁর নাম ছিল খাজা আবদুল হামিদ। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর নামানুসারে মজিদ শাহের পিতা মুহাম্মদ 'আলী শাহ নওয়াপাড়াতে একটি দাওয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এর নাম দেন 'শাফাখানায়ে হামিদীয়া'। পিতার মৃত্যুর পর মজিদ শাহ এ দাওয়াখানার ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। দ্রঃ পারিবারিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

৩৮০. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী,* পৃ. ১৯।

৩৮১. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী,* পৃ. ২১; তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছোট, বড় ও মাঝারি ধরনের প্রায় ত্রিশটি। দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৪৪।

৩৮২. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৪; তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- শাহবাদ মজীদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, জামেয়া আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম নওয়াপাড়া, উলা মজিদীয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, ভুলবাদিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা খুলনা, গাওঘরা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ইত্যাদি। দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী,* পৃ. ২১-২২।

৩৮৩. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৪৪।

আধ্যাত্মিক, সমাজ সেবক, সংস্কারক হিসেবেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয় এবং শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; ইসলামের দা'ওয়াতকে আরো শক্তিশালী ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য বই-পুস্তক।[৩৮৪] সে সব পুস্তক তৎকালীন সাধারণ মুসলমানদের মাঝে তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। যা লোকদেরকে ইসলামী আকীদা ও জীবন দর্শন সম্পর্কে সর্বোপরি ইসলামের আদর্শকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে দারুণ সহায়তা করে। এজন্য তাঁকে যশোরের সাহিত্য সাধকদের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শুধু তাই নয় তিনি তৎকালীন মুসলিম পত্রিকা "মুকুলের" প্রকাশক ও খণ্ডকালীন সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন।[৩৮৫] সুতরাং বলা যায়, ইসলামী আদর্শের প্রচার-প্রসারকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর এই প্রচার-প্রসার ছিল কুর'আনের দা'ওয়াতী হিকমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- "اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" অর্থাৎ 'আপনি আপনার রবের দিকে মানুষকে আহবান করুন হিকমত ও উত্তম উপদেশ সহকারে এবং সঠিকভাবে তাদের সাথে বিতর্ক করুন।'[৩৮৬] পবিত্র কুর'আনের এই বাণীর পুরোপুরি বাস্তবায়ন খাজা মজিদ শাহের দা'ওয়াতী কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কেননা তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানুষদেরকে ইসলামের পথে আহবান করতেন। কখনও ও'য়ায-নসীহত কখনও খোদাদ্রোহীদের প্রকাশ্য মোকাবিলা, আবার গরীব দুঃখীর দুঃখ-দূর্দশা মোচনের জন্য দাওয়াখানার মাধ্যমে সেবা প্রদান, দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে 'ইলম প্রচার এমনকি বই-পত্র রচনা ও পত্রিকা প্রকাশসহ বিভিন্ন উপায়ে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[৩৮৭] এজন্য যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাঁর নাম চির স্মরণীয়।

---

[৩৮৪]. সে সকল বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- ছেরাতুল মোমেনীন, ওযিফা ও জেকের শিক্ষা, ইসলাম সন্দর্শন, জেহাদের ডাক, ইশারা, প্রত্যয়, কোরান মুকুট ইত্যাদি। দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী*, পৃ. ২২।

[৩৮৫]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬।

[৩৮৬]. আল কুরআন, সূরাঃ নাহল, আঃ ১২৫।

[৩৮৭]. *খাজ আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী*, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিকবৃন্দের ভূমিকা

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন

বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম আধুনিক শিক্ষিত কবিই ছিলেন মোহাম্মদ গোলাম হোসেন।[৩৮৮] ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে (১২৭৯/৮০ বাং) মাগুরা মহকুমার (বর্তমান জেলা) মোহাম্মদপুর থানার জোকা গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৮৯] তাঁর গ্রামের বাড়ি "বালিয়াডাঙ্গা" নামক গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আব্দুর রহমান।[৩৯০]

কবি গোলাম হোসেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স ও কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৮৯৬ এ. (এফ. এ.) আই. এ. পাশ করেন। এরপর পিতৃ বিয়োগের কারণে বি.এ. (ডিগ্রি) পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হয়নি, তবে ১৯১৮ সালে শিক্ষকতারত অবস্থায় পূর্ব পরিত্যক্ত বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।[৩৯১]

কবি গোলাম হোসেনের সাহিত্য জীবন শুরু হয় ১৯০৪ সালে সরকারি স্কুল সমূহের পরিদর্শক থাকাকালীন সময়ে।[৩৯২] অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য একজন উন্নত ও বলিষ্ঠ কবি শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গোলাম হোসেন প্রচারের অভাবে সুধী সমাজে যথাযোগ্য পরিচিতি লাভে সক্ষম হননি।[৩৯৩] ১৯০৬ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারী তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বঙ্গ বিরাঙ্গনা" প্রকাশিত হয়; এটি মাইকেল মধু সূদনের "বীরাঙ্গনা" কাব্যের অনুসরণে লিখিত প্যারোডী জাতীয় কাব্য।[৩৯৪] অবশ্য এ কাব্যগ্রন্থ রচনায় তিনি

---

[৩৮৮]. মুহাম্মদ আবু তালিব সম্পাদিত, *কিংবদন্তীর যশোর, সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৪২; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৬; *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৮১।

[৩৮৯]. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৮৯; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৭; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৬; তাঁর জন্ম সম্পর্কে K.G.M. Latiful Bari বলেন- Golam Hossain B. A. was born in 1873 at village joka under Magura sub-divition in Jessore, cf.: ***Bangladesh District Gazetteer Jessore***, (Dacca: Bengal Goverment Press, 1979), p. 222.

[৩৯০]. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৭; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার*, পৃ. ১৫৬।

[৩৯১]. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৮২-৮৩; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৮।

[৩৯২]. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৮।

[৩৯৩]. *কিংবদন্তীর যশোর, সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৪২; *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৮৪।

[৩৯৪]. বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান, পৃ. ৬৮; কিংবদন্তীর যশোর সাহিত্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে অপরাধী মনে করেছেন। কারণ বইটি হিন্দুয়ানি ভাবাপন্ন হয়েছিল। পরবর্তীতে এ গ্রন্থ পাঠক যেন না পড়ে সেজন্য তিনি প্রচার ও চালিয়েছিলেন।[৩৯৫] তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ "বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান" প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। গ্রন্থখানিতে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের বিষয়ে এবং উভয় সমাজের মিলনের ব্যাপারে তিনি বক্তব্য রেখেছেন।[৩৯৬] উল্লেখিত গ্রন্থে গোলাম হোসেন বাঙালি মুসলমানদের স্বপক্ষে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেও স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে- বৃহত্তর হিন্দু সমাজ সেদিন যদি সংখ্যা লঘু মুসলমানদের প্রতি একটু সহানুভূতি সম্পন্ন হতেন তাহলে বঙ্গভঙ্গ সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম মিলনের পথ সুপ্রশস্ত হত।[৩৯৭] বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের "কালান্তরের অনুরূপ" বলে অনুমিত হয়।[৩৯৮] কবি গোলাম হোসেন বাঙালি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীকারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।[৩৯৯] তাঁর পরবর্তী রচনাবলিতেও সে কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তার তৃতীয় গ্রন্থ "দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ" (গদ্য-পদ্য) প্রকাশিত হয় এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'কাব্যযুথিকা' প্রথম খণ্ড ও 'পয়গামে মুহাম্মদী' নামে একটি অনুবাদ গ্রন্থও প্রকাশিত হয় এবং নীতি প্রবন্ধ 'মুকুল' নামে একটি ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেন।[৪০০] এছাড়া বিভিন্ন

---

৩৯৫. মুহাম্মদ আবূ তালিব এ প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- কবি গোলাম হোসেন তাঁর পুত্র-কন্যাদের সম্বোধন করে অসিয়ত করেছেন যে, যদি কোন দিন কোন মুসলমান পাঠককে এ বই পড়তে দেয়া হয় তবে যেন একথা জানিয়ে দেয়া হয়- গ্রন্থ রচনাকালে লেখক ইসলামের প্রকৃত মর্মকথা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেননা। ফলে কাব্য খানি নিতান্তই হিন্দুয়ানি ভাবাপন্ন হয়েছে। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৮৫; উল্লেখিত মন্তব্য থেকে বুঝা যায়, কবি গোলাম হোসেন একজন সত্যিকার মুসলিম কবি ছিলেন। তাঁর চিন্তা চেতনায় ইসলাম তথা মুসলমানের প্রকৃত ছাপ স্পষ্ট ছিল।

৩৯৬. *কিংবদন্তীর যশোর, সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৪৩; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৯।

৩৯৭. *কিংবদন্তীর যশোর, সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৪৩; তার মতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন যুক্ত করায় একটি মারাত্মক ভুল হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে মুসলমানদের আপত্তি থাকার কথা ছিলনা। কেননা তাতে তাদের স্বার্থ বিরোধী কিছু ছিলনা। কিন্তু বঙ্গ বিভক্তির সাথে তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত ছিল। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

৩৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩; *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৮৪।

৩৯৯. *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৪৪।

৪০০. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৬৮-৭১; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৬; ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 222; *কিংবদন্তীর যশোর*, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে।[৪০১] গোলাম হোসেনের অনেক রচনা অদ্যাবধি আলোর মুখ দেখতে পায়নি।[৪০২] এই মহান মুসলিম সাহিত্য সাধক ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নিজ গ্রাম বালিয়াডাঙ্গায় সমাধিস্থ করা হয়।[৪০৩]

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শালিখা থানার ঘোষগাতী গ্রামে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শেখ হবিবর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।[৪০৪] তাঁর পিতার নাম শেখ মুহাম্মদ দেরাজতুল্লাহ। তিনি প্রথমে মাদ্রাসায় ও পরে স্কুলে পড়াকালীন সময়েই কবিতা রচনার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। স্কুলের 'দেয়াল' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় হেড মাস্টার তাঁকে সাহিত্য চর্চাই উৎসাহিত করেন।[৪০৫] কর্মজীবনে তিনি সরকারি শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। শিক্ষায় এলটি উপাধি প্রাপ্ত শেখ হবিবর রহমান দীর্ঘদিন শিক্ষকতা ও স্কুল পরিদর্শক পদে কর্মরত থেকে শেষে খুলনার সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োজিত ছিলেন।[৪০৬]

---

৪০১. উল্লেখ্য যে, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ধারাবাহিকভাবে মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা পুঁথি সাহিত্যের উপর তাঁর লেখা একটি আলোচনামূলক প্রবন্ধ সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্রঃ ***বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান***, পৃ. ৭১।

৪০২. তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলি- হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী (কাব্য) ১ম ও ২য় খণ্ড, পাকিস্তান গাঁথা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ, বর্তমান মুসলিম বাংলার অনৈসলামিক ভাবধারা ও হিন্দু প্রভাব, ১ম ও ২য় খণ্ড, আশা মরীচিকা (সামাজিক উপন্যাস), কারবালা কাব্য, সিরাজুদ্দৌলা কাব্য, পলাতক কাব্য, বন্দিনী বাদীর বেদনা; তাঁর প্রথম ছয়খানি কাব্যের পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীতে প্রকাশের জন্য দেয়া হয়েছে। কবির প্রকাশিত গ্রন্থগুলো লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। দ্রঃ ***বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান***, পৃ. ৭১; ***যশোর জেলায় ইসলাম***, পৃ. ৮৭-৮৮।

৪০৩. ***যশোর জেলার ইতিহাস***, পৃ. ১৮৯; ***যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার***, পৃ. ১৫৬; ***বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান***, পৃ. ৭২; ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 222.

৪০৪. ***যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার***, পৃ. ১৫; তাঁর জন্ম সম্পর্কে K.G.M. Latiful Bari বলেন- Shaikh Habibur Ranhman Sahityaratna was born in 1891 at village Ghoshgati, P.S. Salikha, District Jessore, cf. ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 223.

৪০৫. মহসিন হোসাইন, ***শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন*** (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৯৫), পৃ. ৩; ***খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম***, পৃ. ২৩৪।

৪০৬. ***কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ***, পৃ. ৪৭; ***যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার***, পৃ. ১৫৫।

শেখ হবিবর রহমান ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আজীবন সাহিত্যের সাথেই জড়িত ছিলেন, বিশেষ করে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বলা আবশ্যক যশোরের দুইজন কীর্তিমান ইসলাম প্রচারকের চিন্তা-চেতনার প্রভাব তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের একজন যশোরের ইসলাম প্রচারের নকীব মুন্সী মেহেরুল্লাহ ও অপরজন নওয়াপাড়ার ইসলাম প্রচারক সূফী মুহাম্মদ আলী শাহ। মুহাম্মদ 'আলী শাহের কাছে তিনি ফার্সী ভাষা হতে গুলিস্তা ও বুস্তার অনুবাদ করার উৎসাহ পান।[৪০৭] তৎকালীন সময়ে ইসলামী আদর্শ ও চেতনার প্রতিফলনের জন্য মুসলমান সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে তাঁরই উদ্যোগে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য পরিষদ 'যশোর-খুলনা সাহিত্য সমিতি' গঠিত হয়; যা সমগ্র বঙ্গে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৪০৮] পরবর্তীতে তিনি মুকুল পত্রিকা (যা খাজা আব্দুল মজিদ শাহ কর্তৃক প্রকাশিত হয়) এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪০৯] তাঁরই দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুকুলের সাহিত্যিক মানকে উঁচু করেছিল সন্দেহ নেই। তিনি এ পত্রিকায় অসংখ্য কবিতা লিখেছেন।[৪১০]

---

৪০৭. মহসিন হোসাইন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৩৪।

৪০৮. উক্ত সমিতির ব্যাপারে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, "আমি কলকাতায় যাইবার পরই মৌলভী মোহাম্মদ এসহাক সাহেব আমাকে লিখেছিলেন- আমাদের সাহিত্য চর্চায় সুবিধার জন্য একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কথাটা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল, তদানুসারে ১৯১১ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রসিদ্ধ জনাব ইরানী পীর সাহেবের নওয়াপাড়ায় ইহার প্রথম পরামর্শ সভা শর্সিনার মোহাম্মদ এসহাক সাহেবের বাটিতেই (৫ই জৈষ্ঠ ১৩৮১) ইহার প্রথম অধিবেশন হইল। ঐ সভায় মৌলভী মোহাম্মদ এসহাক সাহেব সমিতি সঙ্গীত শুনাইলেন। মৌলভী খন্দকার গোলাম খয়বার সাহেব সাহিত্য সমিতির আবশ্যকতা বর্ণনা করিলেন।" দ্রঃ মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *শেখ হবিবর রহমান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯০), পৃ. ১৯।

৪০৯. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৩৫।

৪১০. প্রাগুক্ত, উদাহরণ স্বরূপ একটি কবিতা যা মুকুলের ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা জৈষ্ঠ ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। যা নিম্নরূপ-

তোমার দানের শেষ নাহি
তোমার দানের শেষ নাহি গো শেষ নাহি
নিঃস্ব জনে দাওগো তুমি বাদশাহী
কত কী যে মনের মতন
দাওগো তুমি যখন তখন
চাহি কিংবা নাহি চাহি।
তোমার দানের শেষ নাহি গো শেষ নাহি।
রিক্ত আমি চিরদিনই রিক্ত যে,
বেদনা ভরা সঞ্চিত এ চিত্ত যে।
প্রভু তব অনুগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান ছিলেন একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক। তাঁর রচনাবলীর অধিকাংশই ইসলামী আখ্যান ও ভাবধারায় রচিত। এ সকল রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইসলাম ও অন্যান্য ড্রামা (১৯০৭), আবে হায়াত (কাব্য, ১৯১৫), পরিজাত (কাব্য ১৯১৬), মালাবারে ইসলাম প্রচার (১৯১৮), দুররুল মুখতার (১৯২৪), আলমগীর (১৯১৯),। আত্মজীবনী মূলক লেখা আমার সাহিত্যিক জীবন (১৯৭২) কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা (১৯৩৪) ভারত সম্রাট বাবর (১৯৪০) কোহিনূর (১৯১৯), ছোটদের হযরত মুসা, হায়াতে সাদী ইত্যাদি ইসলাম ও মুসলিম চেতনামূলক সাহিত্য রচনা করেছেন।[৪১১] তাঁর এ সকল লেখনী তৎকালীন মুসলমান সমাজ বিশেষ করে যশোর অঞ্চলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এই ক্ষণজন্মা মণীষী খুলনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় ৭ই মে ১৯৬২ খ্রিঃ ইন্তেকাল করেন।[৪১২]

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

"সুন্দর কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন। .... তিনি আছেন ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং প্রেমে"।[৪১৩] 'মানব জীবন' গ্রন্থে 'আল্লা' নামক প্রবন্ধে এই মহৎ বাণীর প্রবক্তা ছিলেন সাহিত্যের নীতিবাদী ও ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যিক ডাঃ লুৎফর রহমান যশোরেরই কৃতি সন্তান।

ডাঃ লুৎফর রহমান মাগুরা মহকুমার পার নান্দুয়ালী গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল একই মহকুমার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত হাজীপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম

দান করিছ অহরহ
এ দীনের দেহ গোপন বাদশাহী
তোমার দানের শেষ নাহি গো শেষ নাহি।
দ্রঃ *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৩৫-৩৬।

৪১১. ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 223.; *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৪৬-৪৭; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৫; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৯০-৯১।

৪১২. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৫; *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৪৭; ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 223.

৪১৩. ডাঃ লুৎফর রহমান, *মানব জীবন*,

Dhaka University Institutional Repository

ময়েনউদ্দীন।[৪১৪] তিনি এফ. এ. পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষাকতা করতেন এবং পাশাপাশি হোমিও প্যাথ চিকিৎসা করতেন।[৪১৫] তাই তিনি ডাঃ লুৎফর রহমান নামে পরিচিত।[৪১৬]

ডাঃ লুৎফর রহামন ছিলেন মানবতাবাদী লেখক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মুষ্টিমেয় বাঙাল মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মৌলিক ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও নিজস্ব গদ্য রচনার স্টাইল তাঁকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের গদ্য রচয়িতাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষের জন্য মমতা ও বেদনাবোধ লুৎফর রহমানের রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[৪১৭] তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তি ও নারী জাগরণের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র নর-নারী দ্বারা আদর্শ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই লেখক তাঁর লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর লিখিত সরলা (১৯১৯) প্রীতি উপহার (১৯২৯) বাসর উপহার (১৯৩৬) ও প্রতিশোধ নামক গ্রন্থগুলোতে তার এই প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়। [৪১৮] এছাড়া ১৩১৯ বাংলা সনের আশ্বিন মাসে 'নারী শক্তি' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আর নারীদের মঙ্গলার্থে নারীতীর্থ ও নারী শিল্প শিক্ষালয়' নামক দু'টি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এ সকল প্রচেষ্টা তৎকালীন সুধী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়।[৪১৯] তাঁর বিভিন্ন লেখনীর মধ্যে ইসলামের মহাত্ম্য তথা ইসলামী ভাবধারার ব্যাপক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 'স্বভাবগঠন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন-"এসলাম শ্রেষ্ঠ, এই কথা বলার জন্য যে মহা আস্ফালন করে তারও মূল্য কম। যে মিথ্যা পরিহার করে; সেই প্রকৃত খোদাভক্ত; সেই পরম শান্তিতে আছে; সেই মুসলমান।

---

৪১৪. মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৮২; কাজী শওকত শাহী, *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক* (যশোরঃ প্রকাশক, আফিয়া আমিনুন্নাহার, কাকলী প্রেস, খুলনা, ১৯৯৩), পৃ. ১২; *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৬২; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৪; তার জন্ম সম্পর্কে K.G.M. Latiful Bari বলেন- Dr. Mohammad Lutrar Rahman was born in 1889 at village Parnandual; in the Magura sub-division, cf. ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 223.

৪১৫. *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৬২; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৩-১৪; K.G.M. Latiful Bari বলেন- He was a Homeopath Physician. cf. ***Bangladesh District Gazetteer Jessore***, p. 223.

৪১৬. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৮৩।

৪১৭. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৫; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৮৩।

৪১৮. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৮৩-৮৫; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৪-১৫।

৪১৯. *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের অর্থ তর্ক নয়, আস্ফালন নয়। এর অর্থ নিরবে নিজেকে গঠন করে তোলা। এসলাম মানে কাজ, বাক্য নয়।"[৪২০] কিন্তু তাঁর রচনার মুক্ত বুদ্ধির প্রাবাল্য তাঁকে বাহ্য শরীয়তপন্থী মহলে কিছুটা অপ্রিয় করে তোলে।[৪২১] তদুপরি, সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে আদর্শবান ও উন্নত চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে ডাঃ লুৎফর রহমানের অবদান অপরিসীম। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল: কুইফ জোটের অনুবাদ (অনুবাদ গ্রন্থ), প্রকাশ (কাব্য গ্রন্থ), ডথহারা, রায়হান (১৯১৯), সরলা, মানব জীবন (প্রবন্ধ), উন্নত জীবন (প্রবন্ধ) মহৎ জীবন (প্রবন্ধ)। শিশুদের জন্য রচনা- ছেলেদের মহাত্ম্য কথা (১৯২৮) ছেলেদের কারবালা (১৯৩১) ইত্যাদি।[৪২২]

এই মহান মণীষী জীবনের শেষ দিকে অত্যন্ত অর্থকষ্টে নিপতিত হন এবং যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৬ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৪২৩]

কবি গোলাম মোস্তফা

বাংলা সাহিত্যাঙ্গণে যে কয়জন মণীষী ইসলামী কৃষ্টির রূপায়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[৪২৪] তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী রেনেসার কবিও বলা হয়ে থাকে।[৪২৫] মুসলিম জাগরণের এই অগ্রদূত কবি ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা থানার

---

৪২০. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৮৫-৮৬।

৪২১. কিংবদন্তীর যশোর সাহিত্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৬২।

৪২২. ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 224; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৫।

৪২৩. *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৬২-৬৩; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৫; ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 223.

৪২৪. এ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন- "আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের অনুসারী হয়েও আমার মনে জেগেছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাংখা। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির তাগিদে নয় সহজভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ন।" উদ্ধৃতঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৮।

৪২৫. *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৫৮; *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

মনোহরপুর নামক গ্রামে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। [৪২৬] তাঁর পিতা কাজী গোলাম রব্বানীও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ গ্রাম্য কবি।[৪২৭]

কবি গোলাম মোস্তফা ১৯১৮ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন এবং পরে ডেভিডহেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি ডিগ্রিও লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যারাকপুরে সরকারি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষকপদে যোগদান করেন। বিভিন্ন স্থানে চাকুরি বদলি হতে হতে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা অবস্থায় দীর্ঘ ৩০ বছর শিক্ষকতা পেশায় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৪২৮] স্কুল জীবনেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এ সময় তার 'আদ্রিয়ানোপাল উদ্ধার' কবিতাটি মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্য 'রক্তরাগ' ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪২৯] গোলাম মোস্তফার সাহিত্য প্রতিভা সাহিত্যের বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি ইসলামের জয়গান ও সমাজে ইসলামী কৃষ্টি ও চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন। উল্লেখ্য, মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁর কাব্যে প্রথম প্রকাশ পায় এবং এটাই তাঁর কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য।[৪৩০] তাঁর লেখনীর অধিকাংশই ছিল ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারায় সমৃদ্ধ। যার প্রমাণ মেলে তাঁর 'আল কুরআন' কুরআন শরীফের কিয়দাংশের কাব্যানুবাদ তাঁর 'ইসলাম ও কমিউনিজম' 'ইসলাম ও জেহাদ' ও মরু দুলাল গ্রন্থগুলোতে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রকাশের মাধ্যমে। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বিশ্বনবী' (১৯২৪) গ্রন্থখানি তাঁকে বাংলা গদ্য

---

৪২৬. *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৬; *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৫৮; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯০; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৮-৫৯; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৯৮; *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, পৃ. ১০৯; *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯৪; K.G.M. Latiful Bari এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- Golam Mostafa, a renowend poet was born in 1897 AD. at village monoharpur. cf. ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 224.

৪২৭. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ১৩৩; *ঝিনাইদহ জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১০৯।

৪২৮. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৯৮-৯৯; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯০; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৬-১৭; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৮।

৪২৯. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৯৯; এটি প্রকাশিত হলে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'লাইন কবিতার মাধ্যমে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন-

"তব নব প্রভাতের রক্ত রাগ খানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতিময়ী বাণী।"

৪৩০. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১০০; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করেছিল। [৪৩১] শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় তৎকালীন মুসলিম সমাজে গ্রন্থখানি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। এ গ্রন্থখানিতে ইসলামের শেষনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনী পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা শুধু তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় বহন করেনা। ভক্তের আবেগ ও গবেষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমন্বয়ে প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতা ও ভাষার প্রাঞ্জল্যতা দিয়ে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা ভাষায় বিরল।[৪৩২]

তাঁর সমগ্র সাহিত্য ও কাব্য সাধনাই ছিল ইসলামী ভাবধারা সমৃদ্ধ। বলতে কি, ইসলামী কৃষ্টি ও চিন্তা-চেতনা সাহিত্যের মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার করাই তাঁর মূল ব্রত ছিল। তাঁর অন্যান্য রচনাবলি[৪৩৩] পর্যালোচনা করলে পূর্বোক্ত কথারই প্রমাণ পাওয়া যাবে। বাংলা সাহিত্যে কবির একটি বড় অবদান হল: ইসলামী গান ও গজল ও মিলাদ মাহফিলের বিখ্যাত রাসূল আহবান বাণী রচনা।[৪৩৪] উল্লেখ্য তৎকালীন মুসলিম সমাজে গান-বাজনা একান্ত নিষিদ্ধ বলে পরিচিত হলেও গোলাম মোস্তফার এই ইসলামী গান[৪৩৫] ও গজল গীতি ধর্মীয় মিলাদ মাহফিলের অঙ্গীভূত হয়ে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৩৬] গজলটি এরূপ-

---

[৪৩১]. *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৫৮-৫৯।

[৪৩২]. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১০০; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৮; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯০; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৯।

[৪৩৩]. তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত রচনাবলির উল্লেখযোগ্য হল- হাসনা হেনা (১৯৩৮ কাব্যগ্রন্থ), খোশরোজ (কাব্যগ্রন্থ ১৯২৯), সাহারা (কাব্যগ্রন্থ ১৯৩৫), কাব্য কাহিনী (১৯৮৩), বুলবুলিস্তান (কাব্য চয়ন ১৯৪৯), রূপের নেশা ও ভাঙ্গাবুক (উপন্যাস ১৯২০-২১), তারানা-ই পাকিস্তান (গানের সংকলন ১৯৪৯), মুসাদ্দাস-ই-হালী ও ইখওয়ানুস সাফা (কাব্যানুবাদ ১৯৪১) ইত্যাদি। দ্রঃ *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ৯৯; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৭; *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯৫; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৯; K.G.M. Latiful Bari, *op cit*, p. 224.

[৪৩৪]. *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১৯; *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৫৮-৫৯।

[৪৩৫]. তাঁর উল্লেখযোগ্য গানগুলির কয়েকটি হল-

(১) হে খোদা দয়াময় রহমানুর রাহীম...
(২) নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি.....
(৩) বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার...
(৪) আমার মুহাম্মদ রাসূল.......
দ্রঃ *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১০০।

[৪৩৬]. *কিংবদন্তীর যশোর ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি যে নূরের ই রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আধারে ডুবিত সবি।
ইয়ানবী সালামু আলাইকা............... ।[৪৩৭]

বলতে কি, বাংলা ভাষায় মিলাদ পাঠ করতে গেলেই গোলাম মোস্তফার এই কিয়াম বাণী পাঠ করা এক রকম রেওয়াজে পরিণত হয়েছে এবং এটিই বহুল পরিচিত ও প্রচলিত কিয়াম বাণী।[৪৩৮] এছাড়াও কবি গোলাম মোস্তফা ইসলামী চিন্তাধারায় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেগেছেন। 'আল এসলাম', মাহে নও' 'সওগাত' মাসিক মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায়।[৪৩৯] গোলাম মোস্তফা সাহেবের আরো একটি বড় অবদান ছিল এই যে, সমকালীন মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনা করে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেন। আলোকমালা সিরিজের স্কুল পাঠ্য পুস্তকগুলো সেকালে মুসলিম পাঠ্য পুস্তক রচয়িতাদের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। এ ব্যাপারে গোলাম মোস্তফা একক না হলেও নি:সন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন।[৪৪০]

সাহিত্যাঙ্গণে বিশেষ অবদানের কারণে জীবনে তিনি অনেক সম্মাননাসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।[৪৪১] মুসলিম পুনর্জাগরণের এই অগ্রদূত কবি শেষ বয়সে ঢাকায় তাঁর নিজ গৃহ শান্তিনগরস্থ

---

৪৩৭. প্রাগুক্ত; যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক, পৃ. ১৯-২০; বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান, পৃ. ১০০।

৪৩৮. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯৭।

৪৩৯. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯০; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১০০।

৪৪০. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯৮।

৪৪১. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য "যশোর সাহিত্য সংঘ" তাঁকে কাব্য সুধাকর উপাধি প্রদান করে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পান রাষ্ট্রীয় খেতাব 'সিতারা-ই ইমতিয়াজ' প্রেসিডেন্ট পদক ও আরো পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

মোস্তফা মঞ্জিলে বাসরত অবস্থায় সেরিব্যাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।[৪৪২]

কবি ফররুখ আহমদ

মধ্যযুগীয় ইসলামী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবীয় চিন্তা-চেতনার দিশারী তথাকথিত দোভাষী বা মুসলমানী সাহিত্যের মানসপুত্র আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্য ইসলামী রেনেসার রূপকার কবি ফররুখ আহমদ।[৪৪৩] এই মহান কবি যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার মাঝআইল গ্রামে সৈয়দ পরিবারে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন জন্মগ্রহণ করেন।[৪৪৪] তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। ১৯৬৭ সনে খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৩৯ সালে কলকাতা রিপণ কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ ও সিটি কলেজে দর্শন ও ইংরেজি বিষয় নিয়ে অনার্সে ভর্তি হলেও অনার্স আর পাশ করা হয়ে ওঠেনি।[৪৪৫]

ছাত্রজীবনেই ফররুখ আহমদের সাহিত্য অনুরাগ ও কাব্যপ্রীতি পরিলক্ষিত হয়। এ সময় তিনি গোলাম মোস্তফা, আবুল ফজল, কবি আবুল হাশিম প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদেরকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।[৪৪৬] ফররুখ আহমদ প্রথম জীবনে প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম. এন. রায়ের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু জন্মসূত্রে ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের অধিকারী ফররুখ আহমদ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মীয় চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এর বহি: প্রকাশ তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সৎ-ধার্মিক, মানবতাবাদী, ও অসাধারণ

---

৪৪২. *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ২০; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯০; ***Bangladesh District Gazetteers Jessore***, p. 224.

৪৪৩. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯৮।

৪৪৪. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯২; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ৩২; এ সম্পর্কে K.G.M. Latiful Bari বলেন- Farrukh Ahmed (real name Sayed Farrukh Ahmed) was born in 1918 at village Majhail. He is a famous modern poet of Bangali Literature, cf. ***Bangladesh District Gazetters Jessore***, p. 225.

৪৪৫. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১৪৬-৪৭; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৬৪-৬৫; *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ৩২-৩৩।

৪৪৬. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিত্ববান কর্মপুরুষ।[৪৪৭] কর্মজীবনে ১৯৪৩ সালে আইজি প্রিজন অফিসে, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৫ সালে মাসিক 'মোহাম্মদীর' সম্পাদক হিসেবে এবং দেশ বিভাগের পর ঢাকায় রেডিওতে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৪৪৮]

ফররুখ আহমদ ছিলেন নজরুল ইসলামের পরে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি।[৪৪৯] ভাবে ও চিন্তায়, স্বাতন্ত্রে ত্রিশোত্তরকালের এই বলিষ্ঠ প্রতিভাধর কবি সুপ্ত মুসলিম জাতির জাগৃতির প্রয়োজনবোধে ইসলামী কৃস্টি ও ঐতিহ্যের লুপ্ত প্রায় চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার মানসে তাঁর কাব্য ভাবনাকে মুসলিম জগৃতির বাহক হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর সমগ্র চেতনা তিনি বিচরণ করেছেন, সেই জগতে যেখানে আছে ইসলামের অতীত কীর্তিগাঁথা, আর এই চিন্তা অভিব্যক্ত হয়েছে তার 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)তে।[৪৫০] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারত উপমহাদেশে ইসলামী আদর্শে পাকিস্তান নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান। ফররুখ আহমদের কাব্যে তারই স্বপ্ন সাধ মুঞ্জুরিত হয়েছিল। তাঁর সাত সাগরের মাঝি কে সেই অভিযাত্রার প্রতীক বলা যেতে পারে। উর্দূ কবি 'আল্লামা ইকবাল, হালীর কাব্যে বিশ্বব্যাপী মর্দে মু'মিন বা প্রকৃত ইমানদার মুসলমানদের আশা-আকাংখা রূপায়নের যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে, বাংলার কবি ফররুখ আহমদ তারই উত্তরসূরী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।[৪৫১] তাঁর প্রতিটি লেখনীর মধ্যে পূর্বোক্ত কথার প্রমাণ মেলে। যেমন তাঁর 'সিরাজুম মুনীরায়' কবি খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জীবনাদর্শের মধ্যে শান্তির পথের সন্ধান দিলেন আধুনিক মানবের জন্য।[৪৫২] ফররুখ আহমদ মনে করতেন- শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জাতি গ্লানিমুক্ত হতে পারে একমাত্র ইসলামী আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করলে। এই আদর্শের প্রতি কবির ধর্মের-সাহিত্যের এবং জীবনের গতি ও দর্শন

---

৪৪৭. *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, পৃ. ৩৬।

৪৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৬৫।

৪৪৯. যশোর জেলায় ইসলাম, পৃ. ৯৯।

৪৫০. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১৪৯; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯২।

৪৫১. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ৯৮-৯৯।

৪৫২. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৯২; *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীভূত হয়েছে।[৪৫৩] একথা জোর দিয়ে বলা যায়- ফররুখ আহমদের চিন্তাধারা ছিল ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য ভিত্তিক। এক স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হয়ে তাঁর কাব্য ইসলামী জীবনদার্শ ঐতিহ্যের বাস্তব রূপদানে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'হাতেম তায়ী' সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সম্পদ।[৪৫৪] শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয় মুসলিম সমাজে তাঁর এ লেখনী ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যে আমৃত্যু নিয়োজিত এই মহান কবি শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে শেষ জীবনে চরম অবিচার, অবহেলার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ওয়াহিদ আলী আনসারী

ওয়াহিদ আলী আনসারী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে চৌগাছা থানাধীন জগন্নাথপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাহার আলী মুন্সী ছিলেন একজন কৃষক।[৪৫৫] ১৯৩০ সালে কোটচাঁদপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর কর্মজীবনে তিনি মুদ্রণ ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এটিকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে যশোরে স্থানান্তরিত করেন। উল্লেখ্য, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা ও বই-পুস্তক রচনায় তার যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাসিক আনসার পত্রিকা এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক যশোর গেজেট প্রকাশ করেন। এছাড়া বেশ কিছু গ্রন্থ যেমন- নাস্তা, শেখ ফরিদ, গল্পে পাকিস্তান, আমার কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যশোরের মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তার ভূমিকা ছিল অসামান্য।[৪৫৬] বলা বাহুল্য, নওয়াপাড়ার পীর খাজা আবদুল মজিদ শাহের সাথে ওয়াহেদ আলী

---

৪৫৩. *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, পৃ. ১৪৯।

৪৫৪. *যশোর জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১০০।

৪৫৫. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৪০।

৪৫৬. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আনসারীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সচেতন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন।[৪৫৭] এ মহান ব্যক্তি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ২২ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

এছাড়াও কতিপয় সাহিত্যিক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যশোর অঞ্চল তথা সমগ্র বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে মাগুরার মোহাম্মদপুরের আলোকদিয়া পীর পরিবারের সৈয়দ আলী আহসান[৪৫৮] ও তদীয় ভ্রাতা

---

[৪৫৭]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৪০-৪১।

[৪৫৮]সৈয়দ আলী আহসানঃ "আমার পুর্ব - বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।"

এই বিখ্যাত কবিতাংশটি রচয়িতা সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, গবেষক, শিল্পো ত্বজ্ঞ, অনুবাদক, দার্শনিক, নাট্যকার, ইতিহাসবিদ এবং ধর্মীয় পণ্ডিত। তিনি ১৯২২ সালের ২২ মার্চ (মতান্তরে ২৬ মার্চ) যশোর জেলার মাগুরার মহকুমার (বর্তমান জেলার) আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আলী হামেদ এবং মাতার নাম সৈয়দা কামরূন নেগার খাতুন। ফরিদপুর-যশোর অঞ্চলের ইসলাম প্রচারের পথিকৃত হিসেবে খ্যাত বাগদাদ থেকে আগত প্রখ্যাত সূফী, সাধক, শাহ আলী বোগদাদী (রঃ) তাঁর পূর্বপুরুষ ।

সৈয়দ আলী আহসান ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। হুগলি ইসলামিয়া কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক এবং All India Redio এর সহকারী কর্মসূচী নিয়ামক রূপে (১৯৪৪-১৯৪৫) তিনি কর্মজীবন শুরু করেন । তিনি কিছু দিন (১৯৪৯-৫৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক এবং দীর্ঘদিন (১৯৫৪-৬০) করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক (১৯৬০-৬৬), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ডীন (১৯৬৬-৭২), জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২-৭৫) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫-৭৭) এর উপাচার্য এবং পরে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা (১৯৭৭-৭৮), বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (১৯৮৯) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই বছর (১৯৮৯ -এ) জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অবসর জীবন-যাপন শুরু করেন।
বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও পণ্ডিত আলী আহসানের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৭৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- অনেক আকাশ (১৯৬০), একক সন্ধ্যার বসন্ত (১৯৬২), সহসা সচকিত (১৯৬৮), উচ্চারণ (১৯৬৮), আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৩) তাঁর কবিতা গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে ইতবৃত্ত, আধুনিক যুগ (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে) (১৯৬৫), কবিতার কথা (১৯৫৭), কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮), রবীন্দ্রনাথ কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৬৩), কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ (১৯৭১) তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে পদ্মাবতী (১৯৬৮), মধুমালতী (১৯৭১) ইত্যাদি এবং অনুদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইডিপাস (১৯৬৮), আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য যোগ্য। ১৯৭৪-এ তাঁর 'কাব্য সমগ্র' প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যের বিভিন্নাংগনে অবদানের জন্য সৈয়দ আলী আহসান দেশে-বিদেশে একাধিক পুরস্কার লাভ ও খেতাবে ভূষিত হন। ফরাসী সরকার কর্তৃক সম্মামনা ছাড়াও তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), একুশে পদক(১৯৮৩), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৭), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৬৮) ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেন। আর ১৯৯০ সালে জাতীয় অধ্যাপক খেতাবে ভূষিত হন। তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল ইসলামী ভাবাদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর লেখনীর ভিতর যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ মহান ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্প্রতি (২০০২) ইন্তেকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আশরাফ[৪৫৯] উল্লেখযোগ্য । তবে এ মহান ব্যক্তিদ্বয়ের সাফল্যগাঁথা কর্মময় জীবন আমার গবেষণা কর্মের সময়সীমার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় স্থান না পাওয়ায় তাঁদের অসামান্য অবদানের কথা অতি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছি ।

তথ্য সূত্র ঃ বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান, পৃ. ১৫৭-৫৮, যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক পৃ. ৩৮-৪৩, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার পৃ. ১৬৬-৬৭ ।

[৪৫৯]. সৈয়দ আলী আশরাফঃ

সৈয়দ আলী আশরাফ ছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় নবাবগঞ্জের আজলা গ্রামে। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এস.এস.সি-তে ৫ম ও ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এইচ.এস.সি-তে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হয়ে বি.এ অনার্স পাশ করেন এবং গোল্ড মেডেল লাভ করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাশ করেন এবং ঐ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। একই বছর শেষের দিকে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স করার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার ও বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ও রিডার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'নফীল্ড ফাউন্ডেশন' স্কলারশিপ নিয়ে পুনরায় ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন এবং এক বছর সেখানে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবের কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

সৈয়দ আলী আশরাফ একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্র যখন' এবং 'কাব্য পরিচয়' (১৯৬৫), নজরুল প্রেমের এক অধ্যায় (১৯৬৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (১৯৬২), সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা(১৯৯১) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ আলী আশরাফ ছিলেন একজন দীনদার, পরহেযগার, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব । ইসলামী চরিত্রের এক অনুপম নিদর্শন সৈয়দ আলী আশরাফ অতি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেন।

তথ্য সূত্র ঃ যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার পৃ. ১৬৮-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে মসজিদ, মক্তব-মাদ্‌রাসা ও খানকাহ্ সমূহের অবদান

- মসজিদের ভূমিকা
- মক্তবের ভূমিকা
- মাদ্‌রাসার ভূমিকা
- খানকাহের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে মসজিদ, মক্তব-মাদ্রাসা ও খানকাহ্ সমূহের অবদান

মসজিদ মুসলিম সমাজ শিক্ষা (تعليم), সভ্যতা-কৃষ্টির (تهذيب و تمدن) কেন্দ্রবিন্দু। মহানবী (সঃ) আল্লাহর ঘর মসজিদকে 'ইবাদত বন্দেগী হতে শুরু করে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সকল মৌলকার্যের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের বুনিয়াদী শিক্ষা এবং প্রচার ও সংগঠনের ব্যবস্থা করে একে তিনি জাতি গঠনের উৎসস্থল রূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই দৃষ্টান্ত থেকেই মসজিদ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক-নির্দেশনার পার্লামেন্ট (সংসদ) হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। দীনি শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মসজিদ হলেও কালের বিবর্তনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে ও সমাজের প্রয়োজনে মসজিদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয় মক্তব-মাদ্‌রাসা ও খানকাহ্। যা ইসলাম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার সন্দর্ভ আলোচনার ক্ষেত্রে স্বভাবতই এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ও খানকাহ্ সমূহের অবদান আলোচনার প্রয়োজন।

মসজিদ

মসজিদ (مسجد) শব্দটি আরবী শব্দমূল سجد ও سجودا থেকে গঠিত। মূল হরফ س-ج-د আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ অবনত হওয়া (خضع), হেয় হওয়া (ذل ও ذليل) মাটির উপর কপাল ঠেকানো, অনুনয় বিনয়ের সাথে অবনত হওয়া এবং 'ইবাদতকালে কপাল ও নাক মাটির উপর রাখা।[১] শরী'য়াতের পরিভাষায় আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ এবং তার ইবাদতকে সুজূদ (سجود) বলা হয়। এই শব্দের ব্যবহার মানুষ, প্রাণী ও নিস্প্রাণ সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।[২] কোন কোন সময় সিজদা দ্বারা কেবল সালাতও বুঝিয়ে থাকে। سجد ও سجودا শব্দমূল থেকে মূলত মসজিদ (জীম এর নিচে যের, যার অর্থ সিজদার স্থান) বা মাসজাদ (জীম এর উপর যবর, যার অর্থ সিজদার ঘর) নির্গত হয়েছে। যা ইসলামী উপাসনালয় ('ইবাদত গৃহ) এর নাম। বস্তুত 'ইবাদতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুক্‌ন (ركن) সিজদা,

---

১. আয-যুবায়দী, *তাজুল 'আরূস*; Arabic and English Lexicon., *লিসানুল 'আরাব*, উদ্ধৃত: *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ১৮শ খন্ড (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫), পৃ. ৪৫৭।

২. যেমন পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে- "وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا" দ্রঃ সূরাঃ রা'দ, আ: ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য এর গুরুত্ব ও সালাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য মা'বাদ (معبد) এর স্থলে মসজিদ (সিজদার স্থান) নাম গ্রহণ করা হয়েছে।[৩] পবিত্র কুর'আনে মসজিদ (مسجد) শব্দটির একাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৪] আর ইসলামী শরী'য়াতের পরিভাষায়- যে ঘরকে কেবল আল্লাহর 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় তাকে মসজিদ বলে।[৫] মসজিদ 'ইবাদতের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত ও উত্তম স্থান। অন্যান্য স্থানের তুলনায় মসজিদে 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করা ও 'ইবাদত করা অত্যন্ত সওয়াব ও ফযীলতের কাজ। বিশেষ করে গৃহের পরিবর্তে মসজিদে জামা'আতে নামায আদায় করলে বহুগুণ সওয়াব বেশি পাওয়া যায়।[৬]

পৃথিবীর প্রথম ঘর ও মসজিদ হল কা'বা শরীফ যা মক্কায় অবস্থিত।[৭] এ কা'বা শরীফকে পবিত্র কুর'আনে মসজিদুল হারাম (সম্মানিত ঘর) হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে।[৮] মসজিদুল হারাম বা কা'বা

---

৩. আয-যুজাজের মতে যেই স্থানে 'ইবাদত করা হয়, তাকেই মসজিদ বলে। আত-তাহানী-এর মতে যে কোন সিজদার স্থানকে বলে মাসজাদ আর সালাত আদায় করার জন্য নির্ধারিত স্থানকে বলে মসজিদ। দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১৮শ খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮।

৪. যেমন কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে- "لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا" দ্রঃ সূরাঃ কাহাফ, আঃ ২১; এছাড়া আরো দ্রঃ সূরাঃ আ'রাফ, আঃ ২৯, ৩১; সূরাঃ আত-তাওবাহ, আঃ ১৮ ইত্যাদি।

৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১৮শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮।

৬. এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে- "عن ابي هريرة عن النبي صلعم قال صلوةُ الجميعِ تزيد على صلواته في بيته و صلواته في سوقة خمسة و عشرين درجةً فإن احدكم إذا توضأ فأحسنَ الوضوء و اتي المسجدَ لا يريد الا الصلوة لم يخط خطوةً الا ورفعه الله بها درجةً و حط عنه بها حطيئة حتي يدخل السجد و إذا دخل المسجد كان في صلوة ما كانت تحبسه وتصلى الملائكةُ عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه" দ্রঃ অধ্যাপক মাওঃ সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব (সম্পাদিত), *সহীহ আল-বুখারী,* ১ম খণ্ড, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২২৯।

৭. এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে- "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا و هدى للعالمين" দ্রঃ সূরাঃ আলে 'ইমরান, আঃ ৯৬।

৮. পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- "فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام الخ......" দ্রঃ সূরাঃ আল বাকারা, আঃ ১৪৯; এ আয়াতের মাধ্যমে মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। বস্তুত সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে এ মসজিদুল হারাম বিশ্বের সমগ্র মসজিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যে কারণে বিশ্বের প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের উপর এ ঘরের হজ্জ (حج) করা ফরযে করা হয়েছে। এবং এ স্থানে প্রবেশ কারীর নিরাপত্তা দান করা হযেছে। ইরশাদ হয়েছে-

 Dhaka University Institutional Repository

শরীফের পরে পৃথিবীতে দ্বিতীয় মসজিদ হল মসজিদুল আকসা (مسجد الاقصى) বা বায়তুল মুকাদ্দাস; যা জেরু জালেমে অবস্থিত। এ মসজিদ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আন মাজীদে বর্ণনা এসেছে।[৯]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে সাহাবায়ে কিরাম ও পরিবার-পরিজনসহ মদীনায় হিজরত করেন।[১০] আর সে অঞ্চলের মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মসজিদ। যার নাম মসজিদুন্নবী।[১১] এই মসজিদটি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (সঃ) স্বয়ং মদীনার কুবা পল্লীতে নির্মাণ করেন।[১২] ইসলামে এই মসজিদের গুরুত্ব ও

"وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَ مَنْ دَخَلَه كَانَ امِنًا" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ আলে ইমরান, আঃ ৯৭।

৯. পবিত্র কুর'আনে এসেছে- "سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الخ" দ্রঃ সূরাঃ বনী ইসরা'ঈল, আঃ ১।

১০. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৭), পৃ. ১২।

১১. এ মসজিদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কুর'আনে ইরশাদ করেন- "....اَلْمَسْجِدُ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ الخ" দ্রঃ সূরাঃ আত-তাওবাহ, আঃ ১০৮; উল্লেখিত আয়াতে "اَلْمَسْجِدُ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوى" দ্বারা তাফসীর কারকগণ মসজিদে কুবা/ মসজিদে নববী বলে অভিহিত করেছেন। দ্রঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), তাফসীর মা'রেফুল কুর'আন, অনূঃ ও সম্পাদনায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সৌদি আরবঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি.), পৃ. ৫৯৩।

১২. বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উটের পিঠে মদীনায় প্রবেশ করে তাঁর উটটিকে লাগামহীন অবস্থায় ছেড়ে দিলে উটটি একটি প্রশস্ত খেজুর বাগানের কাছে থেমে যায়। এই বাগানটির মালিক ছিল সহল এবং সুহায়েল নামে দু'জন ইয়াতীম বালক। রাসূলে করিম (সঃ) তাদের কাছ থেকে উক্ত জমি ক্রয় করে সেখানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের আয়তন ছিল দৈর্ঘ ও প্রস্থে ১০০ হাত এবং চারদিকে ছিল সাত হাত পরিমাণ একটি উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দ্রঃ *বাংলাদেশের মসজিদ,* পৃ. ১২-১৩; এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা,* (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ২৫; অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪), পৃ. ৩০-৩২; মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কিরাম ও মহানবী (সঃ) মিলে মসজিদটি তৈরি করেন। আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) ছিলেন মসজিদের প্রধান রাজমিস্ত্রী ও নির্মাণ কৌশলী। রাসূল (সঃ) নিজেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে ইট পাথর বহন করেন। তিনি নিজ হাতে একটি পাথর দিয়ে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। দ্রঃ ইসলামে মসজিদের ভূমিকা, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফযীলত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[১৩] এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই মহানবী (সঃ) তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। মসজিদে নববীতেই নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের আইন কানুনগুলো প্রতিপালিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে গোটা দুনিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। মূলত মসজিদে নববী ছিল 'ইবাদতসহ মুসলিম মিল্লাতের একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান বা কর্মশালা, সর্বোপরি তাঁর মসজিদ ছিল ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর হাতে সর্বোত্তম শিক্ষাগ্রহণ করেছেন সাহাবায়ে কিরামের মত সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ।[১৪] তাঁরা তাঁর কাছে আল্লাহর দীন বুঝেছেন এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে মহানবী (সঃ) এর সময়ে এবং পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার তরান্বিত হয়। বলা আবশ্যক, সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তীতে 'আরবীয় মুসলমানগণ মহানবী (সঃ) কর্তৃক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েন দা'ঈ-ইলাল্লাহর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। কেননা রাসূল (সঃ)-এর শিক্ষাই ছিল "দা'ঈ-ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন ছাড়া প্রকৃত মু'মিন

---

১৩. মসজিদে নববীর ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে- "لا تشد الرجال الا في ثلثة مساجد– مسجد الحرام والمسجد الاقصى و مسجدى هذا" অর্থাৎ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদ জিয়ারতের জন্য সফর করা উচিত নয়। যথাঃ মক্কায় মসজিদুল হারাম , জেরুজালেমের মসজিদে আকসা এবং মদীনার মসজিদে নববী। দ্রঃ মাওলানা আব্দুল মান্নান আবূ তালিব সম্পাদিত, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; অন্যত্র এসেছে- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন মসজিদে হারাম ছাড়া আমার এই মসজিদে নামায অন্যান্য মসজিদে নামায থেকে এক হাজার গুণ উত্তম। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

১৪. *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, পৃ. ২৯; শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত একদল জ্ঞান পিপাসু সাহাবী যারা পার্থিব জীবনের সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে মসজিদে নববী সংলগ্ন বারান্দায় বসবাস করতেন। তাঁরা সর্বক্ষণ রাসূল (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত থেকে কুর'আন ও হাদীস শিক্ষা করতেন এবং মুখস্ত করে নিতেন। এছাড়া সাংসারিক ঝামেলার কারণে যারা সব সময় রাসূলের (সঃ) খিদমতে হাযির থাকতে পারতেননা তাঁরা সুযোগ পেলেই রাসূলের (সঃ) দরবারে হাযির হয়ে পূর্বের ঘটনা জেনে নিতেন এবং হিফয করে নিতেন। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে باب التناوب في العلم অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে- হযরত 'উমর (রাঃ) বলেন- "كنتُ انا و جاري من الانصار نتناوبُ النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوْمًا و أنزل يومًا فإذا انزلت يومًا جئته بخبر ذلك اليوم و إذا نـزل فعـل مثـل ذلـك" অর্থাৎ আমি এবং আমার আনসার প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে পালাক্রমে যেতাম। তিনি একদিন এবং আমি অপরদিন যেতাম। আমি যেদিন যেতাম সেদিনের খবর প্রতিবেশীকে জানাতাম এবং তিনি যেদিন যেতেন, সেদিনের খবর তিনি আমাকে জানাতেন। দ্রঃ আবদুল মান্নান তালিব (সম্পা), *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১; মসজিদে নববীতে শিক্ষা আসরের ব্যাপারে এ এক উজ্জ্বলতম উদাহরণ, দ্রঃ *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পরিচয় দেয়া যায়না।"[১৫] তাইত সাহাবায়ে কিরাম ও 'আরবগণ দা'ঈ-ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন মসজিদ। আর মসজিদকে কেন্দ্র করেই তাঁরা ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে মসজিদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মদীনায় নির্মিত রাসূলে কারীমের (সঃ) মসজিদের অনুকরণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ এ সকল মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলিম স্থাপত্য কলার ইতিহাসে মসজিদের অবদান বিস্ময়কর।[১৬] উল্লেখ্য, মুসলমানরা যেখানেই গেছেন, সেখানেই স্থাপন করেছেন মসজিদ এবং গড়ে তুলেছেন মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। সেকালে মসজিদে 'ইবাদত ও শিক্ষা ছিল অবিচ্ছেদ্য। মুসলমানদের সততা, সাম্য, দয়া ও সহানুভূতি দেখে বিধর্মীদের অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করত। তাদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদেই তা'লীমের ব্যবস্থা করা হত।[১৭] অপরদিকে মুসলমানদের বিজয়ের সাথে সাথে মুসলিম শাসকবর্গ কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ নির্মিত হতে থাকে। তাঁরা মসজিদ স্থাপন করেছেন একদিকে দীন প্রচার ও প্রসারার্থে, অন্যদিকে এটি প্রতিষ্ঠার ফযীলত তথা গুরুত্ব বিবেচনা করে। কেননা

---

১৫. এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন- "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دعا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" অর্থাৎ আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ হা-মীম সিজদাহ, আঃ ৩৩; এছাড়া মহানবী (সঃ) দা'ওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- "نصر الله امرا سمعَ مِنّا شيئا فبلّغه كما سمعه فرب مبلغٌ اوعى له من سامع" অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে চির সবুজ, চিরতাজা করে রাখবেন, যে আমার কোন কিছু শুনতে পেল ও তা অন্য লোকের কাছে যথাযথভাবে পৌছে দিল..। দ্রঃ ইমাম আত তিরমিযী, *আল-জামি'উত-তিরমিযী* (করাচীঃ নূর মোহাম্মদ, আসাহুল মাতাবী, ১৯৪০ সনের দিল্লী সংস্করণ), পৃ. ৯০; *মুস্তাদরাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭; বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সঃ) এ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন- بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَة আমার নিকট হতে একটি আয়াত বা বাক্য হলেও তা প্রচার কর। দ্রঃ ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল খতিব, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩২।

১৬. *বাংলাদেশের মসজিদ,* পৃ. ১৪-১৫; মুসলমানদের বিজয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ নির্মিত হতে থাকে। এ সমস্ত মসজিদ নক্শা, নির্মাণ কৌশলে ভারসাম্য ও অলংকরণের দিক থেকে সৃজনশীল দক্ষতার অপূর্ব স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দু'ধরনের মসজিদ নির্মিত হয়। প্রথমটি সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তির উপর নতুন উপকরণের ব্যবহারে প্রার্থনাগার তৈরি করতে মুসলিম স্থপতিগণ খলিফা অথবা শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, যেমন- বসরা, কূফা, ফুসতাত। দ্বিতীয় প্রকার ছিল একান্ত প্রয়োজনে স্থানীয় অমুসলমান উপাসনালয় অথবা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করে মসজিদ নির্মিত হত। যেমন- হোমস, হামা, আলপেপা, আলেকজান্দ্রিয়া, দামেস্ক ও কর্ডোভা। দ্রঃ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

১৭. আব্দুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৮; মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম,* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০১), পৃ. ১৯৯-২০০।

রাসূল (সঃ) ঘোষণা করেছেন- হযরত 'উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আমি রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করেন।[১৮]

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আরবীয় মুসলমান বণিকগণ ও পরবর্তীতে মুসলিম বিজেতা বা শাসকবর্গের দ্বারা ইসলামের প্রচার-প্রসার সংগঠিত হয়েছে। আর উপমহাদেশে এদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছে একাধিক মসজিদ। মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের এ বিজয়ের ফলে সারা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটতে থাকে।[১৯] সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে স্থাপত্যকলার অপুর্ব স্বাক্ষর সুন্দর সুন্দর সুরম্য মসজিদ। ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয় করাচী হতে ৪০ মাইল অদূরে বামবোর নামক স্থানে। এরপর উপমহাদেশে মুসলমানদের বিস্তৃতির সাথে সাথে মসজিদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। অবশ্য উপমহাদেশে মসজিদ স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীতে দাস বংশ প্রতিষ্ঠার পর। কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীতে কুয়াত-উল-ইসলাম[২০] এবং আজমীরে আড়ই-দিন-কা-ঝোপড়া[২১] মসজিদ নির্মাণ করে স্থাপত্যের সূচনা করেন।[২২]

---

[১৮]. আবদুল মান্নান তালিব (সম্পা), *সহীহুল বুখারী,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০।

[১৯]. *বাংলাদেশের মসজিদ,* পৃ. ২৩; মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১১ খ্রস্টাব্দে উপমহাদেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। দ্রঃ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫), পৃ. ২৬৫; মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাব জয় করেন। দ্রঃ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬৬; কে. আলী, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৮), পৃ. ১১৩; Md. Mohar Ali, ***History of the Muslims of Bengal*** (Riyadh: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 1985), p. 61.

[২০]. কডরিংটন যথার্থই বলেন- "দিল্লীতে কুয়াত-উল-ইসলাম ভারতে ইসলামী স্থাপত্য কলার সূচনা করে। প্রাক- মুসলিম উপকরণের ব্যবহার সত্ত্বেও এই মসজিদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে খিলানের ব্যবহার এবং মহিলাদের জন্য পৃথক নামাযের ব্যবস্থার জন্য। উপরন্তু; পাথরে খোদাই কাজ এত সূক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই মসজিদের প্রধান আকর্ষণ কুতুব মিনার। দ্রঃ *বাংলাদেশের মসজিদ,* পৃ. ২৪।

[২১]. কুতুবুদ্দীন আজমীরে আড়াই দিন কা ঝোপড়া নামে যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন তাতে অমুসলমান ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহৃত হলেও ভারতীয় উপমহাদেশে মসজিদ রীতির প্রসারে এর বিশেষ অবদান রয়েছে। সুউচ্চ স্তম্ভরাজি দ্বারা লিওয়ান খিলান সম্বলিত সম্মুখভাগের স্ক্রীন, অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব রিওয়াক বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। কানিংহাম বলেন- In blodness of design and grandeur of conception, which are perhaps due to the genius of the Islamic architect, these two splendid mosques of the first Indian Muhammadans are only surpassed by the soaring sublimity of the christian cathedrals. উদ্ধৃত: *বাংলাদেশের মসজিদ,* পৃ. ২৪।

[২২]. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩; নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* (ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রথম যুগেই বঙ্গদেশে ইসলামের আগমন ঘটলেও ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের পূর্বে এ দেশে কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কি না ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে বখতিয়ার খলজীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এবং সেই সাথে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[২৩] যদিও কালের করাল গ্রাসে তাঁর সবগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না।[২৪] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হুগলী জেলার ত্রিবেণী মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। পরবর্তীকালে সাতগাঁও এবং ছোট পান্ডুয়া মুসলিম অধিকারে আসে। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে জা'ফর খান গাযী ত্রিবেণী দখল করেন এবং সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মসজিদ স্থাপত্যের সূচনা করেন। তিনি ত্রিবেণীতে যে মসজিদ স্থাপন করেন তা জা'ফরখান গাযীর মসজিদ নামে পরিচিত।[২৫] অবশ্য সম্প্রতি রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার 'মজদের আড়া' গ্রামে ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।[২৬] কারবালার নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের মাত্র আট বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিকের শাসনামলের এই মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। 'মজদের আড়া' নামে পরিচিত জায়গায় ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬X৬X১ আকৃতির বিশেষ ধরনের ইট গুলোতে নানা প্রকার ফুল, নক্‌শা ও আরবী হরফে কালিমা তাইয়্যেবাসহ হিজরী ৬৯ সন লেখা আছে।[২৭]

---

২৩. ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে মুসলমানদের বিজিত স্থান সমূহে মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক চেতনার আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত মুসলিম শাসনের এ প্রথম দু'শো বছর বাংলার বিপুল সংখ্যক অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কাজেই তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন পরিচালনার জন্য এ বিপুল সংখ্যক মসজিদ ও খানকাহ'র প্রয়োজন হয়েছিল। দ্রঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ২৩৫।

২৪. *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ৩১।

২৫. *প্রাগুক্ত; যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩২-৩৩।

২৬. ১৯৮৬ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখের "দৈনিক বাংলায়" হিজরী ৬৯ সনের মসজিদ আবিষ্কার শিরোনামে এ সংক্রান্ত খবর প্রথম প্রকাশিত হয়। এরূপ দৈনিক সংগ্রাম ও ইনকিলাব সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দ্রঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩৩।

২৭. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা*, পৃ. ১০৮।

 Dhaka University Institutional Repository

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর কর্তৃত্ব অবজ্ঞা করে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। এ সময়ে (১৩৪২ খ্রিঃ) গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন শাহকে হত্যা করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলায় প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য অক্ষুন্ন রাখেন। সমকালে বাংলাদেশে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। এ সময়ে 'আরব-পারস্য, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু সূফী-সাধক, সেনাপতি, স্থপতি বাংলাদেশে আগমন করেন। সুদীর্ঘ দুইশত বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ্ মাযার, দূর্গ, রাস্তা, পুল, জলাশয়, প্রাসাদ প্রভৃতি।[২৮] শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ দিনাজপুরের দেবীকোটে মোল্লা 'আতার দরগাহে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সময়ে তিনি বাংলায় অসংখ্য মসজিদ-মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[২৯] ইলিয়াস শাহী বংশের পতনের পর রাজা গনেশের পুত্র জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের আমলে তিনি অসংখ্য মসজিদ-মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন।[৩০] ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দে নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ নামীয় শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের এক পৌত্র পুনরায় সিংহাসন দখল করে ইলিয়াসশাহী রাজত্ব কায়েম করেন। তাঁর সুদীর্ঘ ২৪ বছরের রাজত্বকালে (১৪৪২-৬০খ্রীঃ) রাজ্যের সর্বত্র অনিন্দ সুন্দর ইমারত তৈরি করেন। যার মধ্যে মসজিগুলো উল্লেখযোগ্য। তাঁর নির্মিত ঢাকায় বিনত বিবির মসজিদ, হুগলীর সাতগাঁ, ময়মনসিংহের ঘাঘরা প্রভৃতি মসজিদ অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।[৩১] এই সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (রঃ) যশোর-খুলনা অঞ্চলে খলীফাতাবাদ নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ অঞ্চলে অসংখ্য জলাশয়, বাসস্থান, রাস্তা, মসজিদ ও মাযার নির্মাণ করেন। কথিত আছে, এ সময়ে বাগেরহাট অঞ্চলে ৩৬০টি মসজিদ নির্মিত হয় যার বেশিরভাগই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেকগুলো আজও স্বমহিমায়

---

২৮. *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ৩২-৩৩।

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩৩।

৩০. ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পতন হয়। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন রাজা গণেশের বংশ। গণেশের পুত্র যদু জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে ইসলাম কবুল করেন। তিনি ১৪১৫ থেকে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মসজিদ-মাদ্‌রাসা ও সরাইখানা নির্মিত হয়। তিনি রাজধানী গৌড় থেকে পান্ডুয়াতে স্থানান্তর করেন। তিনি বিচক্ষণ শাসক ছিলেন এবং মুদ্রায় নিজেকে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী হিসেবে প্রচার করেন। দ্রঃ *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ৩৪।

৩১. *প্রাগুক্ত; যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

দিপ্যমান। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ,[৩২] নয় গম্বুজ মসজিদ, সিঙ্গার মসজিদ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৩৩] ইলিয়াসশাহী বংশের রাজত্বকালে (১৪৪২-৮৭ খ্রিঃ) বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক মসজিদ নির্মিত হয়। এ সময় নির্মিত মসজিদগুলোর দেয়াল একটু কম প্রশস্ত ছিল। গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ, খনিয়া দীঘি মসজিদ, ধুনিচক মসজিদ, পটুয়াখালীর মসজিদ বাড়ি মসজিদ, বরিশালের কসবা মসজিদ, যশোরের বারবাজার মসজিদ বিক্রমপুরের বাবা আদম মসজিদ, নারায়ণগঞ্জের বাবা সালেহ মসজিদ, দিনাজপুরের চেহেল গাজী মসজিদ; পাবনার শাহজাদপুর মসজিদ, চট্টগ্রামের ফকীরা মসজিদ এবং ফরিদপুরের সাতৈর মসজিদ এ সময়ের কীর্তি।[৩৪] সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্রের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) বাংলায় অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, যশোরের শৈলকুপা মসজিদ, বাগেরহাটের হোসেনশাহী মসজিদ, ফরিদপুরের পাতরাইল মসজিদ, সোনারগাঁয়ের গোয়ালদিহি মসজিদ, ময়মনসিংহের জাওয়ার মসজিদ, কুমিল্লার বড় গোহালী মসজিদ এবং শ্রীহট্ট জেলার শঙ্কর পাশা মসজিদ এই আমলে নির্মিত হয়।[৩৫] আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসূল সৌধ, পাবনার নবগ্রাম মসজিদ, নূর কুতুব-উল আলমের (পান্ডুয়ায়) চিল্লাখানার মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬]

---

৩২. ষাটগম্বুজ মসজিদঃ This historic Mosque in located in mauza Sundarghona Bazeapti 130, plot no 108, Shait Gumbad U.P., Bagerhat Upazila, District Bagerhat. This brick-built mosque is the largest ancient mosque in Bangladesh. It is 'popularly known by its highly misleading name of Shait Gumbad(meaning 60-domed) though it is in fact crowned by 77 domes, in addition to another 4, covering the round corner towers`. It was erected in about 1440 A.D. cf. Khoundkar Alamgir, ***Khan Jahan (R.): Ruler, Builder and Saint*** (Dhaka: Parash Publishers, 2001), p. 25.

৩৩. *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ৩৪; তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আবুল কালাম মোহাম্মাদ যাকারিয়া বলেন- সামান্য একজন শাসনকর্তা যে সকল কীর্তি রেখে গেছেন তা একজন সম্রাটের পক্ষেও গর্বের বস্তু। সম্রাট শাহজাহানের সাথে তাঁর কীর্তির তুলনা দিতে চাইনা তবে সামান্য একজন স্থানীয় শাসনকর্তা হয়ে তিনি যা করে গেছেন তা সম্রাট শাহজাহানের কীর্তির সঙ্গে তুলনার যোগ্য। দ্রঃ আ. ক. ম. যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৩৭।

৩৪. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩৮।

৩৫. *প্রাগুক্ত*।

৩৬. *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

মোঘল আমলে এদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। ঢাকার লালবাগের দূর্গের মসজিদ, চকবাজার মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, ইসলাম খানের মসজিদ, ফররুখ সিয়রের মসজিদ ইত্যাদি মোঘল আমলে তৈরি। চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লা মসজিদ, কদম মোবারক মসজিদ, ওয়ালী খান মসজিদ, কুমিল্লার শাহ সুজা মসজিদ, শাহ পরানের দরগাহ মসজিদ, ময়মনসিংহের এগার সিন্দুরে মসজিদ, বরিশালের বিবি চিনির মসজিদ, কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া ও সাতবাড়িয়া মসজিদ, নোয়খালীর বজরা মসজিদ, বগুড়ার মহাস্থানগড় মসজিদ ও খোন্দকার টোলার মসজিদ এদেশে মোঘল আমলে তৈরি মসজিদ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৩৭]

যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় তিনি হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (রহঃ)। যতদূর জানা যায়, যশোর অঞ্চলে তিনিই সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। অবশ্য তার পূর্বে হযরত বড় খান গাযী (রহঃ) এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন তবে তাঁর তৈরি কোন মসজিদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। হয়ত সেগুলো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যায় হযরত উলুঘ খান জাহান আলীই (রহঃ) এ অঞ্চলের প্রথম মসজিদ নির্মাতা।[৩৮] তিনি বাগেরহাট পৌছানোর পূর্বে যশোরের বারবাজারে প্রথম আস্তানা গেড়ে কিছুকাল ইসলাম প্রচার করেন। তাই মনে করা হয়। বাগেরহাটের মসজিদগুলো নির্মাণের বেশ আগেই বারবাজারের মসজিদ ও অন্যান্য কীর্তি নির্মিত হয়। সেদিক থেকে বারবাজারের গোড়া মসজিদকে যশোর-খুলনা তথা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম মসজিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর বাগেরহাট পৌছাতে গিয়ে খান জাহান আলী (রহঃ) পথিমধ্যে যে সব মসজিদ নির্মাণ করেন সেগুলোও সমসাময়িক সময়ে নির্মিত হয়।[৩৯] যশোর অঞ্চলে তাঁর নির্মিত এ সকল মসজিদ ও পরবর্তীতে অন্যান্য মসজিদ সমূহ ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে সে সকল মসজিদ ও ইসলাম প্রচার-প্রসারে এগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

---

৩৭. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩৮-৩৯।

৩৮. নাসির হেলাল, *বারবাজারের ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, পৃ. ১৯৯৩), পৃ. ২১।

৩৯. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১৩৪-৩৫; *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

গোড়া মসজিদ

ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক বারবাজারে গোড়া/ গোরাই মসজিদটি ইসলামী স্থাপত্যের এক অনুপম ও ঐতিহাসিক নিদর্শন বুকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকা-যশোর মহাসড়ক থেকে পশ্চিম দিকে রেল লাইন পার হয়ে গন্নুহাট ছেড়ে কিছু দূর অগ্রসর হলেই কাঁচা রাস্তার বাম হাতে গোড়া মসজিদের অবস্থান।[৪০] মসজিদ থেকে ৩০গজ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ৪/৫ বিঘা আয়তনের গোড়া পুকুর আজও বিদ্যমান। এই পুকুরের পশ্চিম পাশে বাঁধানো ঘাট ছিল বলে জানা যায়।[৪১] আজও তার কিছু নিদর্শন দেখা যায়। নির্মাণ শৈলীর দিক দিয়ে মসজিদটি যথেষ্ট সৌন্দর্য ও কারুকার্যপূর্ণ।[৪২] জানা যায়, মসজিদের চারদিকে প্রাচীর ছিল। মসজিদের সামনের দিক ছাড়া বাকী তিন দিক এক পর্যায়ে চাপা পড়ে। ধ্বংস প্রায় এই মসজিদটিকে রক্ষার জন্য পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মেরামতের কাজ হাতে নেয়। ১৯৮৩ সালে প্রথমবার একটি ছিদ্র সারানো হয়;[৪৩] এবং ১৯৯৩ সালের প্রথমদিকে খনন কাজ চালানো হয়। এ সময় গোড়া মসজিদের সম্মুখে কয়েকটি পিলার ও কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। কবরটি গোরাই নামক একজন দরবেশের বলে অনেকে মত ব্যক্ত করেছেন। যাঁর নামানুসারে গোড়া মসজিদের নামরকণ হয়েছে।[৪৪] তবে

---

৪০. *বারবাজারে ঐতিহ্য,* পৃ. ২৩।

৪১. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩১৪; মীর্জা মোহাম্মদ আল-ফারুক সম্পাঃ, *ঝিনাইদহের ইতিহাস* (ঝিনাইদহঃ জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ, ১৯৯১), পৃ. ৫৫-৫৬।

৪২. আ.কা.ম. যাকারিয়া তাঁর "বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ গ্রন্থে মসজিদটির নির্মাণ তথা প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, "বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে প্রায় ৩০ ফুট ও ভিতরের দিকে ২০ ফুট লম্বা। দেয়ালগুলো ৫ফুট প্রশস্ত। ৪ কোণে ৪টি সুন্দর অষ্টকোণাকৃতির মিনার আছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। পশ্চিম দেয়ালে আছে দরজা বরাবর ৩টি মেহরাব। কেন্দ্রীয় মেহরাব অপেক্ষাকৃত বড়। মেহরাবগুলোতে পোড়ামাটির ফলকে ফুল ও লতাপাতার অলংকরণ ছিল। এতদিন পরেও পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোর সৌন্দর্য খুব একটা নষ্ট হয়নি। মসজিদের অভ্যন্তরে চার দেয়ালের কেন্দ্র স্থলে ও দেয়াল ঘেষে ৪টি পাথরের স্তম্ভ আছে। এ ৪টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের একমাত্র গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। প্রায় অর্ধাবৃত্তকারে উপুড় করা পেয়ালার আকৃতিতে নির্মিত গম্বুজটি ছিল দেখতে অত্যন্ত মনোরম।" দ্রঃ *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩১৪।

৪৩. গম্বুজের কেন্দ্রস্থলে দেড়-দুই ফুটের মত একটি গোলাকার ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৫০ জন কর্মচারী প্রায় তিন মাস পরিশ্রমের পর ঐ ছিদ্র সারাতে সক্ষম হয়। দ্রঃ *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৩; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১৩৫।

৪৪. *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি তেমন একটা নেই। খনন কাজের মাধ্যমে এখানকার মাটি সরিয়ে ফেলা হয়; এখানে বর্তমান নিয়মিত নামায পড়া হয়। মসজিদের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি।[৪৫]

গোড়া নামক এই মসজিদটি খান-ই জাহান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি রয়েছে। তবে মসজিদের গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশল·বিশ্লেষণ করে 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থের লেখক আ.কা.ম. যাকারিয়া এটিকে খান জাহান কর্তৃক নির্মিত নয় বলে মত পোষণ করেছেন।[৪৬] তাঁর মতে মসজিদটি খুব সম্ভব হোসেন শাহ কিংবা তাঁর পুত্র নুসরাত শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[৪৭] কিন্তু এ মতটিও প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। বরং খান-ই জাহান এ অঞ্চলে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন এটা ঐতিহাসিক সত্য; সুতরাং এ অঞ্চলের অধিকাংশ মসজিদগুলো তাঁর নির্মিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এটি যাঁর দ্বারা নির্মিত হোক না কেন ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে মসজিদটির অবদান সহজেই অনুমেয়।

জোড় বাংলার মসজিদ

গোড়া মসজিদ থেকে কিছু দূর এগিয়েই রাস্তার দক্ষিণ পাশে একটি মাঝারি আকারের প্রাচীন জলাশয়/পুকুর আছে। এই পুকুরটির পশ্চিম পাড়ে সামান্য উঁচু ঢিবি চোখে পড়ে। ঢিবি দুটো ইটে পরিপূর্ণ। আয়তনে এক একটা এক বিঘা জমি জুড়ে আছে। এই ঢিবি দুটোই জোড় বাংলা মসজিদ নামে পরিচিত।[৪৮] একসাথে লাগানো দুটি মসজিদের অস্তিত্ব সাধারণত দেখা যায়না। এছাড়া পাশাপাশি দুটো ঢিবি থাকার কারণে এটাকে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলেও মত পোষণ

---

৪৫. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩১৫; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩৫।

৪৬. আ.কা.ম. যাকারিয়া এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে, বাগেরহাট অঞ্চলে খান-ই জাহান নির্মিত মসজিদগুলোর স্থাপত্য কৌশলের সংগে গোরাই মসজিদের স্থাপত্য কৌশলের খুব একটা মিল নেই। একটি দেয়াল মাত্র ৫ফুট প্রশস্ত। খান-ই জাহানের কোন মসজিদের দেয়াল ৭/৮ ফুটের কম প্রশস্ত নয়। খান-ই জাহানের মসজিদের কোণে যে সমস্ত মিনার দেখা যায় সেগুলো সবই গোলাকার। আর গোরাই মসজিদের মিনারগুলো অষ্টকোণাকৃতির। গম্বুজের আকারও ঠিক খান জাহানের স্টাইলের নয়। এতে অনুমিত হয় যে, মসজিদটি খান-ই জাহান কর্তৃক নির্মিত হয়নি। দ্রঃ *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*। পৃ. ৩১৯-২০।

৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০।

৪৮. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ১৩৫; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ২১৬; *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, পৃ. ৫৬।

করেছেন। তবে ১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ও হুজরাখানা/ মক্তব।[৪৯]

জোড় বাংলা মসজিদের খনন কার্য চলাকালে মসজিদ সংলগ্ন একটি সিঁড়ি পাওয়া গেছে; যে সিঁড়িটি পার্শ্ববর্তী অন্ধপুকুরের (জোড় বাংলা দীঘি) তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সিঁড়ির শেষ প্রান্তে 'আরবী অক্ষর খচিত কয়েকটি ইটের খন্ড পাওয়া গেছে। যাতে লেখা আছে 'শাহ সুলতান মুহাম্মদ এবনে হুসাইন, ৮০০ হিজরী'। বর্তমানে মসজিদটিতে নামায পড়া হয়।[৫০]

গলাকাটির মসজিদ

গলাকাটি দীঘির দক্ষিণ পাড়ে এ মসজিদটির অবস্থান এতদিন ঢিবি আকারে ছিল। অবস্থানগত দিক থেকে গোড়া মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে ২০০ গজের মত বারবাজার-হাকিমপুর রাস্তার ডান পাশেই এটি অবস্থিত।[৫১] গলাকাটি নামের কারণে অনেকে এটিকে মন্দির বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের ধারণা এ মন্দিরে হয়ত নরবলি দেওয়া হত এবং সেখান থেকেই এ দীঘি গলাকাটি মন্দির অথবা মসজিদ নামে নামকরণ হয়েছে। আ.ক.ম. যাকারিয়া ও অনুরূপ (মন্দিরের) মতের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।[৫২] অবশ্য, ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে এ ঢিবিকে মসজিদ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।[৫৩]

---

[৪৯]. খননের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ও কয়েকটি কবর। মসজিদের গম্বুজটি টিকে নেই। কিন্তু লিনটেন পর্যন্ত টিকে আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর ইট দিয়ে গাঁথা এ মসজিদটি সমতল ভূমি থেকে প্রায় ১০/১১ ফুট উঁচু মাটির বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদের পূর্বপার্শ্বে ঢোকার দরজা এবং পশ্চিম পাশে আছে একটি মিহরাব। মিহরাবটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে ফুল-লতা-পাতা অংকিত ইট দিয়ে তৈরী। কারুকার্য খচিত এ মিহরাবটি এখনো টিকে আছে। সমতল ভূমি থেকে কেন এতোটা উঁচুতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল তার কোন কার্যকরণ এখনো বের করা সম্ভব হয়নি। ১৮ ফুট ১৮ ফুট বর্গাকার এ মসজিদটিকে জোড় বাংলা মসজিদ বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মসজিদের পাশে একটি হুজরাখানা অথবা মক্তব ছিল। দ্রঃ *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৫-২৬।

[৫০]. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬।

[৫১]. *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৪।

[৫২]. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩১৫-১৬।

[৫৩]. উদ্ধৃত: *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রতি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খননের ফলে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়েছে। খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে এটি একটি মসজিদ।[৫৪]

পাঠাগার মসজিদ

পাঠাগার মসজিদের অবস্থান পিঠে গড়া পুকুরের পাড়ে। মসজিদের পাশেই জ্ঞান পিপাসুদের জন্য পাঠাগার। অনেকের ধারণা সুলতানী আমলে এখানে একটি সমৃদ্ধ ইসলামী পাঠাগার গড়ে তোলা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মুসলমানেরা তঁদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে এখানে একত্রিত হতেন। হয়ত এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমাবেশ ও গবেষণা ধর্মী আলোচনা হত।[৫৫]

চেরাগদানী মসজিদ

বারবাজার শহর থেকে ১.৫ কিলোমিটার পশ্চিমে চেরাগদানী গ্রাম। গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় বেশ বড় ধরনের একটি দীঘি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দীঘিটির নাম চেরাগদানী দীঘি। এই দীঘির দক্ষিণ পাড়ে চেরাগদানী মসজিদ অবস্থিত।[৫৬] বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহু ভেতরের দিকে ছিল প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ। দেয়ালগুলো ছিল প্রায় ৪.৫ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের ভগ্নাবশেষ মাটির উপর প্রায় ৩/ ৪ ফুট উঁচু অবস্থায় এখনো টিকে আছে। পূর্ব দেয়ালের অতি সামান্য অংশ ছাড়া বাকী সম্পূর্ণ দেয়াল প্রায় নিশ্চিহ্ হয়ে গেছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশ পথ ছিল। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। গম্বুজ খুব সম্ভবত একটাই ছিল। মসজিদের অভ্যন্তরে একটি জুম'আ ঘর নির্মিত হয়েছে। সেখানে নিয়মিত নামায পড়া হয়।[৫৭] ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ কোনায় ২টি বড় বড় কবর পাওয়া গেছে।[৫৮] সম্ভবত এটি কোন দরবেশের এবং খাদিমের হয়ে থাকবে।

---

[৫৪]. *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৪।

[৫৫]. *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৬।

[৫৬]. *প্রাগুক্ত*।

[৫৭]. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩১৬; আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাঃ; *যশোর পরিচিতি,* ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৫৭।

[৫৮]. *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাতগাছিয়া আদিনা মসজিদ

বারবাজার শহর থেকে প্রায় ৪ কি.মি. পশ্চিমে সাতগাছিয়া গ্রাম। এ গ্রামেই লোহার শলা দীঘির পূর্বপাড়ে আদিনা মসজিদের অবস্থান। এ দীঘিটিকে আদিনা দীঘিও বলা হয়। বিরাট আকারের ঢিবি থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জনগণ খননের মাধ্যমে মসজিদটির কিছু অংশ আবিষ্কার করে। এই কিছু অংশ থেকে ১৬টি থাম বিশিষ্ট চমৎকার একটি মসজিদের অংশ বের হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আরো ৩২টি থাম অর্থাৎ ৪৮ থাম বিশিষ্ট বিশালাকৃতির একটি মসজিদ আবিস্কৃত হয়েছে। ছোট ছোট পাতলা ইট দ্বারা নির্মিত এ মসজিদের ভেতরের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব দেখা যায়। মসজিদটিতে এখন নামায হয়।[৫৯]

ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র বারবাজারের ঐতিহাসিক নিদর্শন বিশেষ করে পুকুর এবং ঢিবিগুলোকে হিন্দু এবং বৌদ্ধ কীর্তি অর্থাৎ অশোকের স্তূপ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এছাড়া বারবাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরগুলোকে হিন্দু-বৌদ্ধ আমলের পাথর বলে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।[৬০] কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে মিত্রের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

অশোকের স্তূপের বদলে ঢিবি থেকে বের হয়েছে মসজিদ। এ পর্যন্ত এ অঞ্চলে কোন মন্দির আবিষ্কার হয়নি। ভগ্নস্তূপ থেকে এ পর্যন্ত মসজিদই আবিষ্কার হয়েছে বা মসজিদের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এছাড়া পাথরগুলোর ব্যাপারে মিত্র মহাশয়ের বক্তব্য নিতান্তই একপেশে ও অনুমান নির্ভর। কারণ হযরত উলুঘ খান জাহান আলী বাগের হাট এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ষাট গম্বুজ মসজিদসহ যে মসজিদগুলো তৈরি করেছেন সেগুলোতেই প্রচুর পাথরের স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বারবাজারের পাথরগুলো যদি হিন্দু-বৌদ্ধ আমলের মঠ-মন্দিরের হয়ে থাকে তাহলে বাগেরহাটের মসজিদে ব্যবহৃত পাথরগুলো কোথা থেকে আসলো? সুতরাং বলা যায়- এ পাথরগুলো হযরত উলুঘ খান-ই জাহান আলী ও অন্যান্য শাসকেরা পানি পথে এনে তাঁদের প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন।[৬১]

বারবাজারের মসজিদগুলো সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা এগুলো বিভিন্ন মুসলিম শাসক ও হযরত উলুঘ খান জাহান আলী কর্তৃক নির্মিত। ঐ সকল শাসক ও দরবেশগণ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-

---

[৫৯]. *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৮।

[৬০]. সতীশ চন্দ্রমিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ১ম খন্ড, পৃ. ২১৬; *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১৩৭-৩৮।

[৬১]. *বারবাজারের ঐতিহ্য,* পৃ. ২৮-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসার ও 'ইবাদতের নিমিত্তে মসজিদগুলো নির্মাণ করেছেন এবং মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে তাঁদের দা'ওয়াতী কাজ তরান্বিত করেছেন। সুতরাং বারবাজার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে মসিজদগুলো (ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) যে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

শৈলকুপা মসজিদ

দক্ষিণ বঙ্গে সুলতানী আমলের স্থাপত্য কীর্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই শৈলকুপা মসজিদ। বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমান জেলা) শৈলকুপা উপজেলার কুমার নদীর তীরে এ মসজিদের অবস্থান। জায়গাটির নাম দরগাহ পাড়া।[৬২] উক্ত স্থানে প্রাচীন আমলের একটি মাযার আছে। স্থানীয় লোকদের মতে এটি শাহ মোহাম্মদ 'আরিফ-ই-রব্বানী ওরফে আরফ শাহের মাজার।[৬৩] সম্ভবত এই দরবেশ এতদাঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য উক্ত মসজিদকে কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এই মসজিদের নির্মাণশৈলী খুবই চমৎকার।[৬৪] মসজিদটিতে কোন শিলালিপি নেই তবে মসজিদের নির্মাণ কৌশল ও স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে ধারণা করা যায় যে, মসজিদটি সুলতানী আমলে তৈরি। স্থানীয় জনশ্রুতিতে আরো জানা যায় মসজিদটি নির্মাণ করার জন্য সুলতান নসরত শাহ, শাহ মোহাম্মদ আরফ বা আরব শাহ (রহঃ) কে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছিলেন। তার অসংখ্য কারামতের কথাও এই অঞ্চলে সকলের কাছে শোনা যায়।[৬৫] মসজিদটি সম্পর্কে খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী লিখেছেন-As to the origin of the Masjid (called in imperial Farmaus Masjid-i-Jamia or cathedral mosque) it is stated that king Nasir Shah, son of Hussain Shah of Bengal, While travelling from Gaur on his way to Dacca came to Mauja Shailakupa with Nasir Shah were Hajrat Maulana Muhammad Arab, a renewned Darvish and Murshid (Spiritual quide) of the king; Hakim Khan, a pathan, Saiyid Shah Abdul Qadir-i-Baghdadi, and a Fakir.

---

৬২. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩৯।

৬৩. *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ৬০; *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩২৬।

৬৪. আব্দুল ওয়ালী এই মসজিদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন- "The cornices are all very beautiful and well-planned. The space over the top of the entrance of facade is raised and the bricks are carved and ornamented but broken. দ্রঃ *বাংলাদেশের মসজিদ*, পৃ. ৬০।

৬৫. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩২৬; আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা), *যশোর জেলার ইতিহাস*, (ঢাকাঃ দিগন্ত প্রচারণী লিমিটেড, ১৯৯০), পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

The Maulana on seeing the village was very much delighted and said. El like this place- I will inhabit here. The above mentioned three persons who were the disciptes of the Maulana wished also to remain with their Murshid at Shailakupa. Nasir Shah consented to thes. and left his Wazir Shah Ali in the service of the pir. The king grauted a few bighas of Lakhiraj Land and was pleased to call the Mauza Nasirpur after his own name.[৬৬]

শেখপুরা মসজিদ

শেখপুরা কেশবপুর উপজেলার শহর থেকে ৬/৭ কি. মি. পূর্ব দক্ষিণে একটি গ্রামের নাম। এখানে তিনশ বছরের পুরনো ইসলামী স্থাপত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন শেখপুরা মসজিদটি আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির স্থাপত্য কৌশল অত্যন্ত মনোরম। কারুকার্য খচিত ও ইসলামী রীতি অনুসৃত মসজিদটি পুরাকীর্তির এক অনুপম নিদর্শন। এতে ব্যবহৃত ইটগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির। আরবের একজন ইসলাম প্রচারক সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রহঃ) ১৬৩৭ সালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশে আসেন। জানা যায়, এক পর্যায়ে তিনি কেশবপুর উপজেলার শেখপুরায় এসে আস্তানা গাড়েন। তিনি এ ঐতিহাসিক মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা যায়। মসজিদটি সম্পর্কে যশোরের তরুণ সাংবাদিক হারুনুর রশিদ ১২ পৌষ ১৩৯৬ সংখ্যা দৈনিক সংগ্রামে লিখেছেন- মসজিদটির স্থাপত্য কৌশল অত্যন্ত কারুকার্যের স্বাক্ষর বহন করে। ইসলামী রীতি অনুসৃত কারুকার্য পুরাকীর্তির এক অপূর্ব নিদর্শন। গম্বুজ দিয়ে ঢাকা এই মসজিদটির আলাদা কোন ছাদ নেই। ক্ষুদ্রাকৃতির ইট দিয়ে গাঁথা দেয়ালগুলো অত্যন্ত শোভামন্ডিত। কিন্তু ইসলামী স্থাপত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটি অযত্ন অবহেলায় ধ্বংসের পথে। এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা আশ্বাস দিলেও বাস্তব উদ্যোগ ঘটেনি।[৬৭] লোনা লেগে ইট, চুন, সুরকি ক্ষয় হতে হতে মসজিদটি এখন স্বকীয়তা হারিয়ে বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।[৬৮]

---

৬৬. Khan Shaheb Abdul wali, ***Journal of the Assiatic Society of Bengal 1901***, pp. 15-28.

৬৭. উদ্ধৃত: *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৩৯।

৬৮. গবেষক সরেজমিনে মসজিদটি পরিদর্শন করে উক্ত অবস্থা দেখতে পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মীর্জানগর মসজিদ

মীর্জানগর ছিল মোঘল আমলের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানেই সেই আমলের অসংখ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি কেশবপুর থানার অন্তর্গত এবং থানা থেকে ৫/৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।[৬৯] ত্রিমোহিনীর নিকটবর্তী এ স্থানে ছিল মোঘল ফৌজদারের আবাসবাটি।[৭০] জেমস ওয়েস্টল্যাণ্ড (James Westland) এ স্থানের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- ত্রিমোহিনী থেকে আধা মাইল দূরে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে, এই ধ্বংসাবশেষের উত্তর দিকের অঙ্গনের উত্তরভাগে তিনটি গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ইমারত আছে এবং সেটিই ছিল প্রকৃত বাসগৃহ।[৭১] মূলত ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেব এখানে ভুল করেছেন, ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারাতটি কোন আবাসগৃহ ছিলনা বরং এটি ছিল একটি মসজিদ। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদের ভিতরের আয়তন ছিল ৫০x১৪ ফুট, দেয়ালগুলো ছিল প্রায় ৪ ফুট প্রশস্ত। মাটি থেকে গম্বুজের উচ্চতা ছিল ২২ ফুট। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ ছিল। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। মসজিদের সামনে ছিল একটি চৌবাচ্চা। মসজিদ প্রাঙ্গণে কয়েকটি পাকা কবর ছিল। প্রাচীর ঘেরা দক্ষিণ দিকের অঙ্গণটিতে ছিল একটি কবরস্থান। সেখানে বেশ কয়েকটি পাকা কবর ছিল। বর্তমানে এ সবের কোন কিছুই পরিলক্ষিত হয়না।[৭২]

---

৬৯. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩২৭-২৮; *যশোর জেলার ইতিহাস,* পৃ. ২২৯-৩০।

৭০. কথিত আছে, শাহসুজা যখন বাংলার সুবাদার (১৬৩৯-৬০) তখন তার শ্যালক পুত্র সাফাসী খান ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে যশোরের (বর্তমান যশোর নয়, প্রতাপাদিত্যের যশোর) ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি আলোচ্য মীর্জানগরে বহু ইমারত নির্মাণ করেন। তার পরেও অনেক ফৌজদার এখানে বসবাস করেন এবং ইমারতাদি নির্মাণ করেন। দ্রঃ *যশোর জেলার ইতিহাস,* পৃ. ২৩০।

৭১. *প্রাগুক্ত;* Here lies the remains of an old place half a mile from Trimohini along the road which now connects that place with Keshabpur. The building is composed of two spuare courtyards separated by a high wall and on the north of the northern square and on the south of the southern on there are similar high walls. On the eastern of both the squares is a dauble row of little arched dwellings, which seem rather to be built in the inside of a massive wall than to be constracted with references to convenience of dwelling. These were apparently reainers houses and the only entrance to the courtyard is through them. cf.: Dr. S. M. Hassan, ***Ancient Monuments of East Pakistan***, p. 69; উদ্ধৃত: *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩২৮।

৭২. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* পৃ. ৩২৮; *যশোর জেলার ইতিহাস,* পৃ ২৩০।

 Dhaka University Institutional Repository

শুভরাঢ়া মসজিদ

শুভরাঢ়া মসজিদটি অভয়নগর উপজেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কয়েকমাইল ভেতরে ধুলগ্রাম নামক গ্রাম থেকে ৫মাইল উত্তরে ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত।[৭৩] বর্তমানে মসজিদটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।[৭৪] বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ২৬x ৬ ও ভিতরের দিকে ১৬x১০ লম্বা ছিল। দেয়ালের প্রশস্ততা ৫.৫ ফুট। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ আছে। পত্রাকারে খিলানের সাহায্যে প্রবেশ পথগুলো নির্মিত। এ মসজিদটিতে ভিতরের পশ্চিম দেয়ালে একটি মাত্র মিহরাব। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির কার্ণিশ বাঁকা করে তৈরি। গম্বুজটি উল্টানো পেয়ালাকারে নির্মিত; যা খান জাহান আলীর স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে।[৭৫]

মসজিদের গায়ে কোন শিলালিপি নেই। তবে মসজিদ গঠন পদ্ধতি ও শিলালিপি দেখে মনে হয় যে, এ মসজিদ খান-ই জাহানের আমলে নির্মিত।[৭৬] স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায়- হযরত উলুঘ খান জাহান আলী বারবাজার থেকে বাগেরহাট যাওয়ার পথে মুড়লি কসবা হয়ে পয়গ্রাম কসবা গিয়েছিলেন। পয়গ্রাম কসবা যাওয়ার পথে তিনি শুভরাঢ়া গ্রামে যাত্রা বিরতি করেন এবং একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করেন।[৭৭] এটিই ঐতিহাসিক শুভরাঢ়া মসজিদ হিসেবে পরিচিত।

কায়েমকোলা মসজিদ

কায়েমকোলা যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। যশোর শহর থেকে কাশীপুর সীমান্তে যে রাস্তাটি গেছে সে রাস্তা ধরে ৫ মাইল গেলেই কায়েমকোলা গ্রাম। এক সময় এ গ্রামের পাশ দিয়েই খরস্রোত মুক্তেশ্বরী নদী প্রবাহিত ছিল। যশোর-কাশীপুর ও ঝিকরগাছা-চৌগাছা রাস্তার সংযোগ স্থলের পাশেই কায়েমকোলা মসজিদটি অবস্থিত। ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির আয়তন ৩৩.৫x১৩ হাত; মসজিদের সামনের দিকে তিনটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। ভিতরের পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে একটি

---

৭৩. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩২৬।

৭৪. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৪১।

৭৫. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩২৬-২৭; *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ ২২৮।

৭৬. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৩২৬-২৭।

৭৭. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মিহরাব। মসজিদটি কে তৈরি করেছেন এবং কবে তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তবে ধারণা করা হয়। মসজিদটি সুলতানী আমলে তৈরি। মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।[৭৮]

আউলিয়া জামি' মসজিদ বা খানায়ে খোদা মসজিদ

আওলিয়া মসজিদ বা খানায়ে খোদা মসজিদের অবস্থান ঐতিহাসিক বারবাজার নগরী থেকে সামান্য দূরে। কালিগঞ্জ উপজেলার কালিগঞ্জ ইউনিয়নের সিংহদা মৌজায় যশোর-ঢাকা মহাসড়কের নিমতলা বাসস্টান্ড থেকে মাত্র ৩ কি.মি. পশ্চিমে মসজিদটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে চিত্রা নদী। মসজিদটিতে মোট ৫টি দরজা রয়েছে। মসজিদটির বহির্ভাগ ১১ মিটার এবং অভ্যন্তরভাগ ৬.৩৫ মিটার। অভ্যন্তরভাগের কিবলা দেয়ালে দুটি অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব আছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি ফুল ও লতা পাতায় নক্শাযুক্ত আয়তকার ফ্রেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[৭৯] জনসাধারণ কর্তৃক খনন কার্য চালাতে গিয়ে মসজিদটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় জনগণের কাছে মসজিদটি 'খানায়ে খোদা মসজিদ' নামে পরিচিত। খোদায়কৃত মসজিদটির উপর টিনের চাল দিয়ে স্থানীয় লোকজন নামায আদায় করেন। মসজিদটি কে কবে তৈরি করেন তার কোন প্রমাণ মেলেনা। তবে গঠন শৈলীর দিক দিয়ে মসজিদটি পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। ধারণা করা হয় মসজিদটি কোন প্রখ্যাত আউলিয়ার দ্বারা নির্মিত। আর সে জন্যই মসজিদের নাম হয়েছে আউলিয়া জামি' মসজিদ। অবশ্য অনেকেই মনে করেন- বারবাজারের অনতিদূরেই যেহেতু মসজিদটির অবস্থান সেহেতু হযরত খান জাহান আলীর কোন যোগ্য শিষ্যই হয়ত এটি নির্মাণ করেছিলেন। কারণ, উলুঘ-খান জাহান আলী ও তাঁর শিষ্যরা এই বারবাজার থেকেই ইসলাম প্রচার শুরু করেন।[৮০]

---

৭৮. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১৪১-৪২।

৭৯. জনৈক খন্দকার আলমগীর 'দৈনিক সংগ্রাম'এর এক সংখ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন- মসজিদের অভ্যন্তরে পোড়া মাটির ফুল ও লতা পাতার নক্শাযুক্ত অলংকরণ আছে। মধ্যবর্তী মিহরাবের উত্তর দিকে মিহরাবের পরিবর্তে খাড়া একটি বদ্ধ প্যানেল দেখা যায়। মসজিদের প্রার্থনা কক্ষের উপর বড় একটি অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ ছিল বলে অনুমান করা যায়। বারোবাজারের গোড়া মসজিদ ও সুলতানী আমলের অন্যান্য মসজিদের সাথে এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্ধৃত: *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* পৃ. ১৪৩।

৮০. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

মক্তবের ভূমিকা

মক্তব আরবী শব্দ (مكتب)। যার অর্থ হল- লেখন শেখার বিদ্যালয়।[৮১] মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হল এই মক্তব। এখানে সাধারণত কুর'আন শিক্ষা দেয়া হত।[৮২] মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত বলে কোন বাইরের প্রভাব ছিলনা।[৮৩] মুসলিম শাসনামলে মক্তবের শিক্ষাই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে প্রচলিত ছিল।[৮৪] তখন প্রতিটি মসজিদে মক্তবের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।[৮৫] তার জন্য সরকারি অনুদান ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।[৮৬] ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল মক্তব শিক্ষার ভিত্তি। বালক-বালিকা নির্বিশেষে

---

৮১. المكتب-الكتاب موضع, লেখার স্থান, الكتاب موضع تعليم-লেখন শেখার বিদ্যালয়, موضع التعليم-শিক্ষালয়। দ্রঃ 'আব্দুল্লাহ আলীল কবীর মুহাম্মদ আহমাদ হাবীবুল্লাহ হাশেমি মুহাম্মদ আশ শাযেলী, *লিসানুল 'আরব,* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১১১৯ হিঃ), পৃ. ৩৮১৭।

৮২. "يقال لصبيان المكتب الفرقان" অর্থাৎ শিশুদের কুর'আন শিক্ষালয়কে মক্তব বলা হয়। প্রাগুক্ত; মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্তবগুলোতে কুর'আন শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। কুর'আনের মাধ্যমে মুসলিম শিশুর শিক্ষার হাতে খড়ি হত। সতের শতকের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল তাঁর 'তোহফায়ে' ১৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- 'সর্ব শাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কুর'আন'। দ্রঃ আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম,* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪), পৃ. ২৪৪।

৮৩. মোঃ আমিরুল ইসলাম, *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা (১৭৮৬-১৯৪৭ খ্রিঃ),* (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৭), পৃ. ১১২।

৮৪. প্রাথমিক পর্যায়ে মক্তব বা পাঠশালাগুলোতে বালক বালিকাদেরকে প্রথমেই শুদ্ধ উচ্চারণ, যতি বিন্যাস ও শ্বাসাঘাত বর্ণ শিক্ষা দেয়া হত। এগুলো শেখানোর পর শব্দ গঠন শিক্ষা চলত। অতঃপর ছোট বাক্য তৈরির অনুশীলন হত। বাক্য গঠনের সাথে সাথে লিখবার অভ্যাস করানো হত। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ বর্ণমালা, যুক্তময়, একই অর্ধপদ শ্লোক বা দ্বিচরণ শ্লোক ও পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি এই চারটি অনুশীলন দিতেন। cf. Abul Fazl, *Ain-i-Akbri*, Vol-11, tr. Jarret and Sarkar (Calcutta 1948), pp. 78-79.

৮৫. মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৩), পৃ. ১০৯; তৎকালে মুসলমানদের মক্তবের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এইচ. জে. রলিনসন মন্তব্য করেছেন- 'মুঘল ভারতের উন্নততর শিক্ষা সংস্কৃতি অধিক পরিমাণে এই উত্তম শিক্ষা পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। শিক্ষা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হত। যদি সে ধনী পিতা-মাতার সন্তান হত তাহলে চার বছর বয়সে তাকে কুরআনের একটি আয়াত উৎকীর্ণ যা পাথর বসানো শ্লেট দিয়ে একজন শিক্ষকের হাতে তুলে দেয়া হত; যদি সে গরীব পিতা-মাতার সন্তান হত তাহলে তাকে মৌলবী দ্বারা পরিচালিত মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হত; প্রতিটি মসজিদের সঙ্গে একটি মক্তব ছিল। cf. H.G. Rawlinson, India, *A Short Cultural History* (London: 1937), p. 372.

৮৬. *ফরিদপুরে ইসলাম,* পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক মুসলমান শিশু সন্তানকে [৮৭] ধর্মের মূলনীতিসমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হত। কবি বিপ্রদাস বলেন যে, মুসলমান ছেলে-মেয়েদেরকে মক্তবে উযু করা ও নামায পড়া শেখান হত।[৮৮] মুকুন্দরাম এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, মুসলমান চেলেমেয়েরা মক্তবে মৌলবীর (মখদুম) কাছে শিক্ষা লাভ করত।[৮৯] মক্তবের শিক্ষক মৌলবী হওয়ায় (ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত) ইসলামী শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায়েও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হত। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ান হত।[৯০] রবিন সনের মন্তব্য এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- "এখানে (মক্তবে) সে (শিশু) কালিমা বা ধর্ম বিশ্বাস ও কুর'আন থেকে কিছু আয়াত মুখস্থ করত; যা তার দৈনন্দিন প্রার্থনায় (নামাযে) প্রয়োজন হত। কুরআন মুখস্থ করার একটি সাধারণ রীতি ও প্রচলিত ছিল;[৯১] এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস, ফারসী ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। সুচারু লিখন পদ্ধতির চর্চা করা হত এবং বালক যদি শিল্পকলার শিক্ষা লাভে আগ্রহী হত তাহলে তাকে একজন উস্তাদ বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষানবিশীর জন্যে প্রেরণ করা হত।[৯২]

---

৮৭. পাঁচ বছর বয়সে মুসলমান বালক-বালিকাদের শিক্ষা জীবন শুরু হত। দ্রঃ দোনাগাজী, ***সয়ফুলমূলক- বদিউজ্জামান,*** আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকাঃ ১৯৭৫), পৃ. ৬৪। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের বালকের সাধারণতঃ পাঁচ কিংবা ছয় বছর বয়ঃক্রমকালে শিক্ষা জীবন শুরু হত। M. A. Rahim, ***Social and cultural History of Bengal***, Vol-11, (Karachi: 1967), p. 308.

৮৮. বিপ্রদাস, ***মনসামঙ্গল,*** পৃ. ৬৭; চরণগুলো এরূপঃ "শিখা এ নামাজ ওজু সদাই মক্তবে বুজু", উদ্ধৃতঃ ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, ***বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,*** ১ম খণ্ড, (১২০৩-১৫৭৬ খ্রীঃ), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ ১৭১ ও ১৯১।

৮৯. মুকুন্দরাম, ***চণ্ডিমঙ্গল কাব্য,*** পৃ. ৩৪৪; চরণগুলো এরূপঃ "যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান, মখদ (মখদুম) পড়া এ পঠন। উদ্ধৃতঃ ***বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,*** ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

৯০. মক্তবগুলোতে 'মিযান', 'মুনসাইব', 'মাসাদির' ও 'মিফতাহুল লুগাত' পড়ানো হত। cf. M. L. Bhagi, ***Mediaval Indian culture and thought***, Amballa cantt, 1965, p. 360.

৯১. মক্তব পর্যায়ের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কুর'আন মুখস্থ করানো হত। এগুলো হিফ্‌যখানা নামে পরিচিত ছিল। এখানে বালকেরার কুর'আন শরীফ মুখস্থ করত। cf. M. L. Bhagi, ***op. cit.***, p. 358.

৯২. H. G. Rawlinson, India, ***op. cit.***, p. 372.

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঐতিহ্যবাহী এই মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। কেননা যে লাখেরাজ সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে এই মক্তব-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু তথা ইসলাম বিদ্বেষী জমিদারদের অধীনে চলে যায়।[৯৩] ফলে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ধর্মজ্ঞান থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় যশোরের মুসলমানরাও সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারপরও যশোর জেলার বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তি ও সামষ্টিক উদ্যোগে বহু মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সে সকল মক্তবের মাধ্যমে মুসলমানরা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত। বলা আবশ্যক, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মক্তবে একটি সংশোধিত পাঠ্যক্রম চালু হয়।[৯৪] যশোর জেলায়ও মক্তবে ভার্ণাকুলার স্কীমে শিক্ষা দেওয়া হত।[৯৫] এ সময় যশোর কতগুলো মক্তব ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়না। তবে ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে জেলা বোর্ড ২০৮ টি মক্তব পরিচালনা করত।[৯৬]

---

[৯৩]. *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১১০।

[৯৪]. Government of Bengal, ***Seventh Quinquicnnal Review of the progress of Education in Bengal*** (Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot. 1928), p. 75.

[৯৫]. ***List of Schools of presidency Division*** (Calcutta: Bengal Secretariate press, 1922), pp. 40-46.

[৯৬]. Mohammed Mohibullah Siddiquee, ***Socio-Economic Development of A Bengal District: A Study of Jessore, 1883-1925*** (Rajshahi: I.B.S. University of Rajshahi, 1997), p. 176.

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা সমূহের ভূমিকা

মাদ্রাসা শব্দটি 'আরবী দরস (درس) শব্দ থেকে উদগত। এর শাব্দিক অর্থ পাঠ বা শিক্ষা।[৯৭] আর যেখানে এই পাঠ বা শিক্ষা প্রদান করা হয় সে স্থানকেই মাদ্রাসা (مدرسة) বলে।[৯৮] ইসলামী দা'ওয়াহ প্রচারের স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ, মক্তব, খানকাহ্র পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষালয়ের পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার ভূমিকা অপরিসীম। মহানবী (সঃ) 'ইলম বা বিদ্যা শিক্ষাকে প্রত্যেকের জন্য ফরয হিসেবে নির্দেশ[৯৯] করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি মসজিদে নববীতে নিজে শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। রাসূল (সঃ) নবুওয়তের প্রথম দিকে মক্কা নগরীতে "দারুল আরকাম" (دار الأرقام) নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন।[১০০] এই স্থানে তিনি তাঁর নব দীক্ষিত সাহাবীদের গোপনে নামায ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় হিজরীতে (৬২৩ খ্রী:) হযরত মাকরামা ইবনে নওফেল (রাঃ) নামক আনসারের গৃহে "দারুল কুররাহ" (دار القرّاء) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিষ্ঠানটি ছিল আবাসিক ধরনের।[১০১] উল্লেখিত উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় 'ইসলামী দা'ওয়াহ'র প্রচার-প্রসারে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব। আর এ গুরুত্ব অনুধাবন করেই এদেশে আগত সূফী-দরবেশ আউলিয়াগণ ও মুসলিম শাসকবৃন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মাদ্রাসা'।

সর্বপ্রথম আরবীয়দের দ্বারাই মূলত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। এই আরবীয়দের মধ্যে তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাব জয়

---

৯৭. *লিসানুল 'আরাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬০।

৯৮. الموضع الذى يدرس فيه এবং الموضع الذى يدرس فيه القرآن। অর্থাৎ কুরআন শিক্ষার স্থানকে মাদ্রাসা বলে। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

৯৯. এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন- "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ" দ্রঃ ইবনু মাজাহ, *সুনান* (করাচীঃ নূর মোহাম্মদ লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ২০।

১০০. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৮৭), পৃ. ১২।

১০১. *প্রাগুক্ত*।

করেন।[১০২] বলা আবশ্যক, মুসলমানরা যেখানেই গেছেন সেখানেই স্থাপন করেছেন মসজিদ এবং অচিরে প্রতি মসজিদে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ইসলাম ও শিক্ষা ছিল প্রায় অবিচ্ছেদ্য। মুসলমানদের ন্যায়বিচার, সততা, সাম্য, দয়া ও সহানুভূতি দেখে অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করত। তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা মসজিদেই করা হত। ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হত অথবা তার সঙ্গেই মাদ্রাসা ভবন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য আবাসিক গৃহ নির্মাণ করা হত।[১০৩] উল্লেখ্য, ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই ভারতে প্রাতিষ্ঠানিকবাবে দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কবে কোথায় শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়না। তারিখ-ই ফিরিশতার বর্ণনামতে উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল মুলতানে। নাসিরুদ্দীন কুবাচা সম্ভবত কুতুবুদ্দীন কাশানীর (জন্ম ৫৭৮ হিঃ) জন্য মাদ্রাসা ভবনটি নির্মাণ করেন। আর বঙ্গদেশে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইসলামের আগমন ও ইসলামী শিক্ষার তা'লীম শুরু হলেও ১২০৩/১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের পর এদেশে ব্যাপকভাবে মাদ্রাসা স্থাপন শুরু হয়। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে এবং খ্রিস্টীয় নবম শতকেই বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।[১০৪]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বঙ্গদেশ জয় করে রাজধানী নদীয়া পর্যন্ত দখল করেন। তিনি রংপুরে নয়া রাজধানী স্থাপন করে সেখানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৫] বখতিয়ার খলজী শুধু একজন সৈনিক ছিলেননা, তিনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন। তাঁর নদীয়া বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অধিবাসীরা ছিল প্রায় সকলেই অমুসলিম, তাদের তুলনায় বিজয়ী মুসলমানেরা ছিল সংখ্যায় অতি অল্প। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে

---

১০২. Md. Mohar Ali, ***History of the Muslims of Bengal***, p. 61; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

১০৩. *মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ*, পৃ. ১৮।

১০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

১০৫. ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬ ও ১৬২; *মিনহাজ-ই সিরাজ ঃ তবাকাত-ই নাসির*, লাহোর সংস্করণ, পৃ. ৬৪, উদ্ধৃতঃ আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী- ১৯৯৪), পৃ. ২২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে মুসলমান শাসন স্থায়ী হওয়া অসম্ভব না হলেও দুরূহ হবে। সেকারণে তিনি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি মনযোগ দেন। মুসলমানদের নামায আদায়ের জন্য চাই মসজিদ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য চাই মাদ্‌রাসা এবং 'উলামা সূফীদের জন্য চাই খানকাহ্। সুতরাং তিনি মসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ্ নির্মাণ করেন।[১০৬] বখতিয়ার খলজীর অনুসরণ করে পরবর্তীতে অন্যান্য খলজী মালিকেরা রাজধানী শহর সহ প্রধান প্রধান স্থান সমূহে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[১০৭] ফলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০৮] গিয়াস উদ্দীন ইয়ুজ খলজী (১২১২-২৭ খ্রিঃ) লখনৌতে একটি মসজিদ ও মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন।[১০৯] সুলতান রুকন আল-দীন কাইকাস (১৩০১-৩২খ্রিঃ)[১১০] এবং শামস আল-দীন ফিরোজ শাহের[১১১] সময়ে ত্রিবেণীতে দুটি মাদ্‌রাসা নির্মিত হয়। নাসির আল-দীন মাহমুদ শাহের [১১২] সিমলাবাদের খিতাত মাদ্‌রাসা, শামস আল-দীন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) সময়ে ফিরোজপুর দরসবাড়ী

১০৬. *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ২২৩-২৪।

১০৭. A.K.M. Yaqub Ali, "Education for Muslim Under the Bengal Sultanate" ***Islamic Studies***, Vol- xxiv, No.4, Islamic Research Institutes, Pakistan, 1985, p. 423 F.n.; মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সহিত্য* (ঢাকাঃ পাবলিকেশন, ২য় সং, ১৯৫৭), পৃ. ২০।

১০৮. Abdul Karim, ***Social History of the Muslim in Bengal*** (Chittagong: Baitush Sharif Islamic Research Institute, 2nd Revised edition 1985, p.76.

১০৯. N. N. Law, ***Promotion of learning in India, During Mohammaden Rule*** (London: Longmans, Green and co, 1916), p. 106.

১১০. C. Yazdani, "Inscriptions of the Khalji Sultans of Delhi and their contemporaries in Bengal" ***Epigraphia Indo-Moslemica***, 1917-18, p. 13; plate-11.

১১১. ***Ibid***, pp. 33-34; plate xii (a); ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, 1870, pp. 287-88; উক্ত মাদ্‌রাসা দুটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শিলালিপিতে জাফর খানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রঃ *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ২২৫।

১১২. মোঃ আমিরল ইসলাম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা।[১১৩] আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) সময়ে গৌড়ের বেলবাড়ী মাদ্‌রাসা,[১১৪] বাঘার কসবা মাদ্‌রাসা,[১১৫] মাহি সন্তোষ মাদ্‌রাসা[১১৬] এবং শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামার সোনারগাঁও মাদ্‌রাসা[১১৭] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার সুলতানগণ ও তাঁদের প্রতিনিধিরা বহন করতেন।[১১৮] মাদ্‌রাসায় ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ উভয় বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। ফারসী অফিস আদালতের ভাষা হওয়ায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসী।[১১৯] মাদ্‌রাসা সমূহের শিক্ষা[১২০] বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক বুদ্ধি বৃত্তিক এবং ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করত।

---

১১৩. Abid Ali, ***Memories of Gaur and Pandua*** (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, n.d.), p. 77; A . H. Dani, ***Muslim Architecture in Bengal*** (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 108.

১১৪. ***Memories of Gaur and Pandua***, p. 157.

১১৫. J. N. Sarkar, "A Description of North Bengal in 1909, ***Bengal past present***, Vol- xxxv, Calcutta, 1928, p. 144; *প্রবাসী, কলিকাতা,* ১৩২৬ বাংলা সংখ্যা-১, পৃ. ৫৫৩।

১১৬. Shah Suayb, Managib al- Asfiya, "extract printed at the end of "Maktubat-i-sadi", Bihar A.H. 1286, p. 339.

১১৭. ***Ibid***; Calcutta Review, 1929, No-1-3, p. 196; ***Social History of the Muslim in Bengal***, 2nd edition, pp. 96-100.

১১৮. ***Bengal past present***, Vol- xxxv, 1929, p. 144; ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, 1904, part-1, p. 110.

১১৯. M. R. Tarafdar, ***Hussain Shahi Bengal*** (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1965), p.11.

১২০. মাদ্‌রাসা শিক্ষায়ন সমূহে প্রধানত কুর'আনের তাফসীর, হাদীসের তাশরীহ, ফিক্‌হ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। এসব ব্যতীত লোকায়ত শিক্ষা যুক্তিবিদ্যা গণিত, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি, ইতিহাস, জ্যোতিষবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, ক্যালিগ্রাফি সহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে এর সত্যতা জানা যায়। তিনি বলেন প্রত্যেক ছাত্রের নীতি বিজ্ঞান, গণিত, কৃষি, পরিমাপ্‌ বিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতিষ বিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর গণিত, শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ব করতে হবে। cf.: Abul Fazl Allami, ***Ain-i-Akbari***, Vol-1, Tr. H. Blochman (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1873), p. 279.

Dhaka University Institutional Repository

যশোর অঞ্চলে কখন কোথায় মাদ্‌রাসা গড়ে ওঠে তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয়, বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পরই সম্ভবত অত্র অঞ্চলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্‌রাসা-মক্তব গড়ে উঠেছিল। কেননা যশোরের অবস্থান নদীয়ার নিকটে হওয়ায় সে বিজয়ের প্রভাব যশোরে পড়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এছাড়া ঠিক এ সময়ে সূফী হযরত শাহাদত আলী গাযী যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি বারবাজরকে কেন্দ্র করে মসজিদ-মাদ্‌রাসা গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা যায়।[১২১] এরপর খান-ই-জাহান আলী (রহঃ) বারবাজার সহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং অসংখ্য মসজিদ-মাদ্‌রাসা ও মক্তব স্থাপন করেন।[১২২] খান জাহান আলী (রহঃ) নির্মিত মসজিদগুলো এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদগুলোর সাথে যে মক্তব পরিচালিত হত তার প্রমাণ বারবাজারের জোড় বাংলা মসজিদ। আসলে এর একটি মসজিদ অপরটি মক্তব।[১২৩] এমনিভাবেই মূলত বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত দা'ঈ ইলাল্লাহ ও স্থানীয় ইসলাম প্রচারকগণ যশোর অঞ্চলে দীনী শিক্ষা প্রসারের ধারা (মাদ্‌রাসা-মক্তব স্থাপন) অব্যাহত রাখেন।

সুলতানী ও মোঘল আমলে যশোর অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম চলত মাদ্‌রাসা[১২৪] ও টোলে। সরকারি চাকুরীর সুবিধার্থে মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।[১২৫] ফলে হিন্দুরা টোল ছাড়াও মাদ্‌রাসায় নিরপেক্ষভাবে শিক্ষা লাভ করত।[১২৬] কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনভার

---

১২১. *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৭৯।

১২২. মুহাম্মদ আবূ তালিব, *খুলনা জেলায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৮), পৃ. ৩৪।

১২৩. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৮৩।

১২৪. সুলতানী বাংলায় আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল। সে অনুসারে 'আলিম হতে হলে একজন ব্যক্তিকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূল-উল-ফিক্‌হ, তাসাউফ, আদব, নাহু, কালাম ও মানতিক বিষয় পারদর্শিতা অর্জন করতে হত। cf.: K. A. Nizami, ***some Aspects of Religion and politics in India During the therteenth century***, (Aligarh: 1961), p. 151.

১২৫. সে যুগের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, মাদ্‌রাসার ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় জ্ঞান ও লোকবিজ্ঞান উভয় বিষয়ের পর্যালোচনা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি পদার্থ বিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে সমান দক্ষ ছিলেন। ছাত্ররা সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত শিক্ষা কেন্দ্রে উভয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন। cf.: M. A. Rahim, ***op. cit***, Vol-11, pp. 296-98.

১২৬. মোঃ আমিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণের পর মুসলমানদের উপর নেমে আসে চরম দুর্দশা। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মক্তব ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তথা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এ সময় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে এদেশের রক্ষণশীল মুসলমানরা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষার জন্য উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পাঠাতনা। তারা বাংলার সুলতানী এবং মোঘল আমলের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষিত করার জন্য বেশি আগ্রহী ছিলেন। এ ধরনের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, কালাম, 'আরবী সাহিত্য, 'আরবী ব্যকরণ এবং ফারসী।[১২৭] এ পদ্ধতি অনুসারে কলকাতায় মুসলমানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস এর সহযোগিতায় দারাস-ই-নিজামী[১২৮] মাদ্‌রাসার সিলেবাস অনুযায়ী কলিকাতা[১২৯] মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩০] পরে এই মাদ্‌রাসার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা হয় এবং মাদ্‌রাসাটি পরবর্তীতে সরকারি 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় উন্নীত হয়। এ

---

১২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-৩৪।

১২৮. It is erroneous to think that Dars-i-Nizami is such educational system which was pursued in the Nizamiyya Madrasa of Bagdad Founded by Nizamul Mulk Turi, the prime Minister of the seljug sultan Malik Shah, But is was Molla Nizam ud-Din Sahluwli, son fo Molla Qutb Ud-Din, an inhabitant of Sahali in lakhnaw, who introduced a simplified, but useful course of Arabic learning which is known even today as the Dars-i-Nizami after his name in this subcontinent. cf.: A. K. M. Yaqub Ali, The Educational System in British Bengal, ***Research Journal***, Arts Faculty, Vol-1, Rajshahi University, 1995, p. 217.

১২৯. Mohammad Mohibullah Siddiquee, ***op. cit.***, p. 154; ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৫), পৃ. ১২০; আবদুস সাত্তার অনূদিত, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, মূল: মোস্তফা হারুন (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০), পৃ. ৪৩০।

১৩০. The Calcutta Madrasa was started as a Free institution and its expenditures used to be met out of income of the Madrasa Mahal, The original Madrasa building stood on the southern side of Bow Bazar street, exactly on the spot where now stnads a church. In consequence of the Unhealty atmosphere of the locality; the Government resolved in 1823 to shift the Madrasa to a more suitable locality known as colinga, now wellesly square Oceupied chiefly by Muslmim. The Foundation stone was Lain on the 15th July 1824 in presences of Rt. Hon. Willium pit Amherst Governor General of the British India and many other high dignitories. A sum of Rs. 140537 was sanctioned for the purchese of the land and construction of building. The madrasa was shifted to the new

 Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা এদেশে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরপর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে হুগলী মাদ্রাসা এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩১] এ সময় যশোর অঞ্চলে কলকাতা মাদ্রাসার অনুরূপ কোন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার খবর জানা যায়না। তবে বিংশ শতকের বিশের দশক থেকে অনুরূপ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।[১৩২] যশোরের ইসলাম প্রচারের নকীব সমাজ সংস্কারক মুন্সী মেহেরউল্লা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯০১ সালে যশোরের নিকটবর্তী মনোহরপুর গ্রামে "মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়া" নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩৩] প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, এটিই যশোরের প্রথম স্বীকৃত মাদ্রাসা।[১৩৪]

বলা আবশ্যক, বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সনাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি আরও এক ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়; সেটি হল নিউস্কীম মাদ্রাসা পদ্ধতি। সনাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা-শিক্ষিত ছেলেরা সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতনা।[১৩৫] এজন্য সনাতন পদ্ধতি সংস্কার করে আধুনিকায়ন করত নিউস্কীম পদ্ধতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে মাদ্রাসা ছাত্রদের চাকুরীর ক্ষেত্রে সুযোগ দানের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উক্ত পদ্ধতি চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে সম্মেলনের সিদ্ধান্তানুযায়ী উচ্চ শিক্ষাবিদ ও সমাজ হিতৈষী শামসুল উলামা আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ[১৩৬] "নিউস্কীম" নামে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন মূলক একটি রিপোর্ট

---

building in August 1827. cf.: H. Sharp, ***Selections from Educational Records***, Part-I (Calcutta: 1920), Appendix A.

১৩১. *মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ*, পৃ. ৪৫।

১৩২. মোঃ আমিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪।

১৩৩. মুহাম্মদ আবূ তালিব, *মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ* (ঢাকাঃ ১৯৮৩), পৃ. ৭৫।

১৩৪. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৮৩; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২০২-২০৩।

১৩৫. *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা*, পৃ. ১৩৪।

১৩৬. শামসুল 'উলামা আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর সিলেট শহরস্থ হাওয়াপাড়া মহল্লায় এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ পরিবারেই তিনি ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রাস (ম্যাট্রিক) পাশ করেন এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে আরবী অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন এবং একই বছর এম. এ. পাশ করেন। সিলেট সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের নিকট পেশ করেন।[১৩৭] মূলত তাঁর অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতেই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে "রিফর্মড মাদ্‌রাসা স্কীম" যা ছিল উপমহাদেশীয় মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে প্রাথমিক স্তর থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর ব্যাপী স্বয়ং সম্পূর্ণ আধুনিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা।[১৩৮] এ রিপোর্টের আলোকে সরকার ১৯১৫ সাল থেকে ইংরেজি শিক্ষাকে সমন্বয় করে নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করেন।[১৩৯] নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করে। এই নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান যুবকদের সরকারি চাকুরী পাবার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়। যশোর জেলার অধিবাসীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য এ ধরনের মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পশ্চাদপদ ছিলেননা। সমকালে যশোরেও একটি নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা (বৈচিতলা নিউস্কীম মাদ্‌রাসা) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৪০] বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে যশোর অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ সময়ে সনাতন পদ্ধতি ও নিউস্কীম মাদ্‌রাসা পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতির একাধিক মাদ্‌রাসা যশোর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সকল মাদ্‌রাসা সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ উপস্থাপন করা হলঃ

মাদ্‌রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে যোগ দেন। তিনি রিফর্মড মাদ্‌রাসা স্কীম ফর্মূলা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। দ্রঃ ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম, *'আরবী সাহিত্যে ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আবূ নসর ওহীদের অবদান'* (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৯৭), পৃ. ১২-২১।

[১৩৭]. *মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ,* পৃ. ২০।

[১৩৮]. এ.কে.এম. নূরুল আলম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৩৬।

[১৩৯]. *যশোর জেলায় শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা,* পৃ. ১৩৫; এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- Introduced in Bengal in 1915 the new scheme madrasha may be regarded as merely modified English Schools. cf. ***Seventh Quinquiennial Reviw of the progress of Education in Bengal***, p. 74.

[১৪০]. *যশোর জেলায় শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা,* পৃ. ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা-ই-কারামতিয়া

যশোরের ইসলাম প্রচারের নকীব মুন্‌সী মেহেরউল্লা তাঁর নিজ গ্রাম মনোহরপুরে ১৯০১ সালে স্ব-উদ্যোগে মাদ্‌রাসা-ই-কারামতিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪১] জৈনপুরের মাওলানা কারামত আলীর নামানুসারে এ প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার নামকরণ করা হয় 'মাদ্‌রাসা-ই-কারামতিয়া', মুন্‌সী মেহেরউল্লা ছিলেন এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী।[১৪২] মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেহেরউল্লাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। এর জন্য তিনি নিজের থেকেও বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ২০শে আশ্বিন মাদ্‌রাসার একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য একটি সভা যশোরের উকিল মৌলভী তোফেলউদ্দীন খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত। সভায় যশোরের খড়কীর সূফী-কামিল পুরুষ মৌলভী 'আব্দুল করিম উপস্থিত ছিলেন।[১৪৩] মাদ্‌রাসার অন্যতম উদ্যোগী জাঁহা বখশ মাদ্‌রাসার গৃহ নির্মাণের জন্য দেড় বিঘা জমি দান করেন।[১৪৪] মাদ্‌রাসার দু'জন উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খুলনা জেলার ধামালিয়ার ভিখু সরদার ও তাঁর পুত্র আহাদ আলী সরদারের নাম জানা যায়। আহাদ আলী সরদার ছিলেন মাদ্‌রাসার সর্বোচ্চ চাঁদা দাতাদের অন্যতম। তিনি ত্রিশ টাকা মূল্যের একটি দুর্লভ কিতাব মাদ্‌রাসা লাইব্রেরিতে দান করেন।[১৪৫]

মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র চেষ্টায় মাদ্‌রাসার একটি সাধারণ গৃহ নির্মিত হয়। এতে একটি পাকা দেয়াল তৈরি ও অন্যান্য আসবাব ক্রয়ের জন্য মেহেরউল্লা সকলের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন।[১৪৬] মাদ্‌রাসার অধিকাংশ ব্যয়ভার মুন্‌সী তাঁর নিজের তহবিল থেকে নির্বাহ করতেন। মাদ্‌রাসার ছাত্র সংগ্রহেও মুন্‌সী মেহেরউল্লা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি নিজের বাড়িতেও একাধিক ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করেন। মুন্‌সী মেহেরউল্লা অনুধাবন করেছিলেন, বিদ্যা

---

১৪১. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ, পৃ. ৭৫।

১৪২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২০৪।

১৪৩. উদ্ধৃত: *মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনাঃ নাসির হেলাল (ঢাকাঃ ১৯৯৯), পৃ. ১৪।

১৪৪. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, "শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মণীষী মেহেরুল্লাহ, *প্রেক্ষণ*, মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, ঢাকাঃ ১৯৯৬, পৃ. ১৭৭।

১৪৫. *মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ, কাল, সমাজ*, পৃ. ৭৫।

১৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও ধর্মালোচনা ছাড়া মুসলমানদের উন্নতি হবেনা; [১৪৭] এছাড়া ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের যে অনিহা তা দূর করে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য তিনি মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়ার সঙ্গে পরে মধ্য ইংরেজি স্কুল সংযুক্ত করেন।[১৪৮] বলা বাহুল্য, মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মনোহরপুর গ্রামে, এতে এ গ্রামটি যেমন ইসলামী শিক্ষার আলোতে উদ্ভাসিত হয়, তেমনি পার্শ্ববর্তী বাদিয়াটোলা, ঝাউদিয়া, চান্দুটিয়া, আলমনগর, মঠবাড়ী, ফরিদপুর, বাসবাড়ীয়া, মাদখোপা, খয়েরতলা, নূরপুর, খিতিবদিয়া, ছাতিয়ানতলা, বাগডাঙ্গা, চূড়ামনকাঠি, নলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।[১৪৯] এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার প্রসারে মাদ্রাসাটির অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

ঝিকরগাছা রঘুনাথপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা

মরহুম শাহ সূফী পয়মল শাহ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ঝিকরগাছা থানার রঘুনাথপুর গ্রামে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫০] মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকালে রঘুনাথপুর গ্রামের ফেরাজতুল্যাহ মোড়ল ৫ বিঘা জমি দান করেন।[১৫১] মাদ্রাসাটি তৎকালে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও এ অঞ্চলে দীনী প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[১৫২]

বৈচিতলা নিউস্কীম মাদ্রাসা

যশোর জেলা শহর হতে ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মহেশপুর থানার বৈচিতলা গ্রামে মাদ্রাসাটি অবস্থিত। মাদ্রাসার পূর্বপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কপোতাক্ষ নদ। এ মাদ্রাসার পাশে প্রথমে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়, কালিগঞ্জ থানার মুন্সী মোঃ আব্দুল কাদের ছিলেন এর প্রধান। পরবর্তীতে বৈচিতলা গ্রামের ফজলুর রহমান, হারেস উদ্দীন, মোঃ মতিউল্লাহ সহ স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রচেষ্টায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে

---

[১৪৭]. মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ* (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৩), পৃ. ৯।

[১৪৮]. শেখ হবিবর রহমান, *কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ* (কলিকাতাঃ ১৫ কলেজ স্কোয়ার, ১৯৩৪), পৃ. ৮৮।

[১৪৯]. *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ*, পৃ. ৭৫।

[১৫০]. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৮৪; *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২০১।

[১৫১]. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, পৃ. ১৮৪।

[১৫২]. মাদ্রাসাটি ১৯৬২ সালে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৯৬৫ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

মক্তবের স্থলে নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫৩] প্রথমে মাদ্রাসাটি বিভাগীয় অনুমোদন লাভ করে এবং পরে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করে। মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় জনগণ ৬০ বিঘা জমি দান করে। ৫০ বিঘা জমিতে ধানের চাষ হত এবং বাকী জমি ছিল পতিত। এই মাদ্রাসায় হিন্দু ছেলেরাও পড়ালেখা করত। জনাব মুজিবুর রহমান মাদ্রাসার প্রধান ছিলেন। জেলার অত্রাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও বিকাশের ক্ষেত্রে মাদ্রাসাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৫৪]

মাগুরা হাই মাদ্রাসা

মাগুরা হাই মাদ্রাসাটি মাগুরা শহরের কেন্দ্রস্থলে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাগুরার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় মুসলিম জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদ্রাসাটি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা বোর্ড থেকে 'মাগুরা হাই মাদ্রাসা' হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।[১৫৫] অত্র অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসাটির অবদান অপরিসীম।

ঝিকরগাছা বদরুদ্দীন জুনিয়র মাদ্রাসা

ঝিকরগাছার মরহুম হাজী বদরুদ্দীন অত্র এলাকার মানুষকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে এটি হাই মাদ্রাসায় উন্নীত হয় এবং আরও পরে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এটি বদরুদ্দীন মুসলিম হাইস্কুলে রূপান্তরি হয়।[১৫৬]

বেরইল দারুল হুদা জুনিয়র মাদ্রাসা

১৯৩৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর মাগুরা মহকুমার কোতয়ালী থানার বেরইল নামক স্থানে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫৭] কোতয়ালী থানার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, তৎকালীন আইন পরিষদের

---

১৫৩. *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা* (১৭৮৬-১৯৪৭ খ্রিঃ), পৃ. ২০৫।

১৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৬।

১৫৫. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৮৪; ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয় এবং 'মাগুরা একাডেমী' নাম ধারণ করে। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

১৫৬. *প্রাগুক্ত*।

১৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য মরহুম মৌলভী আব্দুল আওয়াল এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি ১/১/১৯৩৮ ইং সনে জুনিয়র মাদ্রাসা হিসেবে ১/১/১৯৪৭ইং সালে আলিম হিসেবে ডি.পি.আই. প্রেসিডেন্সি বিভাগ কলকাতা কর্তৃক মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়।[১৫৮] অত্র অঞ্চলে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লাউড়ি রামনগর দারুল 'উলূম মাদ্রাসা

যশোর জেলা শহরের দক্ষিণে মনিরামপুর থানার অন্তর্গত যশোর-সাতক্ষীরা সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে লাউড়ী গ্রামে এই মাদ্রাসা অবস্থিত। উক্ত গ্রামের কৃতি সন্তান মৌলবী নূর মোহাম্মদ তাঁর নিকটতম বন্ধু স্কুল পরিদর্শক আলহাজ্জ্ব আফছার সাহেবের সহযোগিতায় সামান্য একখণ্ড জমির উপর এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোপূর্বে লাউড়ী এবং রামনগর গ্রামে দুটি এল.পি. স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নূর মোহাম্মদ স্থানীয় মুসলিম বিদ্যানুরাগীগের সহায়তায় এল.পি. স্কুল দুটিকে একত্রিত করে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঐ মক্তবকে দারুল 'উলূম জুনিয়ার মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এ মাদ্রাসা 'আলিম মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। এ মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষ ১৮ বিঘা আবাদি জমি দান করেন।[১৫৯]

এ মাদ্রাসার 'আলিম ও ফাজিল শ্রেণীর সিলেবাস ছিল এরূপ; আবশ্যিক বিষয়: তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ফারাইজ, মানতিক, বালাগ'ত, হিন্দাছা (আরবী সাহিত্য, পদ্য অথবা গদ্য) তারিখ, উর্দূ। ঐচ্ছিক বিষয়ঃ ফারসী, বাংলা, ইংরেজি। এ সকল বিষয় ছাড়াও আকাঈদ অথবা 'ইলম-আল-কালাম ফাজিল শ্রেণীর জন্য আবশ্যিক ছিল। জুনিয়র সেকশন পর্যন্ত 'আরবী ব্যকরণ, উর্দূ, ফারসী, ফিক্হ, বাংলা এবং ইংরেজি শিখতে হত।[১৬০]

মাদ্রাসায় ছাত্রদের বেতন ছিল নামমাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরীব ছাত্ররা মাদ্রাসায় বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেত। এ মাদ্রাসাটি পশ্চাদপদ এলাকার মানুষের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।[১৬১] মাদ্রাসাটি যশোরের একটি অন্যতম প্রধান মাদ্রাসা।[১৬২]

---

১৫৮. *প্রাগুক্ত; খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২০৩।

১৫৯. *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা*, পৃ. ১৯৯।

১৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২।

১৬১. *প্রাগুক্ত*।

১৬২. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৮৫; *খাজা আব্দুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২০৩। মাদ্রাসাটি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'আলিম ও ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ফাজিল এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে কামিল হিসেবে মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। দ্রঃ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসার রেকর্ডরুম থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুপারিন্টেন্ডেন্টের নামের তালিকা ও শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ডাটা তুলে ধরা হলঃ

সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাম	সময়কাল		
১. জনাব হযরত মাওলানা মোঃ ফজলুল হক	৮/৪/১৯৩৮	হতে	১/১/১৯৪০ ইং।
২. জনাব হযরত মাওলানা মোঃ আমির আলী	২/১/১৯৪০	হতে	৩১/১২/১৯৪২ইং।
৩. জনাব আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা আহম্মদ আলী	১/১/১৯৪৩	হতে	৩১/৮/১৯৪৬ ইং।
৪. জনাব শায়খুল শালায়েম আলহাজ্জ্ব মাওলানা তজমুল আলী জালালাবাদী	১/১/১৯৪৬	হতে	৩১/১/১৯৮৬ ইং।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসার শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৩ জন এবং ১৯৪৩ সালে এ সংখ্যা ৮ জনে এবং ১৯৪৭ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ জনে। ১৯৪৩ সালে মাদ্‌রাসার বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩২জন এবং ১৯৪৭ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৩১৬জনে।[১৬৩] এ মাদ্‌রাসা থেকে অনেক 'আলিমে দীন শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য করেছেন এবং পরবর্তীতে স্ব-স্ব অঞ্চলে ইসলামের দা'ওয়াতী কাজে তারা আত্মনিয়োগ করেছেন। অত্র অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে মাদ্‌রাসাটির অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে।

কোটচাঁদপুর 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

কোটচাঁদপুর 'আলিয়া মাদ্‌রাসাটি ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমান জেলা) পশ্চিমে কোটচাঁদপুর থানা শহরে অবস্থিত। প্রাচীনকাল থেকে এলাকাটি হিন্দু ভাবাপন্ন ছিল। সেকারণে এখানে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা হতনা। ফলে স্থানীয় কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এখানে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১.৫ একর জমির উপর জুনিয়র (সনাতন পদ্ধতির) মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬৪] এই মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ[১৬৫] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য তাঁরা ১৬ বিঘা জমি দান করে। এই জমির মধ্যে ১০ বিঘা

---

[১৬৩]. মাদ্‌রাসার রেকর্ডরুম থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[১৬৪]. *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা*, পৃ. ২০৩।

[১৬৫]. তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ১. আলহাজ্জ্ব আহম্মদ আলী ২. মোঃ মতিউল্লাহ বিশ্বাস ৩. আলহাজ্জ ফকির মুহম্মদ মালিতা ৪. শামছুদ্দীন বিশ্বাস ৫. মোঃ নিয়ামত আলী বিশ্বাস ৬. খলিলুর রহমান সরদার প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

ধানি এবং বাকী জমিতে ফলের বাগান ও একটি ছোট খেলার মাঠ ছিল। পর্যায়ক্রমে এটি সিনিয়র মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মাওলানা শামছুল হক।[১৬৬]

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। তারপরও রেকর্ডরুম থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা তুলে ধরা হলঃ

১৯৪২ সালে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২ জন, ১৯৪৭ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ জনে। ১৯৪৪ সালে মাদ্রাসায় (৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০২ জন, ১৯৪৭ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৫ তে।

উল্লেখ্য, তৎকালীন ঘুনেধরা অজ্ঞ সমাজে মাদ্রাসাটি অত্র অঞ্চলে ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

গোপালপুর জুনিয়র মাদ্রাসা

মনিরামপুর থানার পূর্বে গোপালপুর গ্রামের মরহুম পরশ উল্লাহ গাজী ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসাটি সরকারি মুঞ্জুরী লাভ করে।[১৬৭] বলা বাহুল্য, তৎকালে মাদ্রাসাটি অত্র অঞ্চলে ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দীনী শিক্ষা বিস্তারে তথা দীন প্রচার-প্রসারে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

---

[১৬৬]. *প্রাগুক্ত*।

[১৬৭]. *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

খানকাহ্'র অবদান

খানকাহ্[১৬৮] (خانقاه) মূলত ফারসী শব্দ হতে উদগত একটি যৌগিক শব্দ, যার অর্থ কোন সূফী তরীকা অবলম্বনকারী মুসলিম সাধকের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা আস্তানা।[১৬৯] খানকাহ্ শব্দের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। একটি ফারসী রূপ 'খানগাহ্'।[১৭০] অপরটি আরবী ভাষায় গৃহীত রূপ খানকাহ্।[১৭১] পরিভাষায় ইসলাম প্রচারের জন্য যে সব আউলিয়া-দরবেশ এদেশে আগমন করেন, তাঁরা যে স্থানে অনুসারীদেরকে যিকির ও ইসলামী শিক্ষা প্রদান করতেন সে সকল স্থান বা আস্তানা খানকাহ্ নামে পরিচিত ছিল।[১৭২] কোন কোন ক্ষেত্রে এই শিক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার পর্যায়ভুক্ত হত এবং একজন সাধক/পীর কে কেন্দ্র করে এই খানকাহ্ গড়ে উঠত।[১৭৩]

এদেশে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে যখন মসজিদ বা মাদ্রাসার অস্তিত্ব ছিলনা, সংগঠিতভাবে কোন সভা-সমিতিরও প্রচলন ছিলনা, সবেমাত্র ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছে তখন ইসলাম প্রচার প্রশিক্ষণের একমাত্র মাধ্যম ছিল খানকাহ্।[১৭৪]

---

১৬৮. খানকাহ্'র অর্থ হল ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের প্রাথমিক শিক্ষার অনুশীলন। যেমন- আল্লাহর একত্ববাদ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা। দ্রঃ *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৯৮।

১৬৯. বিরাত-তেক্কে এবং যাবিয়া ইত্যাদি পরিভাষা দ্বারাও অনুরূপ লক্ষ্য বিশিষ্ট একই রকম প্রতিষ্ঠান বুঝান হয়ে থাকে। দ্রঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড (ই.ফা.বা. ১৯৯০), পৃ. ৪৯৮।

১৭০. *প্রাগুক্ত*।।

১৭১. *প্রাগুক্ত*।

১৭২. শ.ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯২), পৃ. ১৫১।

১৭৩. আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৩), পৃ. ৯৮।

১৭৪. খানকাহ্'র শিক্ষার্থীদের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে না। তাদের বয়সসীমা নির্ধারিত থাকে না। সব বয়সের লোকই এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। খানকায়ে আগত শিক্ষার্থীরা একযোগে পীর সাহেবের নিকট হতে কুর'আন-হাদীসের ব্যাখ্যামূলক বয়ান শ্রবণ করে ইসলামের বিধানে ব্রতী হওয়ার জন্য বাই'য়াত গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে পীরের খানকাহ্তে প্রত্যহ শিক্ষার আসর বসত এবং সেখানে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হতো। দ্রঃ*প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক পর্যায়ে খানকাহ্'ই ছিল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আউলিয়া-দরবেশগণের বৈঠকখানা বা খানকাহ্তে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা বা শিক্ষাদান চলত।[১৭৫] বাংলাদেশেও আগত সূফী-পন্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত একাধিক খানকাহ 'শিক্ষার' এক একটি উজ্জ্বল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[১৭৬] মুসলিম রাজত্বের সময় বিভিন্ন স্থানে সমজিদ গড়ে ওঠে। তখন থেকে খানকাহ্র এই শিক্ষা মসজিদ মক্তবে বিস্তৃতি লাভ করে।[১৭৭] প্রাথমিক পর্যায়ে নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে খানকাহ্র প্রচলন শুরু হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন তরীকার পীর-মাশায়েখ এই খানকাহ্'র মাধ্যমে দেশের লোকদের মধ্যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। যশোর জেলাতেও বহু সূফী-দরবেশ পীর ইসলাম প্রচারের জন্য এসে নানা স্থানে আস্তানা গেড়েছিলেন, তাঁদের মাযার বা দরগাহের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলেও তাঁদের খানকাহ্ সমূহের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। পরবর্তীতে বহিরাগত ও স্থানীয় সূফী, পীর-মাশায়েখদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসার তরান্বিত হয় এবং তাঁদের কারো কারো দু'একটা খানকাহ্র কথা জানা যায়। এ সকল খানকাহ্ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- যশোরের নওয়াপাড়ায় ইরান থেকে আগত সূফী ও ইরানী পীর নামে খ্যাত খাজা মুহাম্মদ আলী শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নওয়াপাড়ার মুহাম্মদীয়া খানকাহ্ যা পরবর্তীতে তদ্বীয় সুযোগ্য পুত্র খাজা আব্দুল মজিদ শাহ কর্তৃক ভিন্নতর পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত রূপ লাভ করে।[১৭৮]

বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিককালে যশোর অঞ্চলে নওয়াপাড়া, খড়কী, গাযীর দরগাহসহ গুটি কয়েক খানকাহ্'র অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে যশোরসহ সমগ্র বঙ্গে সূফী, ওলী, দরবেশগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্'র মাধ্যমেই যে ইসলাম সম্প্রসারিত হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

---

[১৭৫]. *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, পৃ. ১৫১।

[১৭৬]. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

[১৭৭]. *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৯৯।

[১৭৮]. *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল কর্তৃক প্রচারিত এ ধর্ম দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে পত্র পল্লব, ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। মহানবী (সঃ) ইসলামের এ সুমহান বাণী প্রচারের মাধ্যমে আরবের জাহেলী, বর্বর সমাজকে একটি সুশীল সমাজে রূপান্তরিত করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতে ইসলামের দা'ওয়াতী মিশন আরব-ভূখন্ডের বাইরেও সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরতের (৬২২খ্রিঃ) পর তিনি সেখানে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর হিজরতের সপ্তম বর্ষে (৬২৯ খ্রিঃ) মক্কার মুশরিকদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে শঙ্কামুক্ত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানগণকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠিপত্র প্রেরণ করেন। এ পর্যায়ে পূর্বদিকে চীন দেশের তদান্তীন সম্রাট তাইসুন্ড এর নিকটও অনুরূপ একখানা পত্র পাঠিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর দশম হিজরীতে (জিলহজ্জ মাসে) ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সঃ) লক্ষাধিক জনতার সামনে ইসলামকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি ঘোষণা করেন, আমার নিকট থেকে একটি বাক্য শুনে থাকলে তা অন্যের নিকট পৌছে দিবে। এ ঘোষণার পর সাহাবায়ে কিরামের একটি অংশ বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে মহানবী (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই ইসলামের সুমহান বাণী পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল থেকে পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশ এমনকি সুদূর চীন পর্যন্ত পৌছে যায়। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্য ও উপাত্তের অপ্রতুলতায় সর্বপ্রথম কখন এবং কিভাবে এ উপমহাদেশ তথা বঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র, আরব ভৌগলিকদের বিবরণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাপ্ত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সাহায্যে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম আগমণের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস পাওয়া গেছে।

ঐতিহাসিকগণ রিজাল শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে হাবশায় হিজরতকারী দলের অন্যতম সাহাবী হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে একদল সাহাবা বাণিজ্য উপলক্ষে চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মালাবার উপকূলে যাত্রা বিরতির মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াত পৌঁছে দেন। এরপর খুলাফায়ে রাশেদূনের আমল থেকেই এ দেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। পরবর্তীকালে আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে অগণিত মুবাল্লিগ এদেশে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা এখানে এসেছেন কখনও বণিকরূপে কখনও দরবেশরূপে আবার কখনও মুজাহিদ হিসেবে। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে। ব্যক্তিগত ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য মসজিদ মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ্। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়। বস্তুত মুসলমানগণ এদেশে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। আর এ ধারার সূচনা হয় মূলত ৯৩ হিজরীতে (৭১২ খ্রিঃ) মুহাম্মদ বিন কাসিম এর নেতৃত্বে সিন্ধুও মুলতান বিজয়ের মধ্য দিয়ে। এ থেকে অনুধাবন করা যায় হিজরী প্রথম শতকেই (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী) ভারত পর্যন্ত তথা বঙ্গদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাবে কখন কারা কিভাবে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের সকলের বিবরণ নিশ্চিত জানা যায়না। তবে একাদশ শতাব্দী থেকে এদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সকল ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদেরকে শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন- মুজাহিদ, 'আলিম ও সুফী। মুজাহিদগণের মধ্যে উলুঘ-ই-আযম জাফর খাঁ গাযী, শাহ ইসমাঈল গাযী ও খানজাহান আলীর (রাঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই মুসলিম শাসনকর্তাদের অধীনে চাকুরি করলেও মূলত ইসলাম প্রচারই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় যুদ্ধ করে নগর ও দেশ জয় করে সেখানে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। উল্লেখ্য, উপরোক্ত তিনজন মুজাহিদ যশোর অঞ্চলেই তাঁদের মিশন পরিচালনা করেন। 'আলিমগণের মধ্যে মাওলানা তকীউদ্দীন 'আরাবী, মাওলানা শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ, মাওলানা শায়খ আলাউল হক, মাওলানা শাহ নূর কুতুব-উল-আলম ছিলেন প্রধান। বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তাঁরা একদিকে ইসলাম প্রচার ও অন্যদিকে মুসলমানদেরকে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। ইসলাম প্রচারকারী তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন সূফী ও দরবেশগণ। তাঁদের সংখ্যা ছিল অগণিত। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূফী পীর সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "মোটকথা বাংলাদেশের বড় শহরের

Dhaka University Institutional Repository

কথা বাদ দিলেও এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে খোদাভীরু সূফীগণ আগমণ ও বসতি স্থাপন করেননি।"

উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যশোর অঞ্চলেও যে ইসলাম তথা মুসলমানদের আগমণ ঘটে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু সর্বপ্রথম কার মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয় তা উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাবে নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

তবে একথা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিভাত যে, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নদীয়া বিজয় এবং পরবর্তীতে মুগীস উদ্দীন য়ুজবাকের মাধ্যমে এ বিজয় সুসংহত করণের মধ্য দিয়ে যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুরের পশ্চিমাংশ, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল পুরোপুরি মুসলিম শাসনাধীনে আসে। অবশ্য স্যার যদুনাথ সরকারের মতে মুঘিসউদ্দীন তুঘ্রিলের সময়ে (১২৬৮-১২৮১ (খ্রিঃ) যশোর জেলা মুসলিম সালতানাতের অধীনে আসে। সমসময়ে প্রায় সারা বঙ্গে ইসলাম প্রচারক ও ওলী-দরবেশদের দ্বারা ছেয়ে যায়। এই জোয়ারে যশোর অঞ্চলেও পীর গোরাচাঁদ, সৈয়দা রওশনারা মাক্কী, সাইয়েদ মুবারক গাযী ও বরখান গাযীর ন্যায় প্রমুখ ওলী দরশেদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ঘটে। তবে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) (১৪৫৯ খ্রিঃ মৃ.) এ অঞ্চলে আগমনের মাধ্যমে যশোর জেলায় ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করে। এজন্য খানজাহান আলী(রঃ) কে এ অঞ্চলের ইসলাম প্রচার-প্রসারের পথিকৃত বলা যেতে পারে।

রাজনীতি, ধর্মনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান যশোরের একটি উজ্জ্বল ভূমিকা বরাবরই ছিল। মধ্যযুগীয় যশোরে ইসলাম প্রচারের আদিকাল থেকে যেমন শহীদ ও গাযীদের প্রাধান্য ছিল, পরবর্তী যশোরে তেমনি হযরত খানজাহান (রঃ) এর খিলাফত-ই-আবাদ সাম্রাজ্য স্থাপনের কাল থেকে চিরদিনই যশোরে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, হযরত খানজাহান (রঃ)-এর প্রখ্যাত শিষ্য হযরত আবূ তাহির ওরফে পীরালীর প্রভাবে যশোরে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ে এ নবপ্রবুদ্ধ পীরালী ভাববাদের জন্ম হয়। এই ভাববাদের পরিণতিতে ভারতীয় হিন্দু ধর্মমতেও নতুন আলোড়নের সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভাব ঘটে রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, রামমোহনের সমসময়েই যশোরে মরমী কবি লালন শাহের আবির্ভাব ঘটে, লালনের গানের মরমী চিন্তা-চেতনার আগ্নেয় পরশে বাউল বা মা'রিফতী গীতিধারার জন্ম হয়। এই

Dhaka University Institutional Repository

গীতি আধুনিক বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেও বিস্তৃত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজ কোম্পানি কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের জমিদারি চলে যায়, এদিকে মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচারক, পীর, আউলিয়ায়ে কিরাম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নামে বরাদ্দকৃত লাখেরাজ সম্পত্তি প্রত্যাহার করে সরকারের বিশ্বস্ত হিন্দুদের হাতে তুলে দিলে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক ভিত একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইংরেজ রাজশক্তির সহযোগিতায় খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করণের অপচেষ্টা চলে এবং নব্য হিন্দু জমিদারদের প্রভাব ও তাদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন বসবাস করার কারণে মুসলমানদের আচার-আচরণে হিন্দুয়ানি প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। দরিদ্রতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, মুসলিম জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা মুসলমানগণ প্রকৃত ইসলামের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে শিরক, বিদ'য়াত ও কুফরে লিপ্ত হয়।

জাতির এহেন ক্রান্তিলগ্নে যশোর অঞ্চলে সঠিক ইসলামের দিক নির্দেশনা নিয়ে কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বেশ কিছু সংখ্যক অকুতোভয় মুজাদ্দিদ-মুজাহিদ, নিবেদিত প্রাণ সূফী, পীর, ওলী, 'আলিম ও মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দ। এ সকল মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে হাজী শরী'য়াতুল্লাহ ও সৈয়দ মীর নিছার আলী ওরফে তিতুমীর সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের অবদমিত রাখারা পাশাপাশি মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতনের মুকাবেলায় ১৮৭০ সনের দিকে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। তথাপি তাঁদের এ সকল আন্দোলন বাংলায় তথা অত্র এলাকার মুসলমানদেরকে সংগঠিত করত: তাদেরকে সঠিক ইসলামের পথে ফিরে আনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। সূফী সম্রাট ফুরফুরার পীর কিবলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ), মাওলানা রুহুল আমীন, খাজা মুহাম্মদ আলী শাহ, সূফী 'আব্দুল করিমের মত আউলিয়ায়ে কিরামগণ যশোর অঞ্চলে ও'য়ায-নসীহত, বই-পুস্তক রচনা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে ইংরেজ শাসন এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে যাঁর বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ বাগ্মীতা এবং ক্ষুরধার লেখনী অত্র অঞ্চলের মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল, তিনি হলেন মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা, তাঁর বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এজন্য মুন্সী মেহেরউল্লা'কে এতদাঞ্চলের ইসলাম প্রচারের নকীব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়াও মুন্সী

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরউল্লা'র অন্যতম সঙ্গী মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন, নওয়াপাড়ার খাজা আব্দুল মজিদ শাহ, মাওলানা আহমাদ আলী এনায়েতপুরীর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক পীর ও 'আলিম সমাজের অবদানের কথা উল্লেখের দাবি রাখে। শুধু 'আলিম সমাজ নয়, গোলাম হোসেন, হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন, গোলাম মোস্তফা ও ফররুখ আহমদের ন্যায় দক্ষ, প্রতিভাবান, সৃজনশীল সাহিত্যিকবৃন্দের রচিত অসংখ্য ইসলামী সাহিত্যে অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

উপমহাদেশে যে সকল ইসলাম প্রচারক (مبلغ) দাঈ-ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালনে ব্রতী ছিলেন তাঁরা অত্র অঞ্চলে খানকাহ, মসজিদ, মক্তব-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোকে তাঁদের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করেন। সমকালে যশোর অঞ্চলেও অসংখ্য খানকাহ, মসজিদ, মক্তব ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। খান জাহান আলী (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বারবাজারের মসজিদ সমূহ ও বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ যার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এছাড়া শৈলকুপা মসজিদ, কেশবপুরের শেখপুরা মসজিদ, মীর্জানগর মসজিদ সহ অসংখ্য মসজিদ অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মসজিদের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত অসংখ্য মক্তব-মাদ্‌রাসার মাধ্যমেও ইসলাম প্রচার-প্রসার তরান্বিত হয়। এক্ষেত্রে মুন্‌সী মেহেরউল্লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা-ই-কারামতিয়া, কোটচাঁদপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা ও লাউড়ি রামনগর আলিয়া মাদ্‌রাসা উল্লেখযোগ্য।

সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসন-শোষণ ও স্থানীয় হিন্দুদের বিভিন্নমুখী যড়যন্ত্র সত্ত্বেও আলোচ্য অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত নিবেদিত প্রাণ মুজাদ্দিদ, মুজাহিদ ও মুবাল্লিগগণের অক্লান্ত সাধনা, কর্ম প্রচেষ্টা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে যশোর জেলায় ইসলামের প্রচার-প্রসার থেমে থাকেনি। বরং মুসলিম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি অত্র অঞ্চলকে ইসলাম তথা মুসলমানদের জন্য উর্বর আবাসভূমিতে পরিণত করে। এ যেন মহান আল্লাহর সেই বাণীরই বাস্তব প্রতিধ্বনি-

"يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِه وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ"

অর্থাৎ- "তারা (কাফির-মুশরিক) আল্লাহর জ্যোতি (দীন) কে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর জ্যোতিকে পরিপুর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।" দ্রঃ আল কুর'আন, সূরাঃ সাফ, আঃ ৮।

Sidho-Kanho-Birsha University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

- Reports and Records
- District Gazetteers
- এম.ফিল, পি.এইচ.ডি উৎস
- English Books
- আরবী ও উর্দূ উৎস
- বাংলা উৎস
- English Articles
- বাংলা প্রবন্ধ
- পত্র-পত্রিকা

Reports and Records

1. Beverley, H. : *Report on the census of Bengal 1872*, Calcutta: Bengal Secretariate press 1872.

2. E. Biss, Even : *Report on the Expansion and Improvement of primary Education in Bengal*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot 1902.

3. Government of Bengal : *Report on the public instruction of Bengal, 1886-87*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1914.

4. Government of Bengal : *Education of Bengal,* Alipore: Bengal Government press, 1934.

5. Government of Bengal : *Seventh Quinquiennial Review of the progress of Education in Bengal*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. 1928.

6. " " " : *Report of the Indigo Commission* Appointed under Act xi of 1860 : Minute of Evidence, 1860.

7. Momen. M. A. : *Final Report on the Survey and Settlement operation in the District of Jessore, 1920-24,* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. 1925.

8. Nyayaratna, Mahamahopadhay : *Mohes Chandra : Report on the on the Tools of Bengal, Bihar and Wrissa*, Calcutta: Bengal Secretariat press, 1892.

9. Sherp, H. : *Selections from Educational Records Part-1*, Calcutta: 1920. Appendix-A.

Dhaka University Institutional Repository

10. Sen, Ramshunker : *Report on the Agricultural Statistics of Jessore,* Calcutta: Bengal Secretariat press, 1873.

11. Somyth : *Report of 24-Parganrnahs,* Calcutta: Bengal Secretariat press, 1857.

12. West Land, J. : *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History and Its commerce*, Calcutta: Bengal Secretriate press, 1874.

13. *Calcutta University Calendar, 1886.*

14. *Higher Education in Bengal,* Alipore: Bengal Secretariate press, 1934.

15. *Indian Muslim Catalogue of Coins,* Vol-1.

16. *List of School of Presidency Division*, Cacutta: Bengal Secratariate Press, 1922.

17. *Printed Proceedings (General) National Archives of Bangladesh*. October. 1887.

18 . *Printed Proceedings (Education) National Archives of Bangladesh*, File no 1-6- 54, Dhaka: February-1923.

 Dhaka University Institutional Repository

District Gazetteers

1. Bari, K.G.M. Latiful : ***Bangladesh District Gazetteers: Jessore***, Dhaka: Bangladesh Government Press,1979.

2. .. " " : ***Bangladesh District Gazetteers: Khulna***, Dhaka: Bangladesh Government Press,1978.

3. Navill, H.R : ***Jaunupur, A Gazetteers, Vol-XXVIII of the District Gazetteer of Agra,*** Alahabad: 1908.

4. O' Malley, L.S.S : ***Bengal District Gazetteers: Jossore,*** Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot, 1912.

5. Rahman, Md. Habibur : ***Bangladesh District Gazetteers Bakerganj***, Dhaka: 1980.

6. ***Imperial Gazetteers of India***, Vol- II, Oxford: Clarendon press,n.d.

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল, পি.এইচ.ডি উৎস

১. আফাজউদ্দিন, ডঃ মুহাম্মদ ঃ *ইসলামী দাওয়াহ বিস্তারে ও ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে আবদুল আউয়াল জৈনপুরী (রহঃ) (১৮৬৭-১৯২ খ্রিঃ) এর অবদান,* অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৮।

২. আমিন, মুহাম্মদ রুহুল ঃ *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭),* অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

৩. ইসলাম, মোঃ আমিরুল ঃ *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা, ১৭৮৬-১৯৪৭ খ্রিঃ,* অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৭।

৪. করিম, মোঃ রেজাউল ঃ *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২ ঃ একটি সমীক্ষা,* অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

৫. জাকারিয়া, মোহাম্মদ ঃ *মাওলানা মোয়েজউদ্দিন হামিদীঃ তাঁর জীবন ও কর্ম,* অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, জুন-২০০১।

৬. নিজামউদ্দীন, মুহাম্মদ ঃ *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০),* অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

৭. নূরুল আলম ঃ *আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আবূ নসর ওহীদের অবদান,* অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, ঢাকাঃ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮. বানু, আলো আরজুমান : *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)ঃ তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানু-২০০২।

৯. Ali, A.K.M.Yaqub : ***Aspeets of Society and Culture of the Barind 1200-1576 A.D.***, Unpublished Ph.D. Thesis, Rajshahi University, 1989.

১০. Choudhury, Nurul. H. : ***Agrarian Relation in Nineteenth Century Bengal : The Faraizi, Indigo and pabna Movements***, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Toronto, Canada, 1992.

১১. Ibrahimi, Sakander Ali : ***Maulana Karamat Ali and His Project of Reforms***, Unpublished Ph.D. Thesis, Rajshahi University, 1979.

English Books

1. Abedin, Najmul : ***Local Administration and Politics in Modernizing Societies: Bangladesh and Pakistan***, Dacca: National Institute of Public Administration, 1973.

2. Ahmed, Rafiuddin : ***The Bengal Muslims, 1871-1906: A Quest for Identity,*** Delhi: Oxfor University press, 1988.

3. Alamgir, Khoundker : ***Khan Jahan (R): Rular, Builder and Saint,*** Dhaka: Parash Publishers, 2001.

4. Ali, Muhammad Mohar : ***History of the Muslims of Bengal,*** Riyadh: The University 1985.

5. Ali, Abid : ***Memories of Gaur and Pandua***, Calcutta: Bengal Secretariat Book. n.d. 1924.

6. Allami, Abul Fazl : *Aim-i-Akbari, Vol.-1*, Trans: H. Blochman, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1873.

7. Allami, Abul Fazl : *Ain-i-Akbar, Vol- ii*, Translated by H.S. Jarret, New Delhi: Oriental Books Reprint corporation, 3rd. ed., 1978.

8. Bahadur, Raj Monohar Chakrabtti : ***Summary of Changes in the Jurisdiction of District in Bengal, 1757-1916***, Calcutta: Bengal Secratariat press, 1918.

9. Bakshi, Nizam al-Din Ahmad : *Tabaqat-i-Akbari (Vol.-1)*, Tram: H. Beveridge, Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1927.

10. Bagchi, P.C (ed.), : *Visva Bharati Annals*, India: Bisva Bharati Publisher Department, 1945.

11. Banu, U.A.B. Razia Akter : *Islam in Bangladesh*, New York: E.J. Braille, 1992.

12. Baalabak, Dr. Rohi : *Al-Maurid*, Bairuit: Darul Marige, 1988.

13. Chaudhary, A.M. : *Dynastic History of Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1967.

14. Chowdhury, Nurul, H. : ***Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal: The Faraizi, Indigo And Pabna Movements,*** Dhaka: Asiatic Society of Bengal, 2001.

15. Dani, A. H. : *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961.

16. Edited by Doard of Research : *Islam in Bangladesh Through Ages*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995.

17. Edited by Board : *"The World Book Encyclopedia, Vol.-4,* London: Field Enterprises Educational Corporation, 1966.

18. Farquhar, J. N : ***Modern Religious Movement in India,*** London: 1924.

19. Guha, Dr. B. S. : *An outline of Raeial Ethnology in India,* Calcutta: 1937.

20. Habibullah, Dr. A. B. M. : ***The Foundation of Muslim Rule in India,*** 2nd Rivised (ed.) Allahabad, India, 1961.

21. Hardy, p. : ***The Muslims of British India,*** Cambridge: 1972.

22. Hoque, Md. Nurul : ***Arab Relationship with Bangladesh,*** Unpublished M. phill Dessertation, Dhaka University, 1980.

23. Huq, Enamul, Md. Dr. : ***A History of Sufism in Bengal,*** Dhaka: 1975.

24. Huner, W.W. : ***A Statistical Account of Bengal, Vol.-11,*** Delhi: D.K. Publishing House, First Reprint 1963.

25. " " : ***A Statistical Account of Bengal, Vol.-11,*** Districts of Nadia and Jessore, London: 1875.

26. " " : ***Imperial Gazetteer of India, Vol.-v11,*** Oxford: Trubner co. 1907.

27. slam, Sirazul : ***Perlanent Settlement of Bengal: A Study of its operation, 1790-1819,*** Dhaka: Bangla Academy 1979.

28. Jackson, W.B : ***General of a Tour of Inspection,*** Calcutta: 1854.

29. Karim, Abdul : *Murshid Quli Khah and his Times*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963

30. " " : *Socio History of the Muslim in Bengal*, Chittagong: Baitush sharif Islamic Research Institute, 2nd Revised edition, 1985.

31. Khan, M. A. (ed.) : *Selection from Bengal Government Record on Wahhabi Trails (1863-1870)*, Dhaka: 1961.

32. " " : *The Faraidi Movement in Bengal, 1818-1906)*, Karachi:1965.

33. Law, Narendra Nath Law : *Promotion of Learning in India During Muhammadan Rull*, London: Longmans green and co. 1916.

34. Majumdar, R.C (ed.) : *The History of Bengal Vol.-1*, Hindu period, Dacca: University of Dacca 2nd imp, 1963.

35. Mallick, A. R. : *British Policy And the Muslims in Bengal, 1757-1856*, 2nd edition, Dacca: Bangla Academy, 1977.

36. Mookerjee, D.N. : *Note on the soil of Bengal*, Calcutta: Bengal Secretariat press, 1909.

37. Nathan, Mirza : *Baharistan-i-Ghaybi*, Tran: M.I Borah, Gauhati: Government of Assam, 1963.

38. R. Chanda : *The Indo Arayan Races*, Rajshahi, 1966.

39. Rahim, Muhammad Abdur : *The Muslim Society and Politics in Bengal 1757-1947*, Dacca: The University of Dacca, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

40. " " : *Social and Cultural History of Bengal*, Karachi: Pakistan Publication House, 1967.

41. Rawlinson, H.G. : *India, A Short Cultural History*, London: 1937.

42. Rubbe, Khondker Fajli : *The Origin of the Musalman of Bengal*, Calcutta: 1895.

43. Sastri, S.R. Majumdar (ed.) : *Cunninghums Ancient Geography of India*, Calcutta: Chukarvertty Chettarjee & Ltd., 1924.

44. Sarkar, Sir J.N. (ed.) : *The History of Bengal Vol.-II*, Muslum Period, 3rd edition, Dacca: University of Dacca, 1976.

45. Salim, Gulam Hussain : *Riyad-al-Salatin*, Tran: Abdus Salam, Delhi: Idarah-i- Adabiyat-i-Dilhi, Reprint, 1975, Calcutta: Bibliotheca Indica, Asiatic Society of Bengal, 1904.

46. Schimmel, Annmarie : *Islam in the Indian Subcontinent*, Leiden: 1980.

47. Shuayb, Shah : *Manahib-al-Asfiya*, Bhar: Extract Printed at the end of Maktub at-i-Sadi- A.H. 1286.

48. Siddiquee, Mohammed Mohibullah : *Socio-Economic Development of A Bengal District: A Study of Jessore, 1883-1925,* Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

49. Siraj, Minhajuddin : *Tabakat-i-Nasiri, Vol.- 1*, Tram by H.G. Raverty, Reprint, New Delhi: Oriental Books Corporation, 1970.

50. Sinha, J. C. : *Economi Annals of Bengal*, London: Macmillan and Co.Ltd. 1929.

51. Tailor, S. M. : *Glimpses of Old Dacca*, Karachi, Vol-11, 1967.

52. Tarkalanker, Haris Chandra : *The History of Rafa Pratapaditya*, Calcutta: Vernacular Literature Society 2nd (ed.), 1856.

53. Tarafder, M.R. : *Hussain Shahi Bengal, 1494-1538, AD: A Socio-Political Study*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1965.

54. Titees, T. : *Indian Islam*, Oxford, 1930,

55. V. Good, Carter, (ed.) : *Dictionary of Education*, New York: Megraw-Hill, Book, Company Inc. 1945. Secretariat Press, 1919.

56. Wehr, Hans : *A Dictionary of Modern Writting Arabic*, London: Macdonald and Evans Ltd., 1980.

57. William Addams : *History of the river in the Gangetic Delta, 1750-1918*, Calcutta: Bengal

58. Wise , James : *Notes on the Races, Castes and Trdes of Eastern Bengal*, London: 1884.

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও উর্দূ উৎস

১. আত-তিরমিযী : *আল-জামিউত তিরমিযী*, করাচীঃ নূর মোহাম্মদ আসাহ্হুল মাতাবী, দিল্লী সং, ১৯৪০।

২. আব্দুর রউফ, আবুল বারাকাত : *আসাহ্হুস সিয়ার*, ভারত: ইউ পি, দেওবন্দ: সামাদ বুক ডিপো, ১৩৫১হিঃ/১৯৯১খ্রিঃ।

৩. আল-খাতীব আত-তিবরিযী, শায়খ ওলী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ : *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদিয়্যাহ, তা.বি.।

৪. আল-জাযাইরী : *আকীদাতুল মু'মিন*, জেদ্দাঃ দারুশ শরক, ১৯৮৭, দারুল মা'রুফ, ১৯৮৭।

৫. আল-ফাখুরী, হান্না : *আল মু'জিয ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারিখুহু, ১ম খণ্ড*, বৈরুত: দারুল জিল, ১৪১১হিঃ/১৯৯১খ্রিঃ।

৬. আসকালানী, ইবন হাজার : *তাহযীবুত তাহযীব, ২য় খণ্ড,* বৈরুত: দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪১৫হিঃ/১৯৯৫খ্রিঃ।

৭. " " : *এসাবা ফী তামিজ আস সাহাবা, ১ম খণ্ড*, মিশরঃ দারু এহইয়াউত তারাসিল আরাবী, ১৩২৪ হিঃ।

৮. ইবন আন-নাসাঈ, আব্দুর রহমান আহমদ সুয়াইব : *সুনানে নাসাঈ, ২য় খণ্ড,* নতুন দিল্লীঃ মাকতাবায়ে রহিমিয়্যাহ, তা.বি.।

৯. " " : *সুনানে নাসাঈ, ৩য় খণ্ড,* লেবাননঃ কারাজ আল-ফিকর, ১৯৯০।

১০. ইবন তৈয়ব, আল্লামা বাকেল্লানী আবুবকর মুহাম্মদ : *ইজাজুল কুরআন*, মিসর: দারুল মা'আরেফ, কায়রো, তা.বি.।

১০. ইবনু মাজাহ, ইমাম : *সুনান*, করাচীঃ নূর মোহাম্মদ লাইব্রেরী, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ইসমাঈল, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনঃ *সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড,* দিল্লীঃ মাকতাবায়ে মুস্তফায়ী, ১৩০৪হিঃ।

১২. গালুশ, আহমাদ ঃ *আদ দা'ওয়াতুল ইসলামীয়্যাহ উসুলুহা ওয়া ওয়াসাইলুহা,* কায়রোঃ দারুল কুতুব মিসরী, ১৯৯৩।

১৩. জাযাইরী, আবু বকর জাবের আল ঃ *আকিদাতুল মু'মিন,* জেদ্দাঃ দারুশ শরফ ১৯৮৭।

১৪. তালিব, আব্দুল মান্নান সম্পাঃ ও অধ্যাপক মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী ও অন্যান্য অনূদিত ঃ *সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকাঃ ২০০০।

১৫.তাফতাযানী (রহঃ), আল্লামা ঃ *শরহে আকীদাতুল নাসাফিয়্যাহ,* জেদ্দাঃ দারুল মা'রুফ, ১৯৮৭।

১৬. তিরমিযী, ইমাম আত ঃ *আল-জামিউত তিরমিযী,* করাচীঃ নূর মোহাম্মদ আসাহহুল মাতাবী', ১৯৪০, দিল্লী সং।

১৭. মুবারকপুরী, শায়খ শফিউর রহমান ঃ *আর-রাহীকুল মাখতুম,* রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৯।

১৮. মুহাম্মদ আশ শাযেলী, আব্দুল্লাহ 'আলীল কবীর মুহাম্মদ আহমাদ হাবীবুল্লাহ হাশেমী ঃ *লিসানুল 'আরাব,* মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১১১৯ হিঃ।

১৯. সাইলী, মুবারক ইবন মুহাম্মদ ঃ *আশ শিরক ওয়া মাজাহিরুহু,* মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ, ১৪০৭।

২০. আতাহার মুবারকপুরী, কাজী ঃ *খুলাফায়ে রাশেদীন আওর হিন্দুস্থান,* দিল্লীঃ ১৯৭২।

২১. " " ঃ *তারীখে আরকান কা এক গমশুদাহ্ বাব,* দিল্লীঃ হিঃ ১৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা উৎস

১. আকবরউদ্দিন (অনূ) ঃ *বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)*, মূল- গোলাম হোসায়ন সলীম, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, মে, ১৯৭৪।

২. আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ ঃ *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকাঃ আজাদ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১ম সং ১৯৬৫।

৩. আনসারী, মুহম্মদ শাহাদত আলী ঃ *বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান*, যশোরঃ প্রকাশক-শামসুন্ নাহার লিলি, বারান্দি পাড়া, পূর্বাচল প্রেস, ১৯৮৭।

৪. “ “ ঃ *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৩।

৫. আবদুল্লাহ, ডঃ মুহাম্মদ ঃ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৬।

৬. আযম, অধ্যাপক গোলাম ঃ *বাইয়াতের হাকীকাত*, ঢাকাঃ আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১১তম প্রকাশ, ২০০১।

৭. আল ফারুক, মীর্জা মোহাম্মদ (সম্পা) ঃ *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, ঝিনাইদহঃ জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ, ১৯৯১।

৮. আলম, মুহাম্মদ রবিউল ঃ *মুন্সী শেখ জমীরউদ্দিন জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪।

৯. আলমগীর, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ঃ *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭।

১০. আহছানউল্লা, খানবাহাদুর ঃ *আমার জীবন-ধারা*, ঢাকাঃ আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ৭ম সং, মে ২০০০।

১১. আহমদ, ডঃ ওয়াকিল ঃ *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আসাদ, আসাদুজ্জামান (সম্পা) : *যশোর জেলার ইতিহাস,* ঢাকাঃ দিগন্ত প্রচারণী লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯০।

১৩. আছিরুদ্দীন, শেখ : *মেহেরুল্লাহর জীবনী,* জলপাইগুড়ি, ১৯০৯।

১৪. আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতাঃ ১৯৭১।

১৫. আমিন, মাওলানা রুহুল : *হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা.।

১৬. আলী, শ. ম. শওকত : *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

১৭. আলী, শাহেদ (সম্পাদিত) : *ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা,* সিলেটঃ সোশ্যাল অপলিফ্টমেন্ট কমিটি, ১৯৬৭।

১৮. আলী, মৌলভী মোহাম্মদ : *খাজা আবদুল মজিদ শাহ,* যশোরঃ রেডিয়েন্ট লাইব্রেরী, ১৯৯১।

১৯. আলী, কে : *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস,* ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৮।

২০.আব্দুল আলীম, আবূ নঈম : *হায়াত কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ),* ঢাকাঃ ফাহিম প্রকাশনী, ১৯৮২।

২১. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ : *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫।

২২. ইউছুপ, ফজলুলু হাসান : *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯২ এবং ১৯৯৫।

২৩. ইসলাম, সিরাজুল ঃ বাংলার ইতিহাস : *ঔপনিবেশ শাসন কাঠামো,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

২৪. ইসলাম, মোঃ নুরুল : *খুলনা জেলা,* খুলনাঃ জেলা প্রশাসন কার্যালয়, ১৯৮২। (দাউদ প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ইসলাম, মুস্তাফা নূর-উল ঃ *মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ,* ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০।

২৬. ইসলাম, এ. এন. এম. সিরাজুল ঃ *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা,* ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩।

২৭. ওয়াহেদ, ক্যাপ্টেন ডাঃ এম. এ. ঃ *ইরানী হযরতের জীবন কাহিনী,* খুলনাঃ খুলনা প্রেস, ১৯৯২।

২৮. " " ঃ *ইরানী হযরতের জীবনী,* নওয়াপাড়াঃ মাজিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২।

২৯. কবির, মফিজুল্লাহ ঃ *নীল বিদ্রোহ,* সম্পাদনায়ঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন, বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

৩০. করিম, ডঃ আবদুল ঃ *বাংলার ইতিহাস,* মোঘল আমল, ১ম খণ্ড, রাজশাহীঃ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২।

৩১. " " ঃ *বাংলার ইতিহাস,* সুলতানী আমল, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩।

৩২. " " ঃ *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)* অনুবাদঃ মোকাদ্দেসুর রহমান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩।

৩৩. " " ঃ *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী-১৯৯৪।

৩৪. কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল ঃ *খানবাহাদুর আহছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫ খ্রীঃ),* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯।

৩৫. কালাম, শেখ মাসুম ও চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি ঃ *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ ঃ সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* সাতক্ষীরাঃ জেলা প্রশাসন সাতক্ষীরা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. কিসমতি, জুলফিকর আহমদ : *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ, ১ম ও ২য় খণ্ড,* ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশনী ১৯৮৮।

৩৭. খান, আব্বাস আলী : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ,* ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৪।

৩৮. খান, কে. এম. রাইছ উদ্দীন : *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা,* ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ৮ম সং, ১৯৯৮।

৩৯. খান, মঈনুদ্দীন আহমেদ : *"মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন" বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১),* সম্পাদিত: সিরাজুল ইসলাম, বাংলা সংস্করণ, ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

৪০. ঘোষ, নীলীমা, ও কুন্ডু, সন্তোষ কুমার : *শিক্ষা প্রথম ভাগ,* কলকাতাঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, তা.বি.।

৪১. চন্দ্র, রমা প্রসাদ : *গৌড় রজমালা,* কলিকাতাঃ নব ভারত পবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৫।

৪২. চশতী, শাহ মাহমুদ বখত : *বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যাঁরা,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭।

৪৩. চশতী, সদরউদ্দীন আহমদ : *মসজিদ-দর্শন,* ঢাকাঃ দরবার নিমতলা মাজার, ১৯৯৮।

৪৪. চৌধুরী, আব্দুল মমিন, অনূদিত : *পাঠশালা থেকে স্কুল,* মূল: কাজী শহীদুল্লাহ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

৪৫. চৌধুরী, হাসান আলী : *ইসলামের ইতিহাস,* ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৪র্থ সং, ১৯৯৬।

৪৬. চৌধুরী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন (সম্পা) : *অগ্রপথিক সংকলন, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা. জুন-১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. চৌধুরী, আবুল হাসান : *জীবনী গ্রন্থমালা-২৩*(মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন) ঢাক: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

৪৮. জমিরুদ্দীন, শেখ : *আমার জীবন ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত*, রাজশাহীঃ নতুন সং, ১৯৬৭।

৪৯. " " : *মেহের চরিত*, কলকাতাঃ ১৩১৫ বাং।

৫০. জলীল, এ. এফ. এম. আব্দুল : *সুন্দরবনের ইতিহাস*, খুলনাঃ প্রকাশক, মেহদী বিল্লাহ, আহসান আহম্মদ রোড, ১ম সং, ১৯৬৭ এবং ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২য় সং, ১৯৮৬।

৫১. জামান, ডঃ হাসান : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকাঃ ইসলামী সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

৫২. ঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ : *গল্পগুচ্ছ, অখন্ড*, ঢাকাঃ এস. আর. প্রিন্টার্স, ৭, শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী লেন, ১৯৯৫।

৫৩. তর্ক বাগিশ, দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম হুসেন : *হকিকতে ইনসানিয়াত*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সেল প্রেস, ১৯৭৮।

৫৪. তারাচাঁদ, ডঃ : *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদঃ করুণাময় গোস্বামী, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

৫৫. তালিব, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ : *যশোর জেলায় ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯১।

৫৬. " " : *খুলনা জেলায় ইসলাম*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৮।

৫৭. তালিব, মুহাম্মদ আবূ (সম্পা:) : কিংবদন্তীর যশোর সাহিত্য প্রসঙ্গ, ঢাকাঃ নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৩৯৫ বাং।

৫৮. তালিব, মুহাম্মদ আবু ও মুয়াযযাম, মোহাম্মদ গোলাম সম্পা: : *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত*, রাজশাহীঃ নতুন সং, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. তালিব, আবদুল মান্নান : *বাংলাদেশে ইসলাম,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং ১৯৯৪।

৬০. তালিব, আবদুল মান্নান (সম্পা:) : *সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড,* ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০।

৬১. দাশগুপ্ত, শত্রুজিৎ অনূদিত : *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণ গহবর,* কলকাতাঃ বাউল মন প্রকাশন, ২৮ কালিগঞ্জ গার্ডেন্স ১৯৯৩।

৬২. নাজির আহমদ, এ. কে. এম. : *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন,* ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯।

৬৩. নোমানী, আল্লামা শিবলী ও নদভী, সৈয়দ সুলায়মান : *সীরাতুন-নবী,* এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী অনূদিত, ঢাকাঃ তাজ কোম্পানী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৪।

৬৪. পন্ডিত, রামাই, : *শুন্য পুরাণ,* নগেন্দ্রনাথ বসু, (সম্পাদিত কলিকাতাঃ বংগীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪বাংলা।

৬৫. ফরিদী, আবদুল হক : *মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

৬৬. বসু, শ্রী নগেন্দ্র, (সংকলিত) : *'বিশ্বকোষ' পঞ্চম ভাগ,* কলিকাতাঃ বসু এ্যান্ড কোং ১৩১১ বাংলা।

৬৭. বসু, এন. এন. : *বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড,* কলকাতাঃ বিশ্বকোষ প্রেস, তা.বি.।

৬৮. বন্দোপাধ্যায়, শ্রী রাখাল দাস : *বাঙ্গালার ইতিহাস,* কলিকাতাঃ ১৩২৪ বাংলা।

৬৯. বান্না, আজিজুল হক : *বরিশালে ইসলাম,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪।

৭০. বালাযুরী, 'আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহইয়া : *ফতহুল বুলদান,*সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭১. বাতিন, মাওলানা আব্দুল : *সীরাতই মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) এর জীবনী*, ঢাকাঃ আল করণী প্রেস, তা.বি.।

৭২. বাশার, মাওলানা আবুল ও বাতেন, মাওলানা আব্দুল : *সীরাতে মাওলানা আবদুল আওয়াল জৈনপুরী (রহঃ)*, এলাহাবাদঃ ইসরার-ই-কাশেমী, প্রেস, ১৩৭০হিঃ।

৭৩. ভূঁইয়া, অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান : *কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন, ৩য় খণ্ড*, ঢাকাঃ ভূঁইয়া প্রকাশনী, ২০০০।

৭৪. মঈনউদ্দিন, গোলাম (সম্পাদিত) : *খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯০।

৭৫. মজিদ, মোহাম্মদ আব্দুল : *শেখ হবীবর রহমান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

৭৬. মহিউদ্দিন, এ.কে.এম. : *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৬।

৭৭. মাহমুদ, ফারুক : *ইতিহাসের অন্তরালে*, ঢাকাঃ ওয়েসিস বুকস, ১৯৮৯।

৭৮. মিত্র, শ্রী সতীশ : *যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২ খণ্ড*, কলিকাতাঃ শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট, লিমিটেড, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, অক্টোবর, ১৯৬৩ এবং ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৯৬৫।

৭৯. মিনহাজ-ই-সিরাজ : *তবাকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

৮০. মিয়া, ডঃ শেখ গাউস : *বাগেরহাটের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*, বাগেরহাটঃ বেলায়েত হোসেন ফাউণ্ডেশন, জুলাই- ২০০১।

৮১. মুজীবর রহমান, ডঃ মুহাম্মদ (অনূ) : *তাফসীরে ইবনে কাসীর, সপ্তদশ খণ্ড*, ২য় সং, ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২০০১।

৮২. মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু : *প্রসংগ সমাজতত্ত্ব*, ঢাকাঃ সেন্ট্রাল বুক পাবলিশিং, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার : *বাংলার আর্থিক ইতিহাস, উনবিংশ শতাব্দী* কলিকাতাঃ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭৫।

৮৪. মেহেরুল্লাহ, মুন্‌শী মোহাম্মদ : *মেহেরুল এসলাম*, কলিকাতাঃ ১৩১৮।

৮৫. " " : *হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা*, ঢাকাঃ ১৯৯৭।

৮৬. " " : *খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা*, কলিকাতাঃ ১৩১৮ বাং।

৮৭. মোহাব্বতী, মোহাম্মদ এবরাহিম : *হামিদী চরিত*, ঢাকাঃ কামাল লাইব্রেরী ১ম সংস্করণ, ১৩৬৭ বাংলা।

৮৮. যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ : *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।

৮৯. রব, কাজী আব্দুর : *হযরত মোহাম্মদ আলী শাহ সাহেবের জীবন কাহিনী*, কলিকাতাঃ রেডিয়েন্ট ইসলামিক সেন্টার, ১৯৩৮।

৯০. রহমান, শেখ হবিবর : *কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ*, কলিকাতাঃ ১৫, কলেজ স্কোয়ার ১৯৩৪/১৯৩৬।

৯১. রহমান, চৌধুরী শামসুর : *সুফী-তত্ত্বের মর্মকথা*, ঢাকাঃ সোসাইটী ফর্ পাকিস্তান স্টাডিস, ১ম সং ১৯৭০।

৯২. রহিম, ডঃ মুহম্মদ আবদুর : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড* (১২০৩-১৫৭৬) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত এবং *দ্বিতীয় খণ্ড (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রীঃ)*, আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম খণ্ড, প্রথম মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯৫, দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম মুদ্রণ-১৯৯৬।

৯৩. " " : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৫।

৯৪. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর : *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. " " : *সুন্নাত ও বিদয়াত*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, অষ্টম প্রকাশ, ১৯৯৮।

৯৬. রশীদ, আ.ন.ম. বজলুর : *পাকিস্তানের সূফী সাধক*, ঢাকাঃ জাতীয় পূনর্গঠন সংস্থা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৬৫।

৯৭. রাজ্জাক, অধ্যক্ষ আবদুর : *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. জুন- ১৯৯৪।

৯৮. রায়, সুপ্রকাশ : *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতাঃ বুক ওয়াল্ড, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৯।

৯৯. রায়, নীহার রঞ্জন : *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০০।

১০০. রেজায়ী, খাদীজা আক্তার (অনূ) : *আর রাহীকুল মাখতুম*, মূল- আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, ঢাকাঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০০।

১০১. শফী (রঃ) হযরত মাও মুফতী মোহাম্মদ : *তাফসীর মা'রেফুল কুরআন*, অনূ ও সম্পা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সৌদী আরব: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি.।

১০২. শাহী, কাজী শওকত : *যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক*, যশোরঃ প্রকাশনায়ঃ আফিয়া আমিনুন্ নাহার, কাকলী প্রেস- খুলনা, ১৯৯৩।

১০৩. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬।

১০৪. " " : *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড*, ১৯৮৭।

১০৫. " " : *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড*, ১৯৯৩।

১০৬. " " : *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড*, ১৯৯০।

১০৭. " " : *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড* ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

১০৮. " " : *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড*, ১৯৯২।

১০৯. " " *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড*, ১৯৯৫।

১১০. " " : *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড* ,১৯৯৬।

১১১. সম্পাদনা পরিষদ : *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫।

১১২. " " : *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড,৩য় মুদ্রণ*, ১৯৯৫।

১১৩. " " : *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড*, ১৯৯৫।

১১৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫।

১১৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *ভারত কোষ*, কলিকাতাঃ বংগীয় সাহিত্য পরিষদ, তা.বি.।

১১৬. সাকলায়েন, গোলাম : *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৮৯।

১১৭. সাত্তার, মোঃ আবদুস : *ফরিদপুরে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

১১৮. সাত্তার, আবদুস : *মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) পীর কেবলার জীবন চরিত*, কলিকাতাঃ ইসলামিয়া আর্ট প্রেস ১৯৩৯।

১১৯. সাত্তার, আব্দুস (অনূদিত) : *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, মূলঃ মোস্তফা হারুন, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০।

১২০. সামাদ, এবনে গোলাম : *নৃতত্ত্ব*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

১২১. সামাদ, মোঃ আব্দুস : ইরানী হযরতের জীবনী, নওয়াপাড়াঃ প্রকাশিকা, রাবেয় বেগম, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

১২২. সালাম, আব্দুস (অনূদিত) ঃ *বাংলার ইতিহাস* (রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ) মুলঃ গোলাম হোসায়ন সলিম, দিল্লীঃ ইদারাহ-ই-আদারিয়্যাত-ই-দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৫।

১২৩. সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (সংকলিত) ঃ *আমিরু শরিয়াত মুজাদ্দেদে মিল্লাত ফুরফুরা পীর সাহেবের জীবন চরিত,* সিরাজগঞ্জ ঃ এহিয়া প্রেস, তা.বি.।

১২৪. সেন, ডঃ সুকুমার ঃ *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতাঃ ১৩৫৯ বাং।

১২৫. সেনগুপ্ত, প্রমোদ রঞ্জন ঃ *নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ,* কলিকাতাঃ র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭।

১২৬. সেনগুপ্ত, সুবোধ চন্দ্র সম্পাদিত ঃ *সংসদ বাঙালা চরিতাভিধান* ,কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ ১৯৭৬।

১২৭. হক, মুহাম্মদ এনামুল ঃ *বঙ্গে সূফী প্রভাব,* কলিকাতাঃ ১৩৯৫।

১২৮. " " ঃ *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ১ম সং, ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন, ২য় সং, ১৯৫৭।

১২৯. হক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল (সম্পা.) ঃ *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯২।

১৩০. হক সাহেব, হযরত মাওলানা শামছুলঃ *পীরের পরিচয়ঃ মুরিদের কর্তব্য,* যশোরঃ আকবর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৭০।

১৩১. হক, মাওলানা এম ওবায়দুল ঃ *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ,* নোয়াখালীঃ রশিদ ব্রাদার্স, ১৯৬৯।

১৩২. হক, মেসবাহুল ঃ *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২য় সং, ১৯৮৪।

১৩৩. হক, অধ্যাপক মোজাম্মেল ও অন্যান্য কর্তৃক (অনূ) ঃ *সহিহ আল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড,* ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, জুন ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪. হাকিম, শরীফ আব্দুল : *নড়াইল জেলার ইতিহাস*, নড়াইলঃ বর্ণছাপ প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ ১৯৯২।

১৩৫. হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ : *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, অনুবাদঃ এম. আনিসুজ্জামান, ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল আগষ্ট- ১৯৯৪।

১৩৬. হাফিজ, আব্দুল : *লৌকিক সংস্কার ও বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ মুক্তধারা ১৯৭৮।

১৩৭. হাসান, সৈয়দ মাহমুদ : *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

১৩৮. হেলাল, নাসির : *বারবাজারের ঐতিহ্য*, ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯৩।

১৩৯. " " : *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯৯২।

১৪০. " " : *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রচনাবলী, ১ম খণ্ড*, ঢাকাঃ মুনশী মেহেরুল্লাহ ফাউণ্ডেশন ১৯৯৯।

১৪১. হোসাইন, মুহাম্মদ ইকবাল : *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০১।

১৪২. " " (সম্পা) : *খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ রচনাবলী*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ফেব্রুয়ারী- ১৯৯৯।

১৪৩. হোসাইন, মোহসিন : *শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

English Articles

1. Ali, A.K.M. Yaqub : "Education for Mussim Under the Bengal Sultanate" *Islamic Studies, Vol.-xxiv, No-4*, Islamic Research Institute, Pakistan, 1985.

2. " " : The Educational System in British Bengal, ***Research Journal, Arts Faculty, Vol-1***, Ragshahi University, 1995.

3. Ali, Md. Wazed : Ganja in Naogon: A Socio-Economic Study" ***Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol- 11***, 1977

4. De-Amalendu : "Indigo Planted, Its expension in Different Areas of Bengal," ***Journal of History, Vol-vi***, Calcutta: 1981.

5. Ibrahimy, Mohammad, S. A : "Titu Mirs Reform Movement" ***Journal of the Asiatic Socity of Bengal, No. 1***, June. 1982.

6. Karim, Abdul : "Date of Bakhtiyar Khaljeis conquest of Nadia" ***Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol- xxiv-vi***, 1978-81.

7. Mitra, Raja Rajendra lal : Notes on three ancient coins found at Muhammadpur in the Jessore District, ***Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.-xxi***, 1852.

8. Qader. M. Abdul : "Mobra Gazi, ***The Observer Sunday Magazin, May, 14***, 1967, Dhaka.

9. Sarkar. J.N : A Discription of North Bengal in 1909. ***Bengal past and present, Vol-xxxv***, Calcutta: 1928.

Dhaka University Institutional Repository

10. Siddiquee, M. M. : "Origin and Development of District Studies in Bangladesh" ***Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. xv***, 1993, Rajshahi.

11. Yazdani, c : Inscriptions of Khalji Sultans of Delhi and their contemporaries in Bengal, ***Epigraphia Indo Moslemca***, 1917-18.

বাংলা প্রবন্ধ

১. আফতাব উদ্দীন, মুহাম্মদ ঃ "মহাচীনে ইসলামের বুনিয়াদ" *মাসিক মদিনা, ঈদ সংখ্যা,* ১৯৯৮, ই.ফা.বা. ঢাকা।

২. আহমদ, এ.কে. এম. নাজির ঃ "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর সম সাময়িক শাসকবৃন্দ" *মাসিক পৃথিবী,* ঢাকাঃ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগষ্ট ১৯৯৯।

৩. আহম্মদ, ডঃ সালাহউদ্দিন ঃ "বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রবন্ধ, *বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত,* ১৯৯২, ঢাকা।

৪. ইসলাম, মোহাম্মদ আশরাফুল ঃ "শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে মণীষী মেহেরুল্লাহ, খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পা), *প্রেক্ষণ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা,* ১৯৯৬, ঢাকা।

৫. কাইয়ূম, অধ্যাপক হাসান আবদুল ঃ "হাদিয়ে কওম মুন্সী মেহেরুল্লাহ" *প্রেক্ষণ- পূর্বোক্ত।*

৬. খান, মাওলানা মুহিউদ্দীন ঃ বাংলাদেশে ইসলাম ঃ কয়েকটি তথ্য সূত্র, *মাসিক মদীনা, ২৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা,* জানুয়ারী, ১৯৯২, ঢাকা।

৭. গফুর, আব্দুল ঃ "মহানবীর যুগে উপমহাদেশে ইসলাম, *অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (সঃ) সংখ্যা* ১৯৯৮, ই.ফা.বা. ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ঘোষ, শ্রী ননী গোপাল : "যশোর জেলার শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস, *মাসিক বসুমতি, সংখ্যা ১৭*, বৈশাখ ১৩৪৪ বাংলা।

৯. ছিদ্দিকী, ডঃ মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ : যশোরের মোগল ফৌজদারগণ, *গবেষণা পত্রিকা, ষষ্ঠ সংখ্যা ২০০০-২০০১*, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. দাস, অধীর কুমার : "হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী শাহ", *সাপ্তাহিক নওয়াপাড়া*, ১১ই জানু- ১৯৯৭।

১১. নূরউল ইসলাম, মুস্তাফা : মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের সাহিত্য সাধনা, *প্রেক্ষণ-পূর্বোক্ত।*

১২. " " : "মুন্সী জমিরুদ্দীন", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ বাংলা, ঢাকা।

১৩. মতিন, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল : ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষানুরাগী সেই মানুষটি" *প্রেক্ষণ- পূর্বোক্ত।*

১৪. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল : খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা মুন্সী মেহেরুল্লাহ ও আজকের প্রেক্ষিত" *প্রেক্ষণ*, ১৯৯৬, ঢাকা।

১৫. মুস্তাফা, নাসরীন : "জাতির ধ্রুব নক্ষত্র" *প্রেক্ষণ- পূর্বোক্ত।*

১৬. রহমান, এস. এম. লুৎফর : "বাউল মতবাদর সেকাল একাল", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সপ্তদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯০ বাংলা।

১৭. রহমান, ফরিদা : "চিনদেশে ইসলাম" *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

১৮. সালমান, মওলানা মুহাম্মদ : "মাওলানা রুহুল আমীন" আমাদের সূফীয়ায়ে কেরাম, *অগ্রপথিক সংকলন*, ১৯৯৫, ই.ফা.বা. ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. হোসাইন, মহসিন ঃ শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দীক (রঃ) "আমাদের সূফিয়ায়ে কেরাম, *অগ্রপথিক সংকলন"*, ই.ফা.বা., মাসিক পত্রিকা, জুন- ১৯৯৫।

২০. হোসাইন, মুহাম্মদ ইকবাল ঃ "খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম", *মাসিক অগ্রপথিক,* এপ্রিল ১৯৯৮, ই.ফা.বা. ঢাকা।

পত্র-পত্রিকা

১. *আঞ্জুমানে এত্তেফাক এসলাম,* ৬ষ্ঠ বার্ষিক রিপোর্ট, নদীয়া, কুমারখালী।

২. *আল আমিন,* ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-১৯৭৭, ঢাকা।

৩. *ইসলাম প্রচারক,* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯৮ বাং/১৮৯১, কলিকাতা।

৪. *টুরিস্ট গাইড,* সংক্ষিপ্ত ইরান পরিচিতি, ঢাকাঃ ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৫।

৫. *নূরুল ইসলাম,* ২য় বর্ষ, ১৩০৮, যশোর।

৬. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*।

৭. *প্রবাসী, সংখ্যা-১,* ১৩২৬ বাং, কলিকাতা।

৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৮-৯৯),* নলতা কেন্দ্রীয় আহছানিয়া মিশন, নলতা শরীফ, সাতক্ষীরা।

৯. *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬ বাং, ঢাকা।

১০. *মিহির ও সুধাকর,* ৫ই অগ্রহায়ণ-১৩০৯, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

মানচিত্রে যশোর জেলা

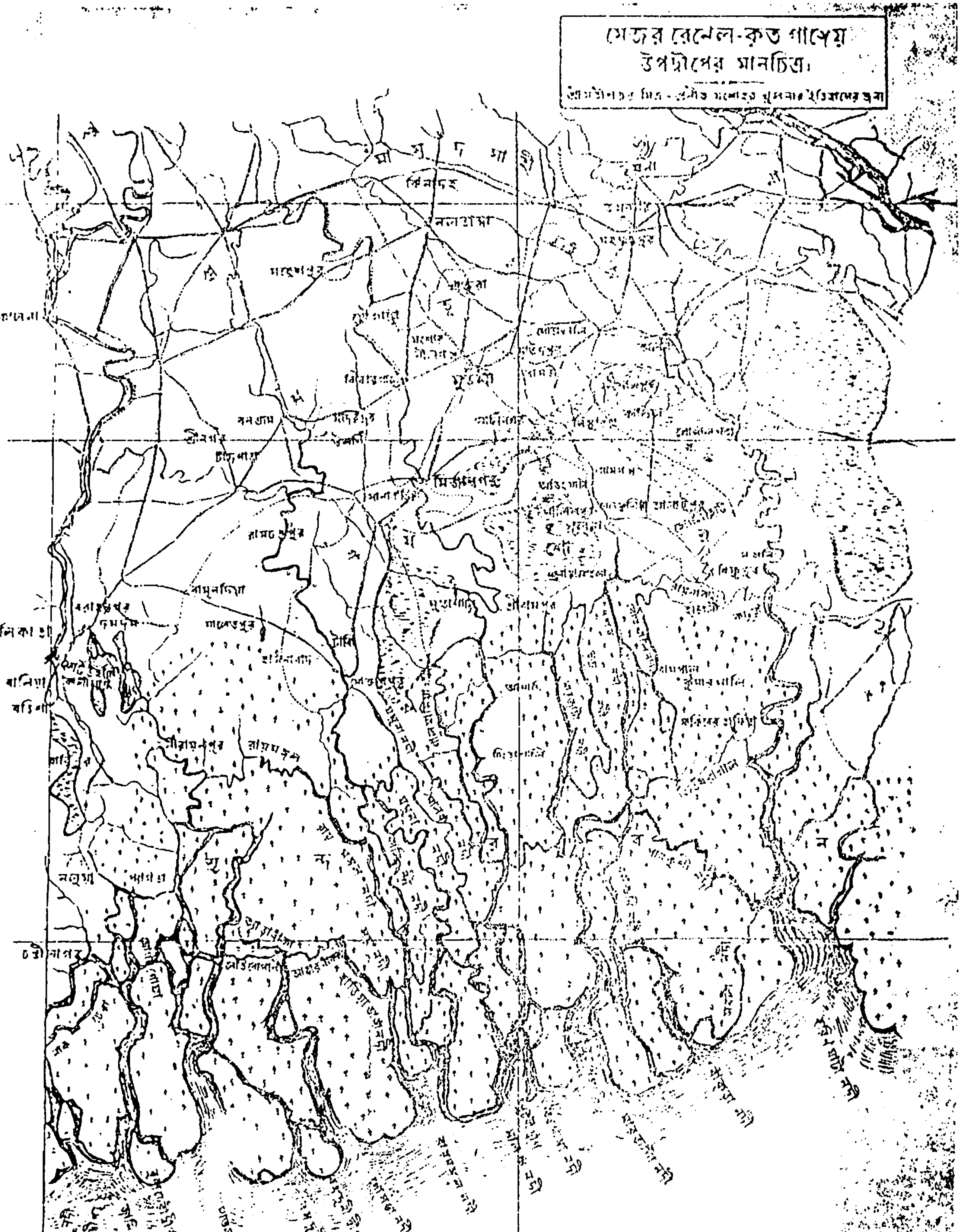

Dhaka University Institutional Repository

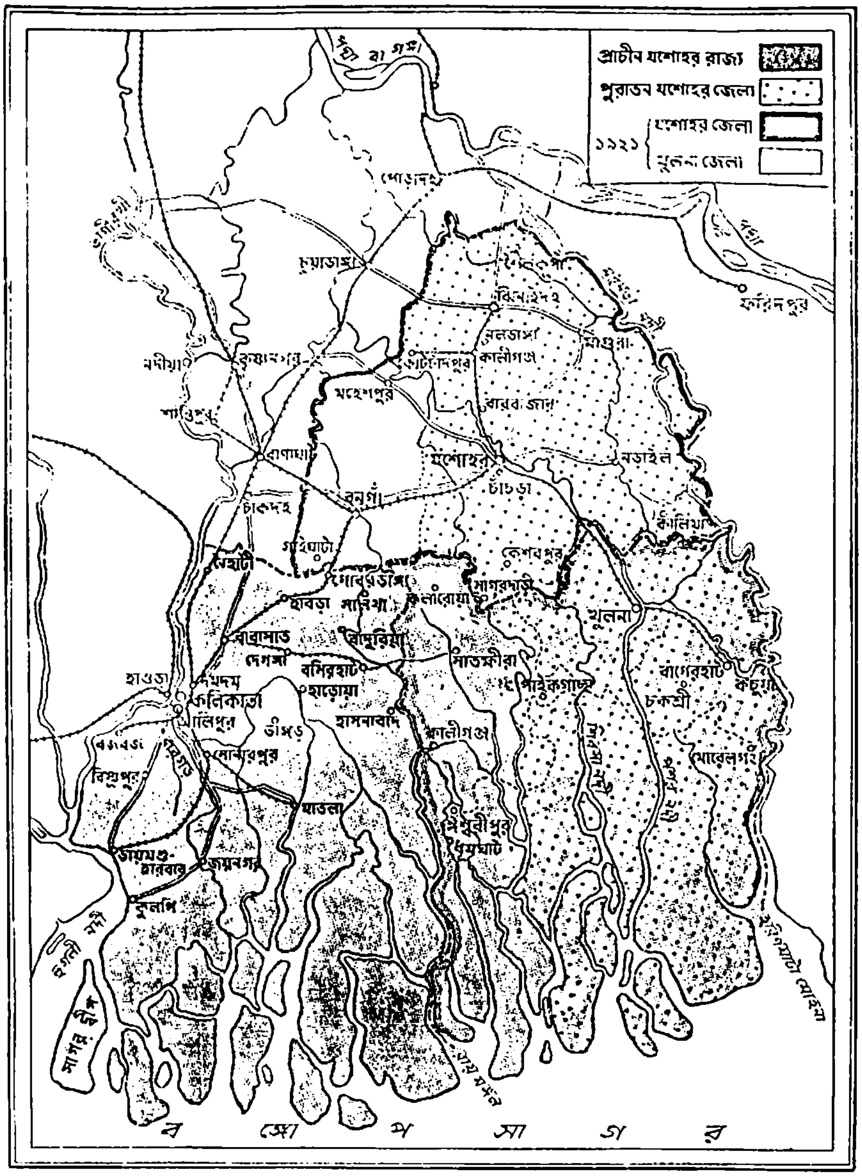

The District of Jessore

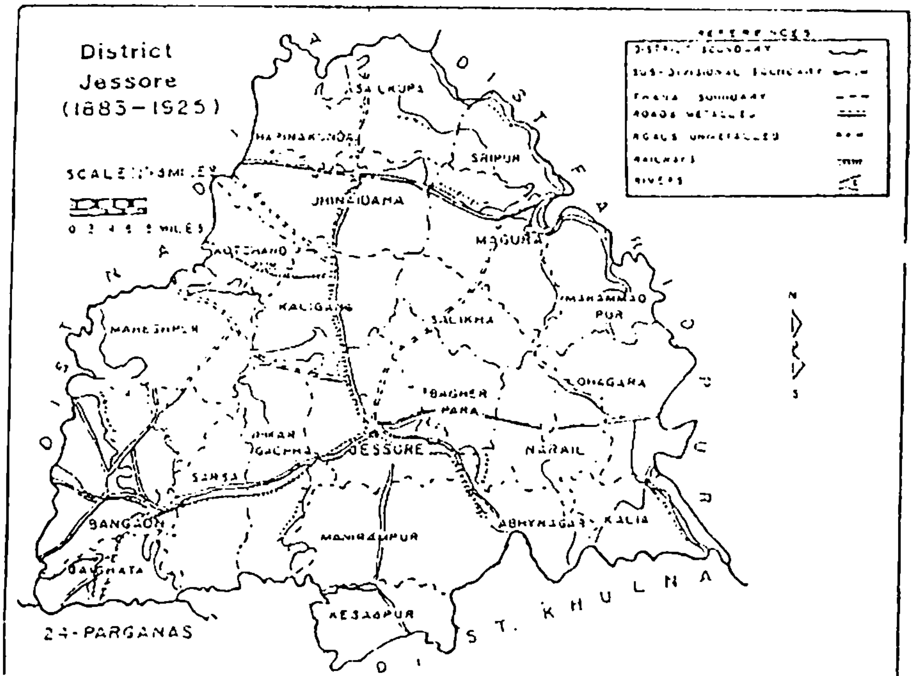

Dhaka University Institutional Repository

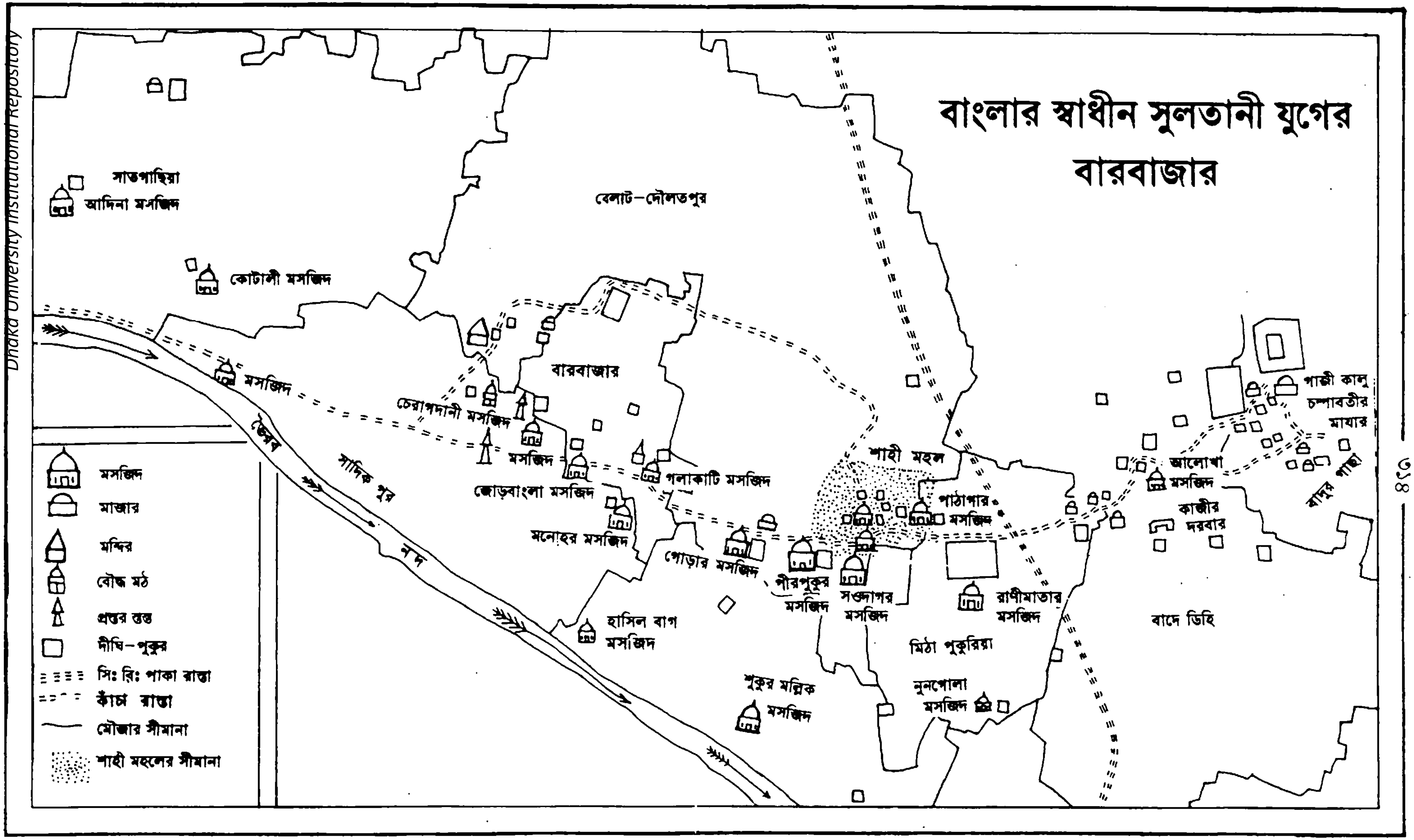
বাংলার স্বাধীন সুলতানী যুগের
বারবাজার
সাতগাছিয়া
আদিনা মসজিদ
বেলাট–দৌলতপুর
কোটালী মসজিদ
মসজিদ
বারবাজার
চেরাগদানী মসজিদ
মসজিদ
জোড়বাংলা মসজিদ
মনোহর মসজিদ
গলাকাটি মসজিদ
গোড়ার মসজিদ
পীরপুকুর মসজিদ
সওদাগর মসজিদ
শাহী মহল
পাঠাগার মসজিদ
রাণীমাতার মসজিদ
হাসিল বাগ মসজিদ
শুকুর মল্লিক মসজিদ
মিঠা পুকুরিয়া
নুনগোলা মসজিদ
বাদে ডিহি
আলোখা মসজিদ
কাজীর দরবার
গাজী কালু চম্পাবতীর মাযার
বাদুর গাছা
ভৈরব
সাদিক পুর
নদ
মসজিদ
মাজার
মন্দির
বৌদ্ধ মঠ
প্রস্তর স্তম্ভ
দীঘি–পুকুর
সিঃ বিঃ পাকা রাস্তা
কাঁচা রাস্তা
মৌজার সীমানা
শাহী মহলের সীমানা

Dhaka University Institutional Repository

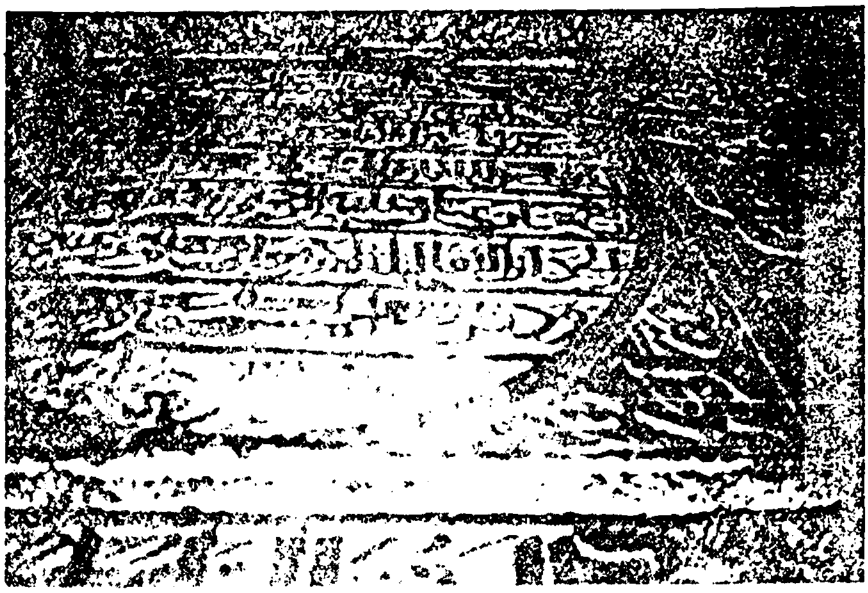

খানজাহান আলী (রহঃ) এর মাজার লিপির একাংশ

انتقل عبد الضعيف المحتاج الى رحمة رب العلمين المحب لاولاد سيد المرسلين المخلص للعلماء الراشدين، المبغض للكفارو المشركين، المعيد للاسلام والمسلمين، ألغ خان جهان عليه الرحمة والغفران- من دار الدنيا الى دار البقاء، ليلة الاربعاء فى ستة وعشرين من ذى الحجة ودفن يوم الخميس، سبع وعشرين منه، سنة ثان وستين و ثمانمائة-

মাজারে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার

Dhaka University Institutional Repository

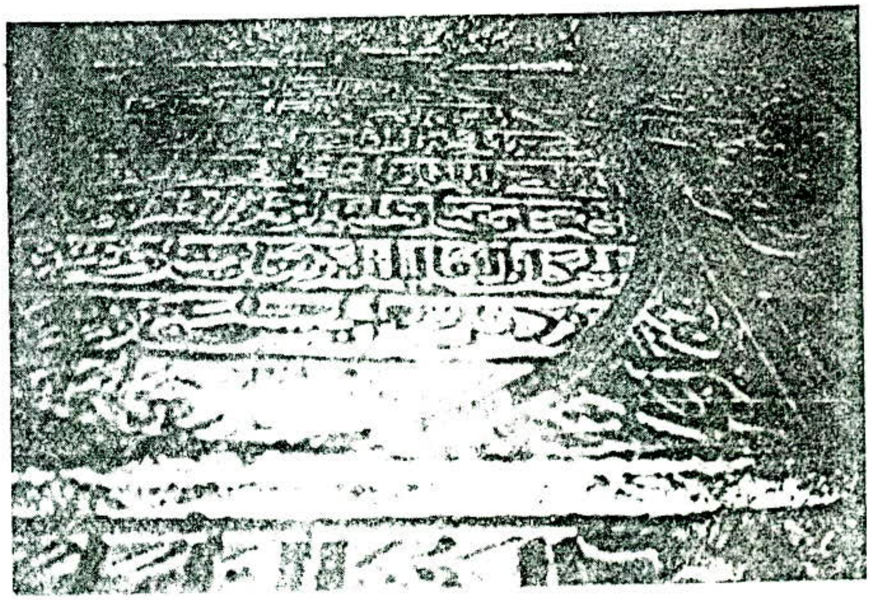

খানজাহান আলী (রঃ) এর মাজার লিপির একাংশ

انتقل عبد الضعيف المحتاج الى رحمة رب العلمين المحب لاولاد سيد المرسلين المخلص
للعلماء الراشدين، المبغض للكفارو المشركين، المعيد للاسلام والمسلمين، ألغ خان جهان
عليه الرحمة والغفران- من دار الدنيا الى دار البقاء، ليلة الاربعاء فى ستة وعشرين
من ذى الحجة ودفن يوم الخميس، سبع وعشرين منه، سنة ثلث وستين و ثمانمائة-

মাজারে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার

Dhaka University Institutional Repository

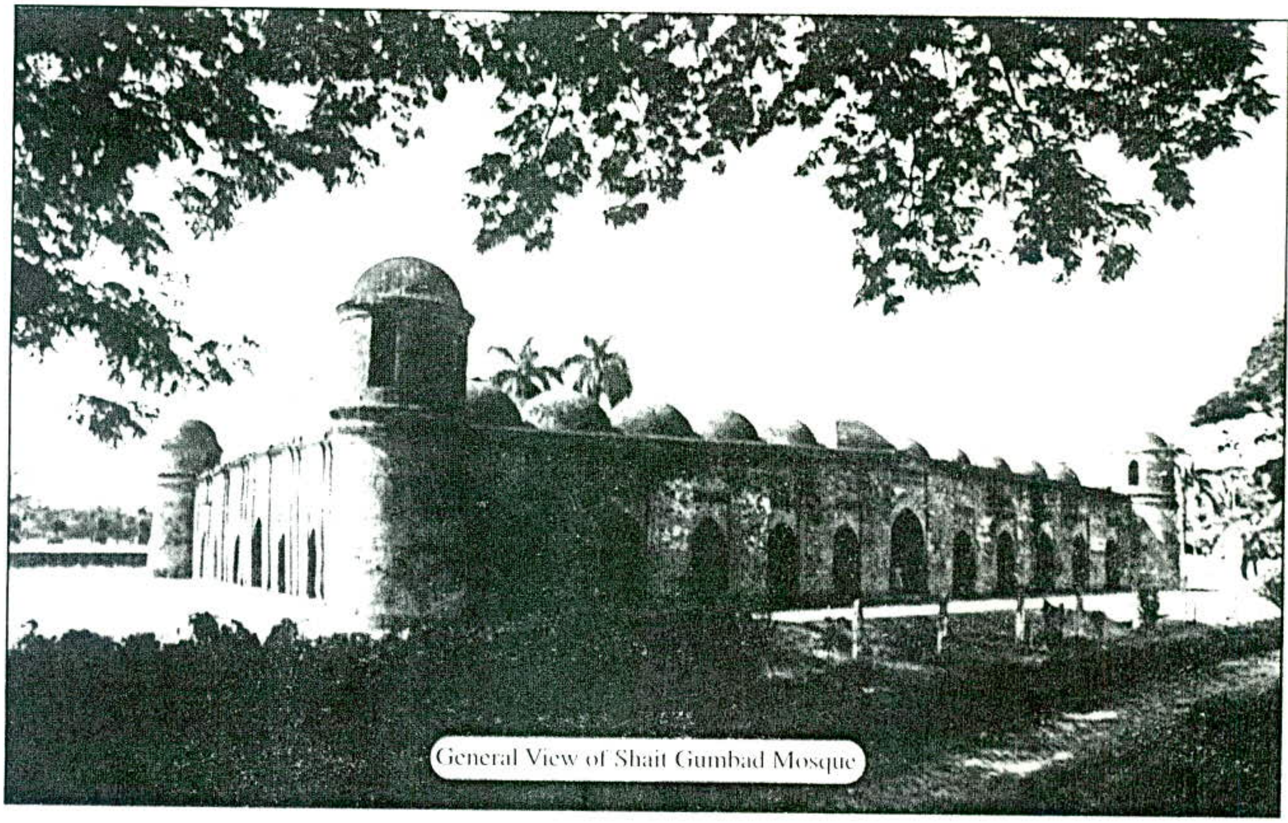

General View of Shait Gumbad Mosque

খানজাহান আলী (রহঃ) কর্তৃক নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

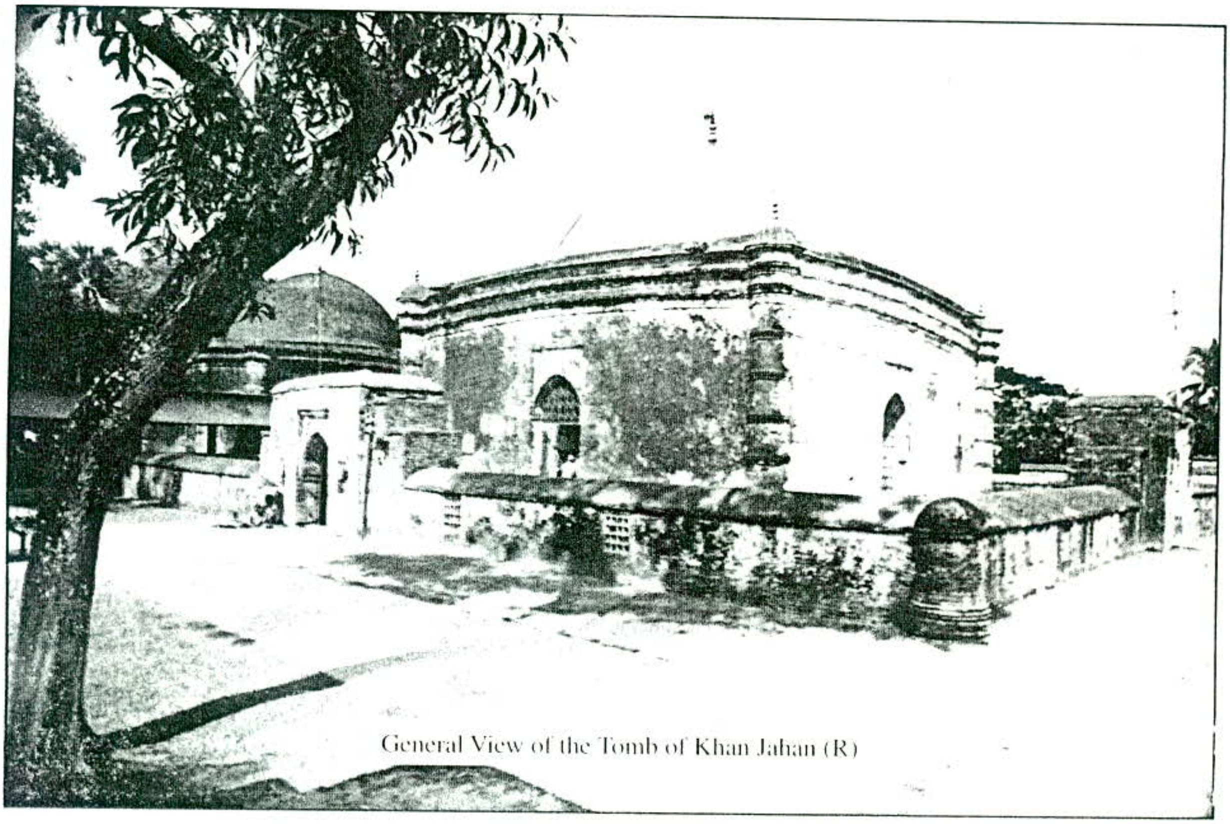

General View of the Tomb of Khan Jahan (R)

হযরত খানজাহান আলী (রহঃ) এর মাজার, বাগেরহাট

Dhaka University Institutional Repository

মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র হস্তাক্ষরের নমুনা ও আলোকচিত্রে তার স্মৃতি

মুনসীর হস্তাক্ষরের নমুনা

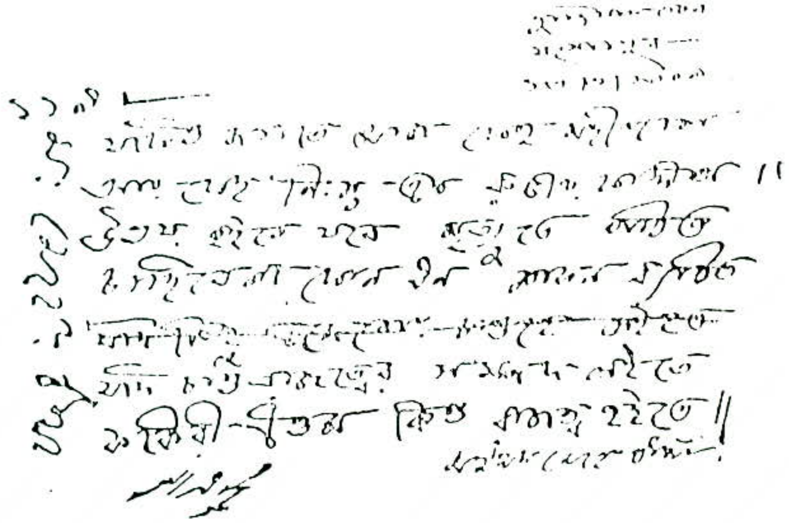

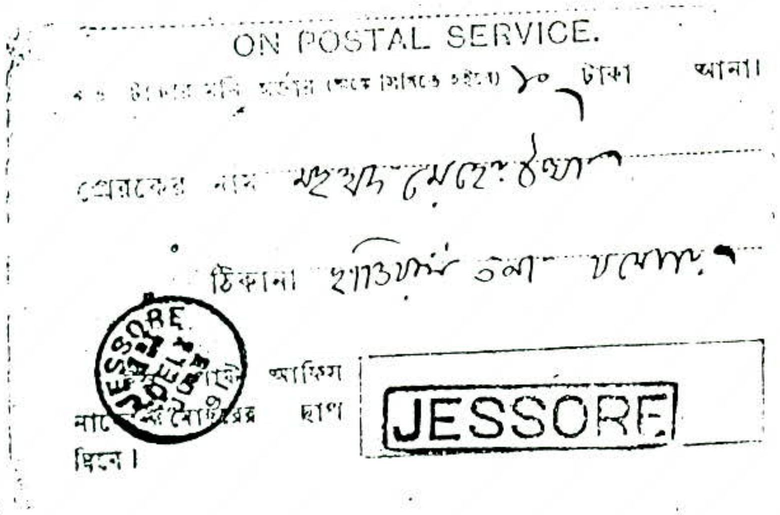

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে ডান পাশে বসা কর্মবীর যশোরের চেরাগ মুনসী মেহেরউল্লা।

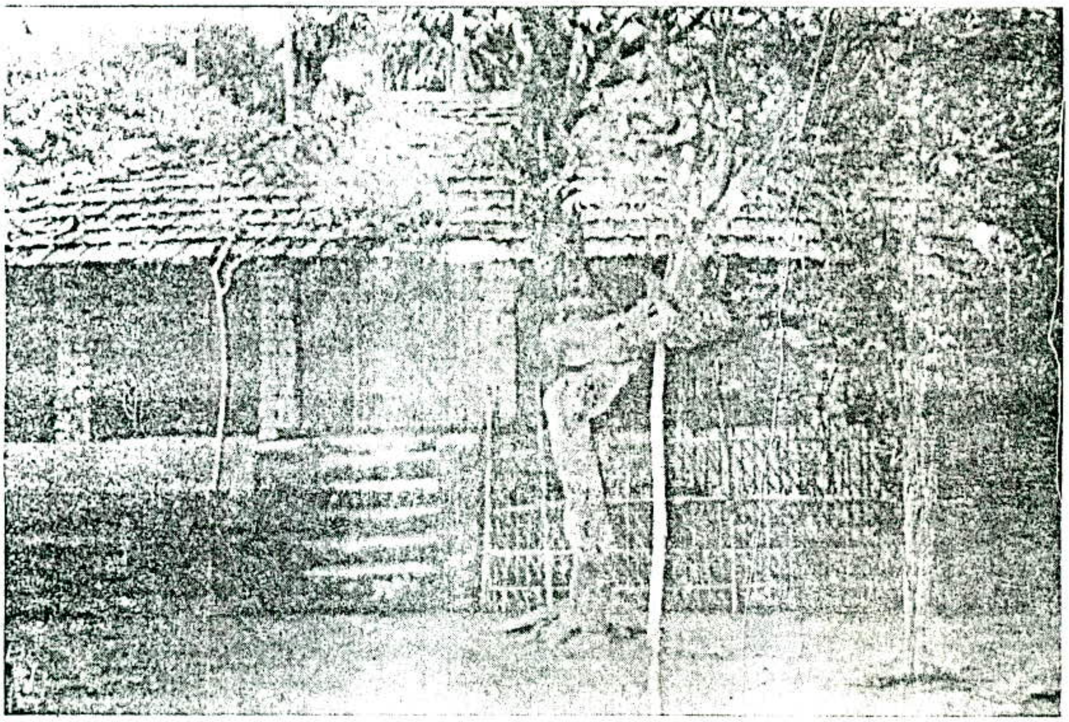

ছাতিয়ানতলায় অবস্থিত মুন্সী মেহেরুল্লাহর এই বাড়ীটির আসল চেহারা এখন আর নেই। সময়ের পরিবর্তনে সংস্কার হয়ে এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুনসীর সহচর শেখ জমিরুদ্দীন

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন
কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ এর গ্রন্থকার

এক সংগ্রামী জীবনের সমাপ্তি রেখা ছাতিয়ান তলার এই সমাধিস্থলে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন মুনসী মেহেরউল্লা

Dhaka University Institutional Repository

ঝাউদিয়াস্থ মুনসী মেহেরউল্লা একাডেমী ভবন। এটিই ১৯০১ সালে মুনসী মেহেরউল্লা প্রতিষ্ঠিত কারামতিয়া মাদরাসা ।

মুনসী সাহেবের নিজ গ্রামের উপর দিয়ে চলে যাওয়া খুলনা - রাজশাহী রেল লাইন। যা ১৯৪৯ সালে মেহেরউল্লা নগর রেলওয়ে ষ্টেশন নামকরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুনসী মেহেরউল্লা'র প্রতি যশোরবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যশোর টাউন হল ময়দানকে বর্তমানে 'মেহেরউল্লা ময়দান' নামকরণ করা হয়েছে।

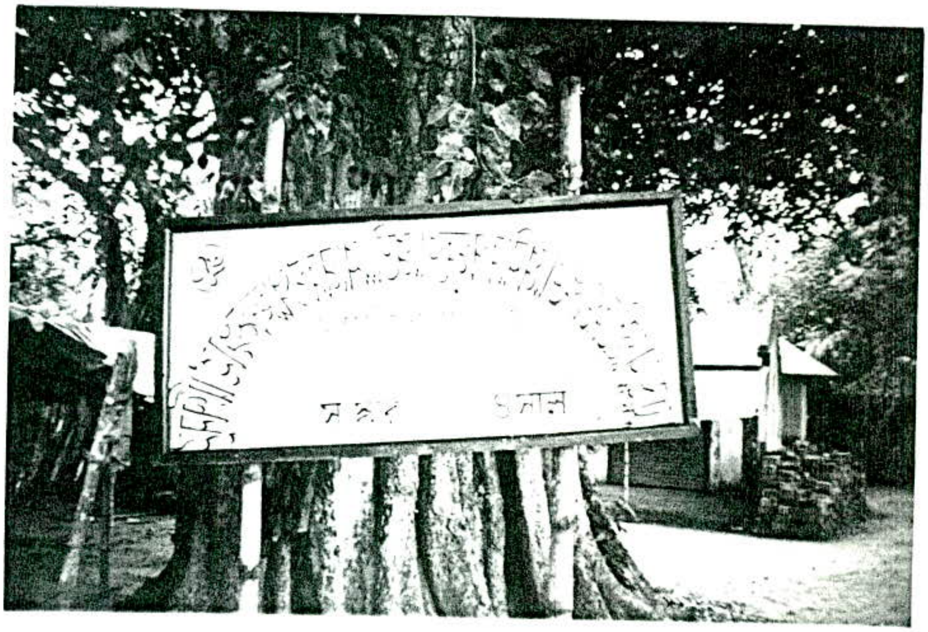

১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মুনসী মেহেরউল্লা কারামতিয়া ফুরকানিয়া ও হাফেজিয়া মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াপাড়ার পীর পরিবার

পীর খাজা মজিদ শাহ্

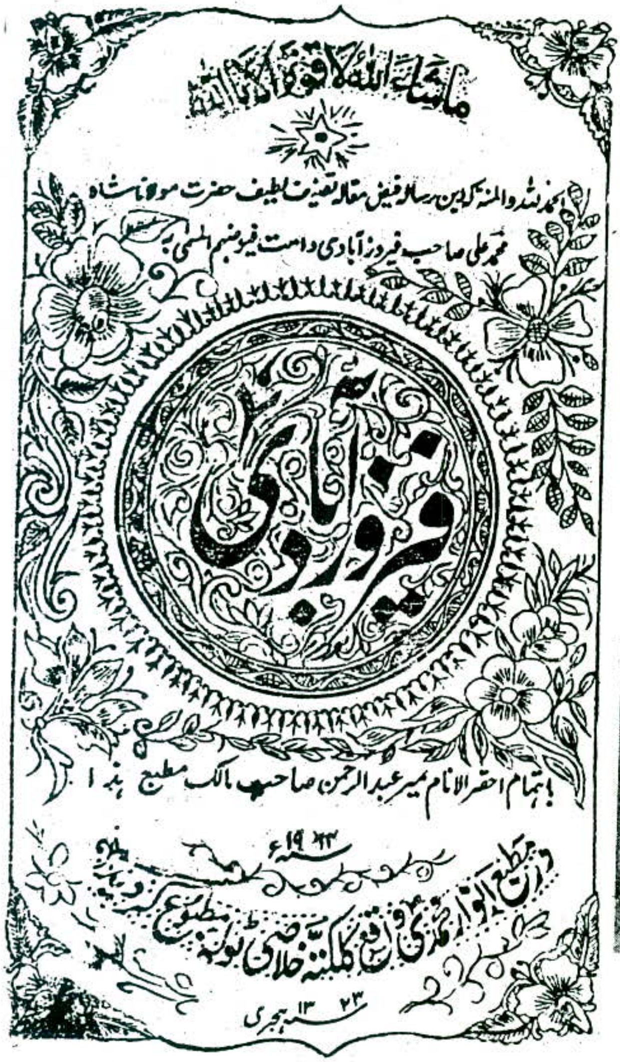

১৯১৪ ইং সনে প্রকাশিত মুহাম্মদ আলী শাহ্ (র.)-এর 'ফিরোজাবাদী' শীর্ষক বইয়ের প্রচ্ছদ, বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত

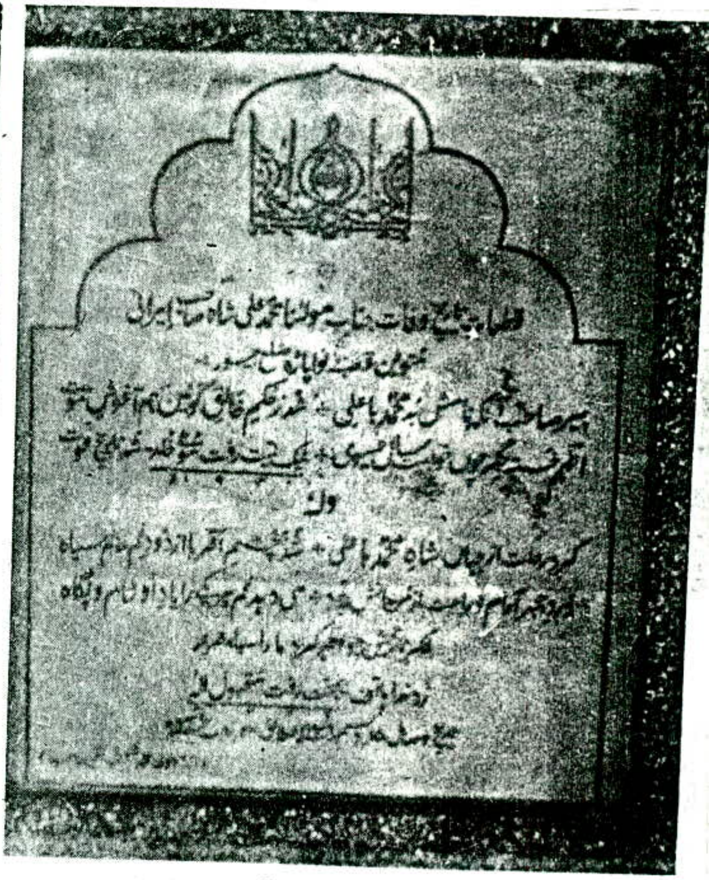

নওয়াপাড়া মুহাম্মদী খানকাহর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী শাহ্ ইরানী (র.)-এর কবরে খোদাইকৃত শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

৩২৩

خاک نشین آستانۂ عالیہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ

S M YAQUB

Khak Nashin Astana-e-Pak
Rashid Manzil
Dargah Sharif
AJMER (India)

খাদিম রশীদ আস্তানা-এ-পাক
রশীদ মঞ্জিল
দরগাহ শরীফ আজমীর (ইন্ডিয়া)

Ref ...... Date 22/5/1983

[illegible]

আবদুল মজিদ শাহ্‌কে আজমীর শরীফ হতে খাজা উপাধি প্রদানের নমুনা

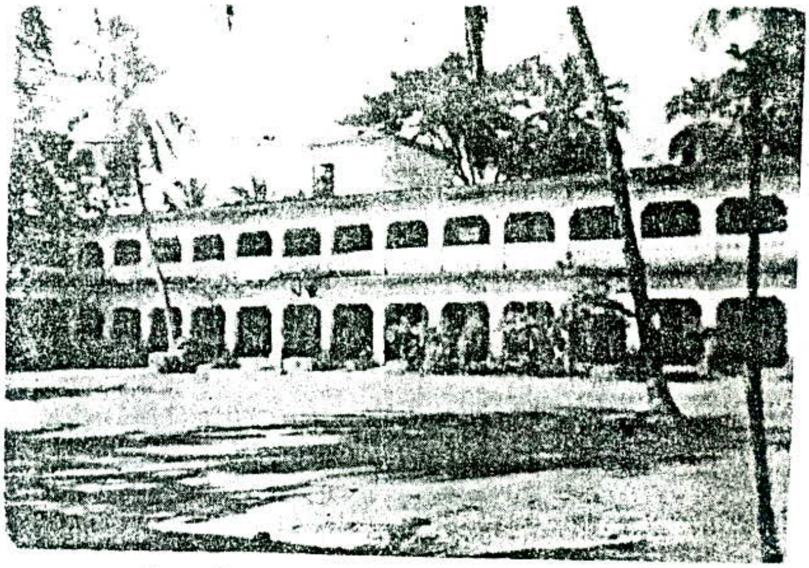

বর্তমানে পীর সাহেব কেবলার বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত
জামেয়া আরাবিয়া মহিউল-ইসলাম মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

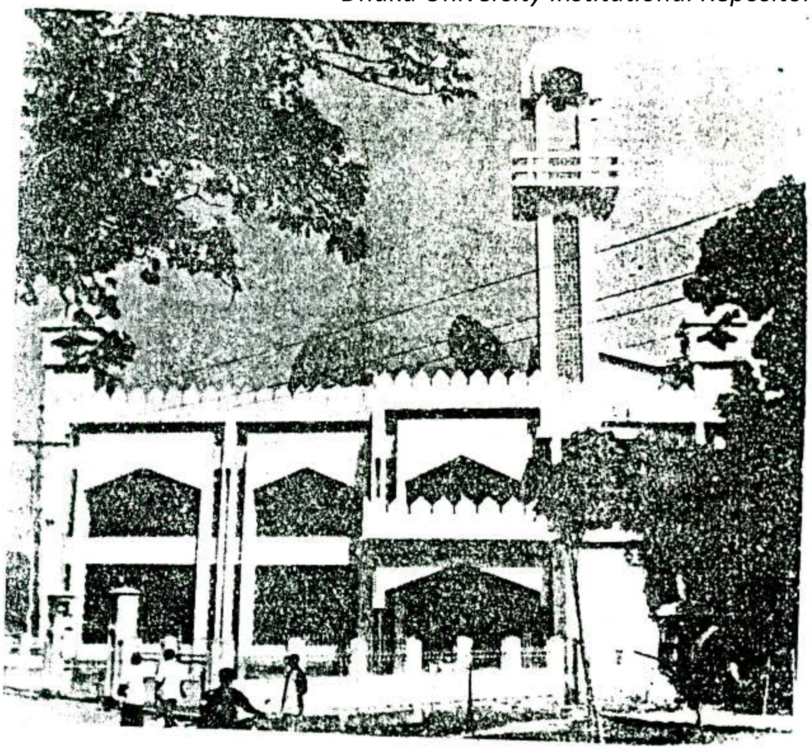

নওয়াপাড়া নব সংস্কারকৃত সুরম্য শাহী জামে মসজিদ

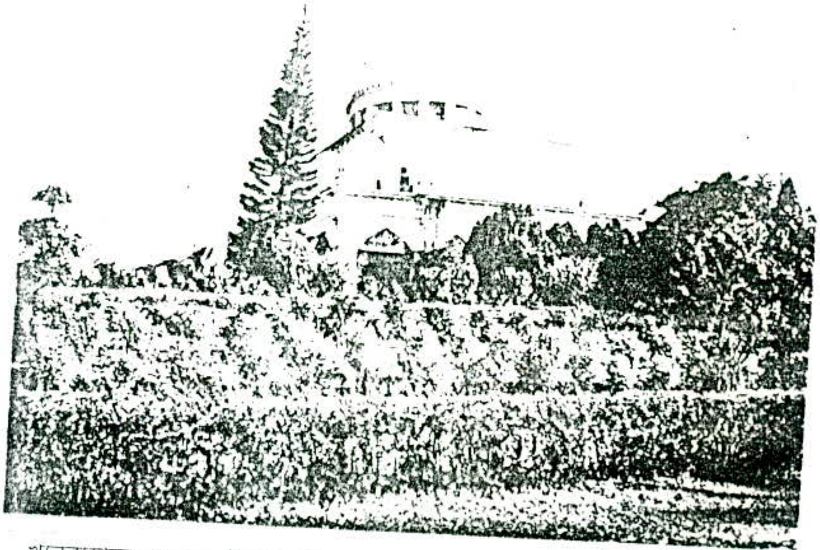

খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ পীর সাহেবের মাযার। নলতা শরীফ, সাতক্ষীরা।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রে কয়েকজন কবি - সাহিত্যিক

মরমী কবি লালন শাহ

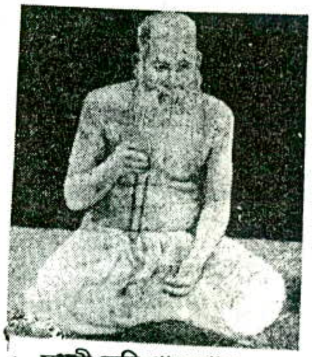

মরমী কবি পাঞ্জু শাহ

শেখ হবিবর রহমান

গোলাম মোস্তফা

ফররুখ আহমদ

অহেদ আলী আনসারী

সৈয়দ আলী আহসান

ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ

Dhaka University Institutional Repository

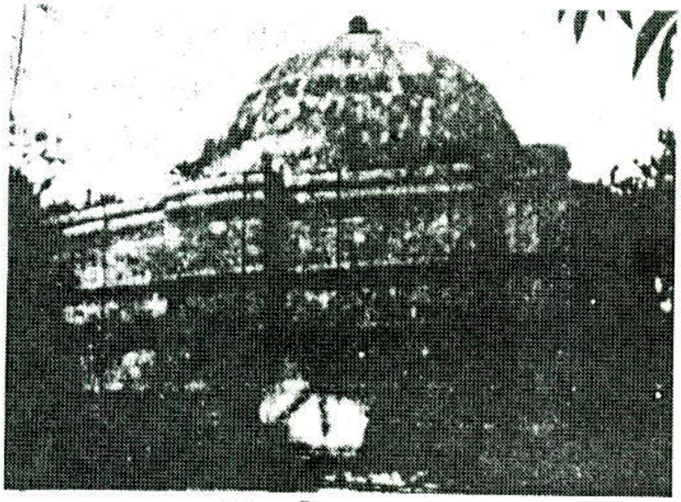

গোড়া মসজিদ, বারবাজার।

গোড়া মসজিদের দক্ষিণ দেয়ালের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

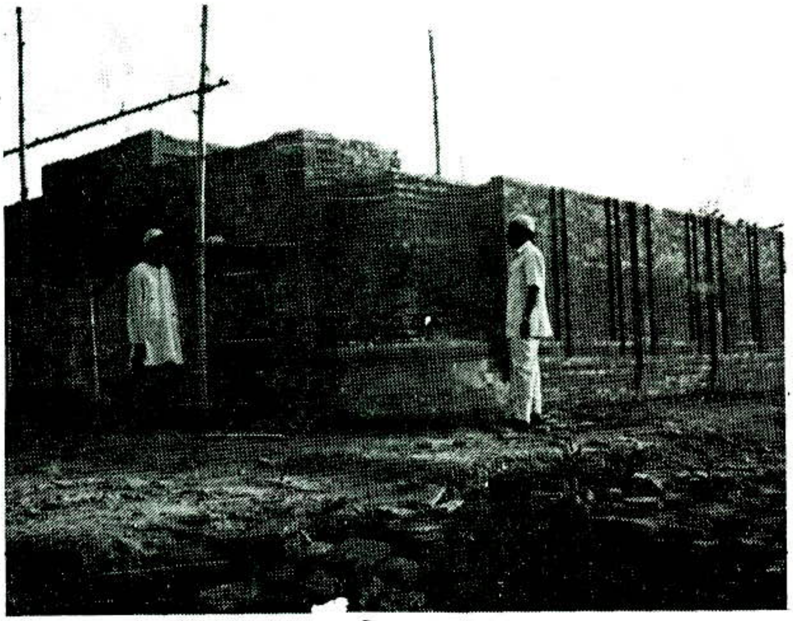

জোড়বাংলা মসজিদের বাহিরের দৃশ্য।

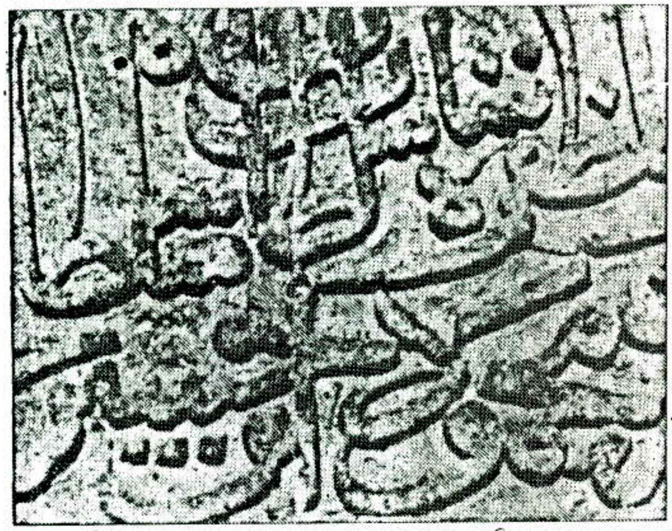

জোড়বাংলা দীঘির তলদেশে প্রাপ্ত খোদায় করা ইটের ছবি। যাতে লেখা আছে, সুলতান মাহমুদ ইবনে হোসাইন, ৮০০ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

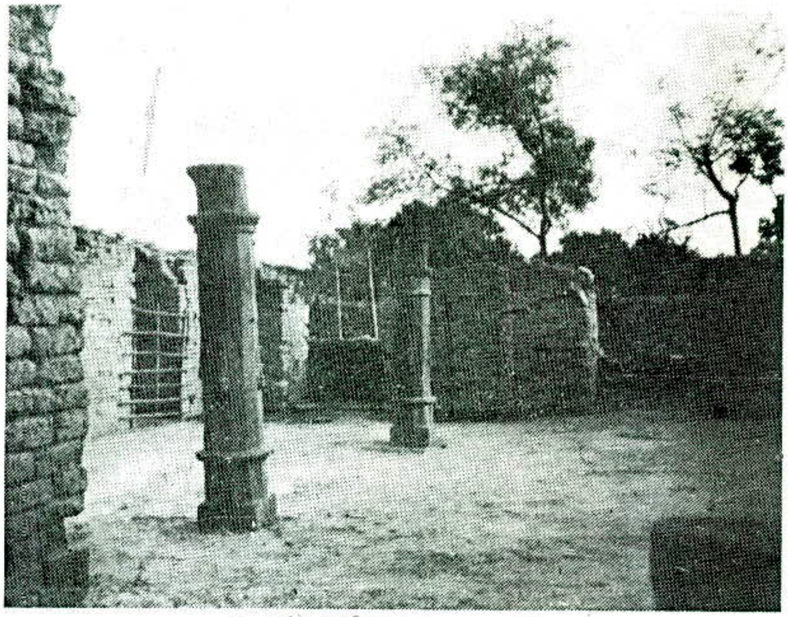

গলাকাটা মসজিদের ভেতরের দৃশ্য।

গলাকাটা মসজিদের বাহিরের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

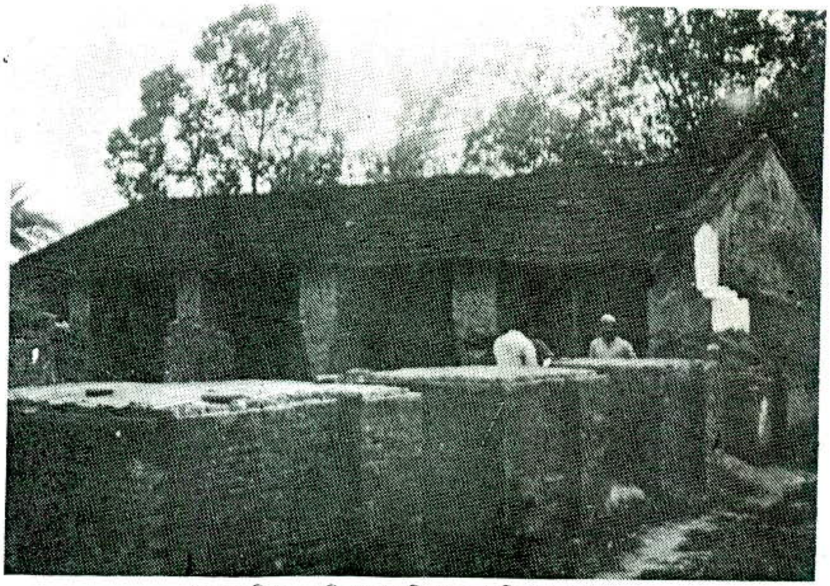

সাতগাছিয়া আদিনা মসজিদের বাহিরের দৃশ্য।

সাতগাছিয়া আদিনা মসজিদের ভেতরের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চেরাগদানী মসজিদ। পাশেই ২টি প্রাচীন কবরের দৃশ্য।

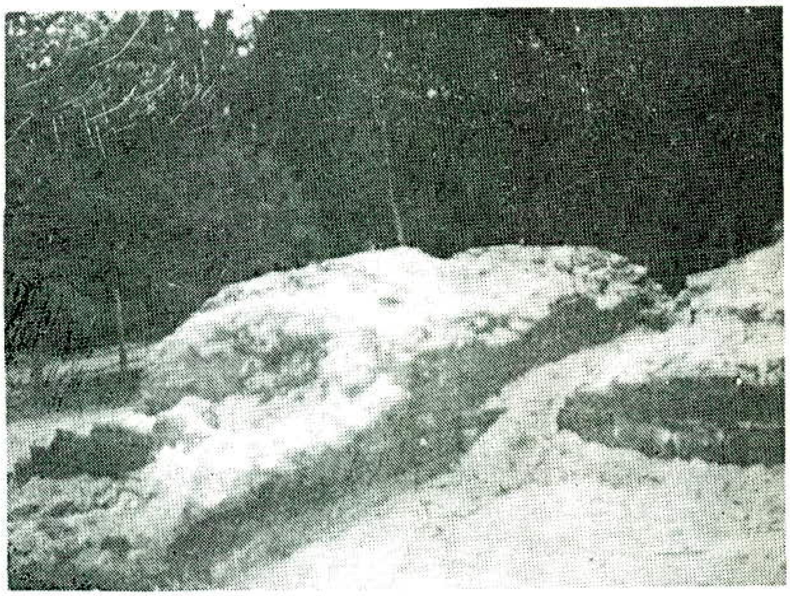

সওদাগর পুকুরপাড়ের মাযারের দৃশ্য। এখানে ২১ জনের কবর আছে।

Dhaka University Institutional Repository

পীর পুকুর মসজিদের ঢিবির দৃশ্য। এখনো খনন কাজ করা হয়নি।

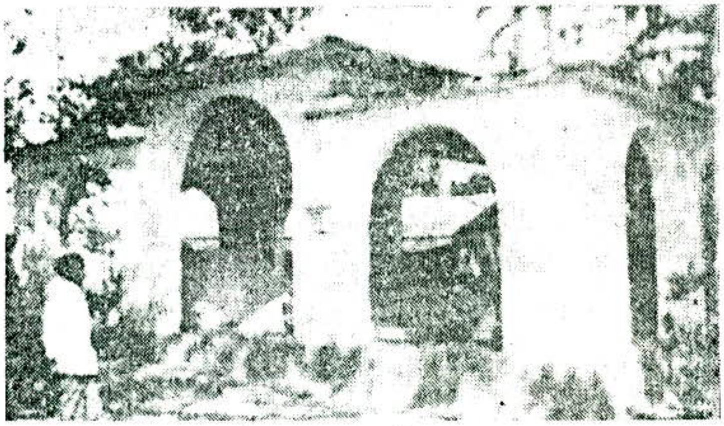

গাজী কালু চম্পাবতীর মাযার।

Dhaka University Institutional Repository

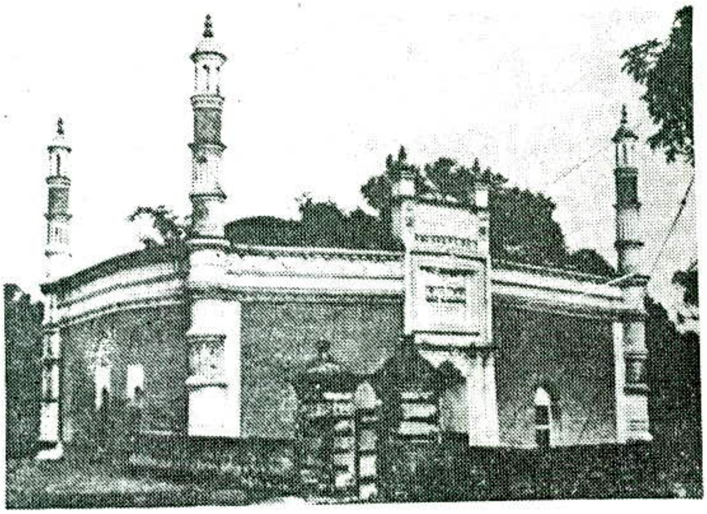

শৈলকূপা মসজিদ, যশোর

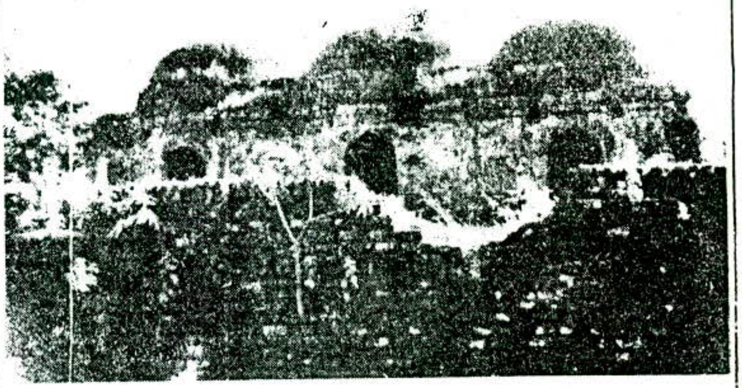

শেখ পুরা মসজিদ, কেশবপুর